মানুষ

মেজর ডা. আব্দুল ওহাব মিনার (অব.)

মানুষ

মেজর ডা. আব্দুল ওহাব মিনার (অব.)

www.pathagar.com

শুদ্ধস্বর ২০০৮
মানুষ

প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৮
© মেজর ডা. আব্দুল ওহাব মিনার (অব.)

প্রকাশক • শুদ্ধস্বর
www.shuddhashar.com
91 aziz super market
2nd floor shahbagh
Dhaka-1000

+88 02 9675510
+88 01716 525939
editor@shuddhashar.com
shuddhashar@gmail.com

প্রচ্ছদ • অনিন্দ্য রেজা

মূল্য একশত টাকা
ISBN
984-300-001761-3

MANUSH by MAJOR DR. ABDUL WAHAB MINAR (RETD.);
a publication of Ahmedur Rashid's shuddhashar
printed by SHOILPIK
first edition February 2008
price taka 100

www.pathagar.com

উ ৎ স র্গ

ভালবাসা ও দয়ামায়াহীন জীবন যাপনে অভ্যস্থ
এবং
থাকা, পড়া ও ক্ষুধার কষ্টে জর্জরিত
বাংলাদেশের ভাগ্যাহত মানুষদের উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

সকল হৃদয়ে ভালবাসা আছে, নেই ভালবাসার চর্চা। লেখাটা সকল মানুষের জন্য। ভালবাসার ব্যাপক চর্চা হলে-হৃদয় দুয়ার উন্মুক্ত হবে এবং আমার বিশ্বাস তখন মানুষ অধিকতর মানবিক আচরণ করার সুযোগ পাবে। বঞ্চিত মানবতা ফিরে পাবে তার অধিকার।

ঘুরে ফিরে প্রত্যেকেই আমরা কোথাও না কোথাও প্রতারিত, শোষিত ও বঞ্চিত। করুণা বা দয়া নয়, অধিকারের প্রশ্নে আমরা সকলে পরস্পরকে ভালবাসব এবং অপরের অধিকার বিশেষ করে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ করব, সংগ্রাম করব।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আপনি যখন আমার এই লেখাটা পড়ছেন তখন আপনি কোথায় কি অবস্থায় আছেন বলতে পারব না। তবে আমি যখন এ লেখাটা লিখছি তখন দু'হাজার আট সালের ফেব্রুয়ারী মাস, বই মেলা শুরু হয়েছে রাজধানী ঢাকা শহরে। এ সময়টাতে দেশে জরুরি অবস্থা বিরাজমান। দেশের প্রাক্তন দুই প্রধানমন্ত্রীসহ অনেক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ব্যাবসায়ী জেলে বিচারাধীন। রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ। ঢাকায় ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি থাকলেও সারাদেশে অনুমতি মেলেনি ঘরোয়া রাজনীতির। যে কোন মূহুর্তেই এ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হতে পারে। এসব কারনেই দুই রাজনৈতিক শিবিরে বিভক্ত দেশের মানুষের মন ভাল না। মন ভাল না থাকার অন্য কারন হচ্ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি। এ ইস্যুটা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে জীবন বাঁচাতে মানুষের ত্রাহি ভাব। এমন সময় আমি লেখাটা লিখছি যখন মানুষের মন খারাপ। দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে সাইক্লোন সিডরে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অনেক প্রানহানি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থরা তাদের দুঃখবোধ নিয়ে বেঁচে আছে কোন রকমে। পূণর্বাসনের কাজ শুরু হয়েছে। ক্ষেতের ফসল মারা গিয়েছে কৃষকের, আর জেলের জাল নৌকা দু'টোই গিয়েছে ভেসে। কিভাবে ভাল থাকবে মানুষ। সারাদেশে শুরু হয়েছে বার্ডফ্লুর প্রকোপ। শুধু ফার্মের মুরগীর মধ্যেই রোগটা সীমাবদ্ধ নেই, কাকের মধ্যে পর্যন্ত ছড়িয়েছে। রাজধানীতে অনেক কাক মারা গেছে, ফার্মের মালিক মুরগী নিধনের পর পথে বসতে বসেছেন। পাগলপ্রায় অসহায় মালিক। এ নিয়ে সচেতন মহল উদ্বিগ্ন।কোথাও কোথাও আতংক বিরাজ করছে। এসব কারণে মানুষের মন ভাল না। এমনিতেই ঢাকায় যানজটে নাগরিকদের জীবনযাত্রা দুর্বিসহ আকার ধারন করেছে। তার উপর কাজকর্ম নেই। নতুন চাকরি নেই। রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা নিঃসন্দেহে নিজেরাও ভাল নেই। তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব তারা পালন করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। দেশের জন্য কতটুকু করতে পারলেন- তারা হয়তো অনেকেই নিজের কাজের উপর নিজেরাই বিরক্ত। মনে মনে ভীষন অখুশী। এভাবে হয় না। আসলেই তাই। অগোছালো ভাবে কিছু হয় না। আপনি যখন আমার লেখা পড়ছেন তখন আপনার মনের অবস্থাটা কেমন বলতে পারব না। আমি যখন লেখাটা লিখছি তখন আমার মনটা খারাপ। এতটাই খারাপ যে আমি একটা বিষয়ে একটা বই লেখার কাজে হাত দিয়েছি। আমি আর একাকী কষ্টটা ধরে রাখতে পারছি না। আমাদের চারপাশে যা হচ্ছে তা চোখ বুজে হজম করার কৌশল আমরা অর্জন করেছি ঠিকই কিন্তু এভাবে কতদিন! দেশের সরকারগুলো বিগত দিনে অবিরত বলে আসছিল দেশের উন্নতির কথা। একশ্রেণীর সুবিধাভোগী লোকজনও একথা বলেন। ক জন লোকের ভাগ্যের উন্নতি হয়েছে। মৌলিক সমস্যাবলী কি আদৌ কমেছে? চোখে পড়ার মত কি দুর্নীতি

www.pathagar.com

কমেছে? বরং কোথাও দুর্নীতি বেড়েছে। বেকারত্ব কি কমেছে? মানুষের জীবন যাত্রার মান যদি বাড়ানো না গেল তবে প্রগতি বলছি কিসের জন্য। আমরা গলাবাজিতে অতি পারদর্শী হয়ে গেছি। গর্ব করি, অহংকার করি। অহংকারের মাত্রা কখনো চোখে পড়ার মতো হয়ে যায়। কিসের অহংকার। অহংকার করার মতো কাজই কি আমরা ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠিগত ভাবে তেমন কিছু করতে পেরেছি? আদৌ পারিনি। আমাদের অর্জন অবশ্যই আছে। তবে তা উল্লেখ্য নয়। এসএসসি পরীক্ষার পর জিপিএ তিন পেয়েও মিষ্টির দোকানে অনেকে লাইন ফেলেন আবার চার পয়েন্ট পাঁচ পেয়েও পরীক্ষার্থীসহ অনেক অভিভাবকদের মুখ মলিন থাকে। আমাদের জাতিকে নিয়ে কি আমাদের প্রত্যাশা এতটাই কম? প্রাপ্তি থাকলেই না গর্ব করবো। তা ছাড়া মানুষের উপর মানুষের ইদানিং কালের খবরদারিটা বেড়েছে সীমাহীন, কমেছে শেয়ারিং। অথচ মানুষ জানে না সে কতটাই অক্ষম ও দূর্বল। মানুষকে তার যোগ্যতা ও অযোগ্যতার ব্যাপারে সঠিক ও যথাযথ জ্ঞান থাকতে হবে। তার দূর্বলতম দিকগুলো জানা থাকতে হবে।

দুই হাজার আট সালের একটা ক্যালেণ্ডারে সূর্য, পৃথিবী এবং এর সাথে অন্যান্য গ্রহের আয়তনগত ব্যবধান সচিত্র দেখানো হয়েছে। সূর্যের সাথে পৃথিবীর তুলনামূলক আকারে একটা 'ডট' এর মতো দেখানো হয়েছে। বৃহস্পতি গ্রহটি সেখানে একটা মার্বেলের আকার। সূর্যটা দেশি মুরগীর ডিম। অন্য ছবিতে সূর্যের সাথে একটা গ্রহের সম্পর্ক দেখাতে গিয়ে এবার সূর্যটাকে একটা পিনহেড বিন্দুর মত দেখানো হয়েছে আর এ গ্রহকে একটা কমলালেবুর মত। এগ্রহটির নাম এনটারেস। এ বায়ুমণ্ডলে অজস্র গ্রহ নক্ষত্রের মেলায় আমাদের বসবাসস্থল পৃথিবীর নাজুকতার বিষয়ে আমার কমবেশি ধারণা ছিল। সূর্য থেকে এর দূরত্ব এবং সূর্যের তুলনায় পৃথিবী যে অতি দুর্বল, কাহিল তাও আমার অজানা নয়। কিন্তু একদম ভাইরাস আকারে ইলেকট্রনিক মাইক্রোসকোপ দিয়ে খুঁজতে হবে এমনটা আমার ভাবনায় ছিল না। ক্লাস টু এর একটা ছেলে পৃথিবীর এ দৈন্যদশা দেখে আমার সামনেই খুব হাসল। তার পাঠ্যপুস্তকে সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রের কথা আছে। রাত দিনের আবর্তনের প্রসঙ্গ আছে। বিষয়টা তারও পরিচিত। আমার বেশ খটকা লাগলো। ভুলতে চাইলাম। এটাই স্বাভাবিক ও চিরন্তন। বহু যুগ ধরে এভাবে আছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত এভাবেই থাকবে অসুবিধে কোথায়। না-ঘটনার দু'দিন পরও ভুলতে পারিনি।

পৃথিবীর অসহায় অবস্থাটা আমাকে বিচলিত করেনি। উপমা বা তুলনাটা আমাকে খুব বিচলিত করেছে। এই মহাবিশ্বে আমার পরিচয় ও অবস্থানটা কোথায় এ প্রশ্নটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। আমি কিংবা আমার মত মানুষ যারা এ পৃথিবীকে তথা বিশ্বকে জয় করেছি বলে বিভিন্ন সময় দাবী করি আসলে কি জয় করেছি। আমাদের শারীরিক যে অবস্থান সেটাতো ধর্তব্যই না। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিচরণই বা কতটা শক্তিশালী। বারবারই আমার অক্ষমতার কথাটাই বেশি মাথায় আসতে থাকে। আমরা মানুষরা কিসে স্বার্থক আর কিসে ব্যর্থ তার হিসাব নিকাশের মানদণ্ডটা আমার একটু

www.pathagar.com

ভিন্ন। এ ছোট পৃথিবী নামক গ্রহটাতে থেকেও আমরা বিশ্বের অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্র সম্পর্কে জানতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি- সেখানে পাড়ি জমাতে সক্ষম হয়েছি। এমনকি ঐসব গ্রহে থাকার পরিবেশ তৈরী করার কাজেও হাত দিয়েছি। এমন কাজ মানুষের পক্ষেই করা সম্ভব। এ স্বার্থকতাকে কোনদিনই আমি অস্বীকার করি না। বরং গৌরববোধ করি। অন্য কোন প্রাণী নয়, অন্যকোন সৃষ্টি নয় কেবল মানুষরাই এটা পেরেছে। তাই মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে জন্ম নেয়াতে আমার গৌরববোধের কোন শেষ নেই।

মানুষকে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে সৃষ্টির সেরা জীব বলা হয়েছে। আর এও আল্লাহপাক ডিক্লার করেছেন যে মানুষের জন্যই সবকিছু। কুরআনের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে **'মানুষ'**। সবকিছু মানুষের কল্যাণ অকল্যাণকে কেন্দ্র করে বর্ণিত হয়েছে, বিবেচিত ও বিশেষায়িত হয়েছে। একটা ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস থেকে শুরু করে বনজঙ্গলের হাজার রকমের গাছপালা ও পশুপাখি, সাগর, মহাসাগর তলে নানাবিধ জলজপ্রাণী ও উদ্ভিদ সবকিছু এই একটিমাত্র প্রাণী মানুষের প্রয়োজনে। কোনটার কি প্রয়োজন ও উপকারিতা তা বের করার দায়িত্ব এই মানুষদেরই। আবার কোনটা সরাসরি মানবকূলের অপকারী হলেও তার সুদূর প্রসারী উপকারীতাটাও বুঝে নেবার সুযোগও আছে। আল কুরআনসহ ইনজিল, তাওরাত-যবুরে একইভাবে একথাগুলো এসেছে। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলোতে মানুষকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। ধর্মগ্রন্থ ছাড়াও আমরা দেখতে পাই পৃথিবীতে যারা নামীদামী ব্যক্তি ছিলেন তারা মানুষকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং মানুষের উন্নতি ও কল্যাণ কামনায় সারাটা জীবন ব্যয় করেছেন। আজ এ প্রসঙ্গটা আবার সামনে নিয়ে আসা খুব জরুরী। কারণ মানুষেরচে অন্য প্রাণী কিংবা জড় পদার্থ যখন ব্যক্তি বিবেচনায় প্রাধান্য পায় 'তখন কাজটা ঠিক হয়নি' বললেই যথেষ্ট। এতে তেমন ক্ষতি হয় না। ঐ ব্যক্তি সমালোচনার মুখোমুখি হন। কিন্তু যখন কোন বিশেষ সমাজ, দেশ বা রাষ্ট্রে এমনটা হতে শুরু করে যে মানবকুলেরচে অন্য প্রাণীর মর্যাদা বেশি, তাদের পেছনে বেশি শ্রম দেয়া হয়, অন্য প্রাণীর রক্ষণাবেক্ষণ বা বংশ বৃদ্ধিতে যখন সচেতন মহল ব্যাকুল থাকেন তখন নানাবিধ প্রশ্ন জাগে। ইদানীংকালে এ প্রশ্ন অনেক বেশি উঠছে।

জাতীয় ও আন্তজার্তিকভাবে বিষয়গুলো বিশ্লেষণের দাবী রাখে। চিকিৎসক হিসেবে শারীরিক অক্ষমতার কথা আমার ভালই জানা আছে। মৃত্যু কত সহজ, পঙ্গুত্ববরণ কত স্বাভাবিক তা হাসপাতালগুলো ঘুরলে খুব সহজেই টেরপাওয়া যায়। ব্রেইনে একবিন্দু রক্তক্ষরণে, মাথার পেছনে ছোট একটা আঘাতে গলার মাংসপেশীর হঠাৎ সংকুচনে, হৃদপিণ্ডের সঞ্চালনে কোন ছোট ব্যাঘাত ঘটলে, কোন একটা কোষে সামান্য পরিবর্তনে (মিউটেশন) একজন লোক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। শুধু ভয় পেয়েও হঠাৎ হৃদপিণ্ডের গতি বন্ধ হয়ে যায়। শারীরিক কোন কারণ ছাড়াই একজন সুস্থ্য মানুষ মারা যেতে পারে এবং যাচ্ছে যাদের অটোপসিতে, পোষ্ট মর্টেমে কোন ত্রুটি

ধরা পড়ার নজীর নেই। মূলতঃ মানুষের দূর্বল দিকের শেষ নেই। এক ঘুম দিলে মানুষ অচেতন থাকে ফের জেগে ওঠার আগ পর্যন্ত, ঘুমের জগতে সে অন্য মানুষ। তখন স্বপ্ন দেখে। আবার ঘুম থেকে জেগে সে তা ভুলে যায়। সকালে নাস্তার পর বিকালে বলতে পারে না যে মানুষ সে কি খেয়েছে অথবা টেবিলের কোন পাশে বসেছিল সে কেমন শক্তিশালী মানুষ অথচ এখনো সে স্মৃতিভ্রষ্টও নয়। এমনিভাবে ছোট একটা বোঝা বহন করলে কোমর ব্যাথায় রাতভর উহ আহ করতে হয় যে মানুষকে সে কেমনতর বীর। অন্ধকার হলে যে একা পথ চলতে পারে না, চামচিকা বা মাকড়সা দেখলে যার ভয়ে গলা শুকিয়ে যায় কিংবা বাথরুম পায় সে কেমন শক্তিধর মানুষ। বিপদে পড়লেই যে মিথ্যা বলে, আঘাত এলেই যে পাল্টাঘাত করে। উপকার না পেলেই যে ক্ষেপে যায় সে মানুষ কেমন সিংহপুরুষ। প্রতিযোগিতায় হেরে গেলে যে প্রতিশোধ নেয়, ক্ষমা চাইলে যে আরও চেপে ধরে, নিজের মতটা টিকে না থাকলে যে প্রতিহিংসায় জলেপুড়ে ছাড়খাড় হয়ে যায় সে কেমনতর উন্নত মানুষ। এখানেই আমার বারবার মনে হয় আমরা শুধু শারীরিক কেন মানসিকভাবে ও ভীষণ দুর্বল, অক্ষম ও অসামঞ্জস্য পূর্ণ। বরাবরই প্রথম সারির ছাত্র থাকার পরও যখনই ক্লাসের কোন উত্তর সবচে ভালভাবে দিতে ব্যর্থ হয় কোন ছাত্র, তখন তার মনে হবে আমরা কি নিয়ে বড়াই করি। একবার পড়লে মনে থাকে না, একবার বুঝলে আবার বুঝতে হয়- কি ভাল ছাত্র হলাম। শীত আসলেই কাবু হই, জ্যাকেট নিয়ে কম্বল নিয়ে টানাটানি শুরু করি। গরম এলেই এসি না ছাড়লে কষ্ট হয় ফ্রিজের বরফ ছাড়া পানি পান অসম্ভব হয়ে পড়ে- কেমনতর আমাদের শরীর। আমি তাই একজন মানুষ হিসেবে এজাতীয় অহংবোধ কখনো পোষণ করিনি। কেবলই মানুষের দুর্বলতম দিকগুলো আমার গোচরীভূত হয়েছে। সেক্ষেত্রে অন্যান্য প্রাণীকূলের চে মানুষকে খুব দুর্বল মনে হয়েছে আমার। একটা প্রজাপতির ডানার রংটা একজন মানুষের নেই। একটা কোকিলের কুহু ডাকের সমান মধুরকণ্ঠ মানুষের নেই। একটা কুকুরের শ্রবণশক্তির মত তীক্ষ্ণ শ্রবণ শক্তি মানুষের হয় না। তাহলে কে বেশি ক্ষমতাবান? রাস্তায় একটা পাখি ও একজন গাড়ির চালক আটকে আছে। পাখিটা উড়ে গিয়ে ট্রাফিক জ্যাম কভার করলেও দামী গাড়ির চালক জ্যামেই পড়ে থাকে, সে সেখানে অসহায়। জঙ্গলে হঠাৎ বাঘের মুখে পড়া হরিণ দৌড়ে পালালেও মানুষটি পারে না, আবার বানর লাফ দিয়ে গাছের মাথায় উঠে গেলেও মানুষ এখানেও ব্যর্থ হয়। কতভাবে যে মানুষ অসহায়-সে মানুষ কেমনে গর্ব করে, মাথা উঁচু করে অন্যান্য প্রাণীকূলকে গালমন্দ করে আমার বুঝে আসে না। মানুষ এমনতর হাজার রকমের অসহায়ত্ব নিয়ে বড় হয়, বেঁচে থাকে। সবচে বড় অসহায়ত্ব হচ্ছে একদিন মৃত্যুকে বরণ করতে বাধ্য হয়। এ সমস্ত দুর্বলতার কথা মানুষকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই বলেছেন।

প্রাণী হিসেবে মানুষ শারীরিক কোন কারনে অন্য প্রনীর তুলনায় বড় নয়। কারন অন্যখানে। মানুষ শ্রেষ্ঠ হয়েছে অন্যভাবে। তার মধ্যে মানবিক এক দিক রয়েছে যা

www.pathagar.com

সম্পূর্ণ ভিন্ন। যার স্পর্শে ও আলোতে এ দুর্বল প্রাণীটি হয়ে যায় অসাধারণ। অন্যান্য প্রাণীকূলের সকল যোগ্যতা সে নিমিষেই অর্জন করতে পারে। যে দিকটা তাকে প্রচণ্ড শক্তিযোগায়, সীমাহীন উদার করে, দয়ালু করে এবং ক্ষমাশীল করে। যার কারণে সামান্য মানুষটি অসামান্য হয়ে ওঠে, জীবিতবস্থায় সবার হৃদয়ের মধ্যমনি হয়ে থাকে এবং মৃত্যুর পরও যুগযুগ বেঁচে থাকে। এমন অসামান্য যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষের কথা আমরা জানি। তাদের কারণেই পৃথিবী ছোট একটা গ্রহ হয়েও আজ অনেক বড়। এখান থেকেই অন্যান্য গ্রহে রকেট যায়। অন্য গ্রহ থেকে এখানে রকেট আসে না। এই গুনধর মানুষগুলো তাদের মানবিক গুনবলীর কারণেই অমর। মানবীয় যোগ্যতায়ই তারা পৃথিবীকে সুন্দর করে গড়ে তুলেছেন। একই মানুষের মধ্যে যোগ্যতা অযোগ্যতা দুই-ই থাকতে পারে। কোনটা তাকে অগ্রে টানে, কোনটা তাকে পরিচিত করে তোলে সেটাই মুখ্য। সামাজিকভাবে যারা বরেণ্য তারা তাদের মানবিক গুনাবলীর কারণেই টিকে আছেন। মিথ্যা দিয়ে, ছলচাতুরী করে কখনো বেশিদিন মানসপটে টিকে থাকা যায় না। মানুষের প্রতি টান বা মমত্ববোধ অথবা ভালবাসা ঐ মানবিক গুনাবলীরই অংশ। ঐ গুনটা না থাকলে কাউকে ভালবাসা যায় না। আর ভালবাসতে না পারলে মানুষের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় না। তার কল্যাণ অকল্যাণের বিষয়ে কোন গরজ থাকে না। এসবের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে।

সুতরাং আমাদের যেটা বুঝে নেয়া প্রয়োজন তা হচ্ছে, আকার প্রকারে বড় হলে তাৎক্ষনিক শক্তিধর মনে হয়, বিশালত্ব দেখে খুব সহজে ঘাবড়ে গেলেও তার কার্যকারিতা যদি বড়ত্ব প্রমান না করে তাহলে তাকে আর কেউ বড় বলবে না। ভয় করবে না, সেজদায় লুটাবে না। মানুষ প্রাণী তাই অনেক দুর্বল, অক্ষম ও অসহায় ঠিকই এজন্য তার অহংকার করা উচিৎ না, সন্তপর্নে সাবধানে পথ চলা উচিৎ তার মধ্যে যে এক এটম বোমা বাস করে সেটাকে নিষ্ক্রিয় ফেলে না রেখে সজীব রাখলে মানুষ তার শক্তি টেরপাবে। সে নির্জীব শক্তি হচ্ছে, সে এটম বোম হচ্ছে মানবিক মূল্যবোধ। এ কারণটার জন্যই মূলতঃ মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। জৈবিক দিকটাতে মানুষের সাথে অন্য প্রাণীর প্রচুর মিল। ক্ষুধায় মানুষ অস্থির হয়। অন্য প্রাণীও অস্থির হয়, খাদ্য চায়। ক্লান্ত হয়- ঘুমায়, লোভ আছে, ক্ষোভ আছে, প্রয়োজনে হিংস্র হয়, অনুকূল আবহাওয়ায় বিচরণে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। অমিলের চে মিলই বেশি। প্রজনন ক্ষমতা আছে। সন্তান নেয়। সন্তানের জন্য মায়া আছে। সন্তানকে একই প্রক্রিয়ায় আগলে রাখে। এই মানবিক দিকটাই মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা করে ফেলে। মানুষ মূলতঃ এখানেই ভুলটা করে। তার নিজের অবস্থানটা সে প্রায়শঃই সঠিক ভাবে নির্ণয় করতে ব্যর্থ হয়। সে যে অক্ষম ও দুর্বল প্রাণী তা সে স্বীকার করে না কারণ এ বুঝটুকু তার নেই আবার যে কারণে সে অন্যান্য প্রাণীকূলের সর্দার ও শ্রেষ্ঠ সে শক্তিটা সম্পর্কে সে বেখেয়াল। এটা নিয়ে তার কোন মাথা ব্যাথা নেই। আমাদের আলোচনায় একই কথার পুনরাবৃত্তি হবে। এটাও একপ্রকার মানবিক দুর্বলতা। আমাদের মূল বিষয় ও হচ্ছে

www.pathagar.com

'মানুষের কল্যাণ'। সেই কল্যাণ চাইতে গিয়ে আমরা যেন খেই হারিয়ে না ফেলি। কল্যাণকে একদমই বিতর্কের উর্ধ্বে রাখতে চাই শুধুই কল্যাণ কামনায়। কল্যাণ কিংবা মঙ্গলের নাম করে যখন মানুষ অকল্যাণের কিংবা আধা কল্যাণের কাজ করেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের মত তখন বিতর্কিত না হয়ে যায় কোথায়। নিরেট মানব কল্যাণের জন্য কাজ করার মত মানুষ পৃথিবীতে খুব কম। কল্যাণ বা মঙ্গল কামনা করলেইতো হবে না। এজন্য পথ পরিক্রমা পার হতে হবে। বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন। সেখানে কেউ নিজস্ব মত ও পথকে প্রাধান্য দেয়। পরামর্শকের পরামর্শকে পাত্তা দেয় না। নিজের ক্ষমতাকে বড় করে দেখে। ভাগাভাগি অপছন্দ করে। মানবকল্যাণ তখন কেবল কাগুজে ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। মানুষের প্রতি ভালবাসার বিষয়টা আর মূখ্য থাকে না। যেহেতু এটা স্থূলভাবে প্রকাশ না পেলে তাৎক্ষণিক বোঝার কোন উপায় থাকে না তাই 'মানুষকে ভালবাসি, মানুষের জন্য সব পারি'- ব্যানারে অনেকেই অনেককিছু করতে গিয়ে লোকদেরকে প্রতারিত করছে। তিন শ্রেণীর মানুষের এক শ্রেণী শুধুই মানুষকে ভালবাসে, সেই ভালবাসার স্রোতে অবগাহন করে তারা মৃত্যুতেও তৃপ্তি পায়। এরা সংখ্যায় কম। এ শ্রেণীর লোক কম হলেও খুবই প্রভাবশালী ও আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান। পৃথিবীতে একবার জন্মালে তাদের আঁলোতে পৃথিবী উদ্ভাসিত হয়। তাদের পাশের লোকজনকেও তারা এ পথটাতে দ্রুত টেনে আনতে সক্ষম হয় এবং তাদের মাধ্যমেও একই দায়িত্ব পালন করায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদের কোন দায়বদ্ধতা নেই, তারা অন্যপ্রাণীদের মতোই। জৈবিক ব্যাপারটাই তাদের কাছে মূখ্য। তারা শুধুই ভোগ করে। তৃতীয় শ্রেণীর মানুষরা দ্বিতীয় শ্রেণীরচে খারাপ ও ভয়ংকর। তারা যে কোন কারণেই হোক 'ভালবাসি' শব্দের সাথে পরিচিত, এর শক্তি সম্পর্কেও জানে। তাই তারা ভালবাসি বলে কিন্তু ভালবাসে না। ভালবাসতে হলে যে ত্যাগ করতে হয় তার কাছ দিয়ে হাটার সাহসও তাদের নেই। তারা খাদকে ভয় পায় তাই পাহাড়ি রাস্তায় তারা চলাচল করে না। অথচ প্রথমশ্রেণীর মানুষদের মত চিরদিন বেঁচে থাকা তাদের সখ। এরা শুধু কল্যাণের নামে অকল্যাণের কাজই করে না। কল্যাণ শব্দ, ভালবাসা শব্দের সঠিক চরিত্র সম্পর্কেও মানুষের মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি করে।

ভালবাসা নামক যে আগ্নেয়গিরিতে মানবকল্যাণ নিহিত সে গলিত লাভায় অবগাহন করতে হলে আমাদের 'ভালবাসা' শব্দটাকেই বুঝতে হবে। এটাকে গতানুগতিক বর্ণমালার একটা বহুল প্রচলিত ও ব্যবহৃত শব্দ হিসেবে ধরে নিলে চলবে না। শব্দটার অবমাননা করার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে ওটা তো টিনএজ ছেলেমেয়েদের ব্যাপার অথবা ওটা তো টিএসসির যুবক যুবতীরা ব্যবহার করে। আমাদের দেশের মানুষের কাছে সাধারণ বিবেচনায় ভালবাসা শব্দটা নর-নারীর আকর্ষণ বিকর্ষণের মাধ্যম হিসেবে ভাব আদান প্রদানের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। এখানেই ভালবাসা শব্দের যথার্থ ব্যবহার বলে ধরে নেন প্রায় একশ ভাগ লোক। কেউ যদি একটা প্রবন্ধ রচনা

করেন ভালবাসার একাল ও সেকাল, তাহলে অধিকাংশ পাঠকই লেখাটা পড়ার আগেই ধরে নেবেন যে আগের কালে পুরুষ নারীর ভালবাসায় খাঁদ ছিল না এবং দৈহিক সম্পর্কেরচে প্রেমময় ছিল সম্পর্ক আর বর্তমান সময়ের সম্পর্কটা হচ্ছে খাঁদযুক্ত এতে নৈতিকতার ছাপ নেই। হয়তো ভালবাসা প্রকাশের রং ঢং হয়েছে অনেকটা আধুনিক ও চলমান শিল্পনির্ভর। কিন্তু ঐ হেডিং এর লেখাটা পড়ে আমরা কখনোই ভাবতে পারি না যে সত্তুরের ঝড় ও জলোচ্ছাসে বড় ভাই বোনের খোঁজে ভোর না হতেই নৌকাযোগে শ্বশুর বাড়ি হয়ে এ বাড়ি ও বাড়ি পাগলের মত ঘুরে বেড়িয়েছে। মোবাইল, গাড়ির রাস্তা, বেড়িবাধ কিছুই ছিল না তখন। সব গায়ের লোক এক হয়ে গিয়েছিল। শহুরে লোকরা ঢাকার লোকদের অপেক্ষা করেনি। ঢাকার বাসীন্দারা গ্রামের কি হাল দেখার জন্য টেলিভিশনের পর্দার দিক তাকিয়ে থাকেনি। যার যেভাবে সম্ভব ছুটে গিয়েছে দক্ষিণাঞ্চলে। আজ যেসব এলাকাতে সিডর হয়েছে ঠিক সে এলাকাতেই কোন রকমের যান সংকট তাদের ধরে রাখতে পারেনি সেদিন। অথচ আজ সিডর এলাকাতে বাবা মা সহ কত শত আত্মীয়স্বজন রেখে ঢাকায় বাস করছেন ব্যস্ত চাকরিজীবি ও ব্যবসায়ী। কত মানুষের প্রাণহানী হল এরা কেউ ঢাকা ছেড়ে এলাকাতে যায়নি অথচ তাদের কবিতায় শুধুই ভালবাসার কথা। দেশের অন্যাণ্য এলাকার লোকদের কথা বাদ। সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকজনও ব্যবসা ও চাকরিতে ব্যস্ত, আত্মীয়রা বেঁচে আছে। তেমন কিছু হয়নি। কিছু গাছপালা পড়ে গেছে, পুকুরের মাছ নেই আর পাকঘরটা পড়ে গেছে ছোটচাচার। আর তেমন কি! ভালবাসা প্রকাশের ধরণ দু'হাজার টাকা সহ মোবাইলে সমবেদনা জ্ঞাপন মাত্র। ভিনদেশ থেকে লোক এসে ত্রাণবিতরণ করবে, ঔষধ খাওয়াবে আমার মা বাবা আত্মীয় স্বজনকে এতে লজ্জা লাগবে না। আর আমি দাবী করব উন্নত মানুষের জীবনের, এটা কি সম্ভব। তাই ঐ হেডিং দেখে মানুষ একারণেই বিভ্রান্ত হবে যে তার মাথায় আছে ঐ নর নারীর প্রেম বিরহ মূলক ভালবাসা। শব্দ আবিস্কার ও ব্যবহার একটা সাংস্কৃতিক ব্যাপার। এটা জোর করে চাপিয়ে দেয়া যায় না। বহুদিনের ব্যবধানে ঐ বিশেষ এলাকায় বা বিশেষ সংস্কৃতিতে শব্দ তার নিজস্ব স্থান দখল করে নেয়। আমাদের কালচারে ভালবাসা শব্দের মাধ্যমে যুবক যুবতী কিংবা নর নারীর ভালবাসাবাসি ছাড়াও মানবীয় আত্মিক লেনদেনের সম্পর্কটা কখনো সখনো বোঝা গেলেও 'লাভ' শব্দটা দিয়ে আমরা বাংলা ভাষাভাষীরা শুধুই নর নারীর প্রেম বুঝি। শব্দ ব্যবহার ও প্রয়োগের কারণেই এমনটা হয়েছে। মোটেই জোড়াজুড়ি করা সমীচীন নয় এসব ক্ষেত্রে। যা স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে হবার তাই হোক। আমাদের দেশে মৌলিক সমস্যার শেষ নেই। কেবল একটা শব্দ ব্যবহারকে কেন্দ্র করে কোন বিতর্ক সৃষ্টি অনভিপ্রেত। মৌলিক সমস্যা সমূহ আলোচনা করাও আমার লেখার মূল বিষয় নয়। শুধুমাত্র একটা মৌলিক ও আদি বিষয়কে নানান ভাষায়, নানান বর্ণে ও রংয়ে পাঠকের সামনে তুলে ধরাই আমর আসল লক্ষ্য। উদ্দেশ্য যাতে আমরা বিবেচনা করে দেখি মানুষ হিসেবে আমি কতটা মানবীয় গুনাবলী নিয়ে বসবাস করছি নাকি শুধুই মানুষ নাম ধারণ করে আছি। কাজের ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রাণীর মতোই আমার আচরণ,

www.pathagar.com

ব্যবহার ও চলাফেরা। দৃঢ়ভাবে আমি বিশ্বাস করি মানবীয় গুনাবলীর বিকাশ ছাড়া পৃথিবীতে মানুষের সম্পর্ক সুন্দর কোন ভিত্তির উপর দাঁড়ায় না। আর যে সম্পর্কই আমরা গড়ে তুলি না কেন ভালবাসার সিমেন্ট ছাড়া সে সম্পর্ক আদৌ টিকে থাকে না। ঢিলেঢালা হয়ে ঐ সম্পর্কের প্রাসাদ একদিন ধ্বসে পড়বে। এটা নতুন কোন কথা নয়। আমাদের কাছে পৃথিবীর ইতিহাস যতোটা জানা আছে তা তাই প্রমাণ করে। মানুষ যখন তার মানবসত্তাকে বিকশিত করার মানসে অন্য মানুষদের ভালবাসায় আত্মোৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল সেদিন সঠিকভাবে মানুষের সত্তা বিকশিত হল। ভালবাসা পরিপূর্ণ রূপে প্রকাশ পেল এবং মানুষের সমাজ অন্যপ্রাণীদের সমাজ থেকে আলাদা হয়ে গেল।

আমার বাসায় দু'জন বুয়া আজ কাজে এসেছে। গতকাল একজন বুয়াকে দিয়ে গেলেন একজন চাচা। এ মূহুর্তে দু'জনই কাজ করছেন। একজন পাকঘরে অন্যজন বাথরুমে। কি কোরবানী দিয়েছি প্রশ্ন করাতে বন্ধুকে মজাকরে হলেও বলেছিলাম 'কোন কিছু কোরবানী দেয়ার মজা থেকে নিজেকে বিরত রাখার মাধ্যমে এবার কোরবানী দিচ্ছি'। কোরবানী বা হজ্ব সম্পর্কে আমার যা শিক্ষা ও উপলব্দি তা এখানে প্রকাশ করা অবান্তর এবং প্রকাশ করলে পাঠককূল বিরক্ত হতে পারেন এবং ক্ষেপেও যেতে পারেন। এ দুই বুয়ার ব্যাপারে বিস্তারিত খোঁজ খবর আমার জানা নেই। এটুকু জানি তারা পেটের দায়ে আমার বাসায় এসেছে। পেটের দায় যে কি তা যে জানার সেই জানে। আমি তাদের জন্য ভাল বেতন দেওয়া ও দোয়া করা ছাড়া এ মূহুর্তে আর কী বা করতে পারি। সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষে মানুষে যে দাঙ্গা, সংঘর্ষ ও রক্তারক্তি হয়ে আসছে তার মূলে রয়েছে মূলতঃ মানুষের প্রতি ভালবাসার অভাব। সামাজিক দায়িত্বহীনতা, পারস্পারিক অনাস্থা, অবিশ্বাস ও আত্মম্ভরিতা মানুষকে মানবিক পর্যায় থেকে অমানবিক পর্যায়ে টেনে নিয়ে যায়। সে ঠাহর করতে পারে না তার কি করা উচিৎ ছিল আর সে কি করছে। পরপর দুটো বিশ্বযুদ্ধতো গেল শতাব্দীতেই হল। খুব সহজেই পারস্পারিক দোষারোপ করা যাবে, অনেক যুক্তি আত্মপক্ষ সমর্থনে দাড় করানো যাবে তাতে কি বিশাল বিপর্যয়ের কানাকড়ি ও ফেরৎ আসবে। লাখ লাখ মানুষ কি তাদের নিরাপরাধ নিস্পাপ জীবনে ফিরে আসতে পারবে? মানব সৃষ্টির ইতিহাসে এমন কলঙ্কের অধ্যায় কি কোনভাবে মুছে ফেলা যাবে? সেই সময়ের কালের সাক্ষী জীবিত আবালবৃদ্ধ বনিতা যারা ছিলেন তাদের স্মৃতিতে কি যুদ্ধ ও ধ্বংসহীন পূর্বজীবন ফেরৎ দিতে পেরেছিলেন যুদ্ধবাজ বিশ্বমালিকগণ? সম্ভব না, যা হয়ে যায় তা ফেরৎ দেয়া যায় না। এটা যেমন হিটলার, চার্চিল, মুসোলিনিরা বুঝেননি তেমনি বুশ-ব্লেয়াররাও বুঝছেন না। তারা ধ্বংসের মাধ্যমে, মানুষ খুনের মাধ্যমে শান্তি চান। কোন প্রকারের মানুষের জন্য সে শান্তি? ঐ মানুষের সংজ্ঞা কি? তাদের শরীরে কি ভিন্ন রক্ত প্রবাহিত হয়? আশ্চর্য ধরণের সব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। নিজেদের মতামতকে সমাজে টিকানো ও বিকানোর জন্য এসব বিকৃত মস্তিস্কের লোকজন তাদের দোসরদের মাধ্যমে

www.pathagar.com

কাজগুলো করে থাকে। আমি তাদের গালমন্দ পারা থেকে বিরত থাকতে চাই। তাদের জন্য আমার করুনা হয়। এরা শিক্ষা-দীক্ষাও একদম কম পাননি। তাদের একমাত্র পৃথিবীর নেতা ও অধীশ্বর হবার খায়েশ ছিল বলেই ধ্বংস না সৃষ্টি সেদিকে তাকানোর কোন সুযোগ ছিল না। এখানের মানুষকে বোকা বানিয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব কোনরকম প্রমাণ করতে পারলেই হল। তার নিজের কাছেই সে ধরা, সে জানে তার প্রতারণার মাত্রা কত মারাত্মক। এ জীবনের পর জীবন আছে, তাকে আবার এ জীবনের সকল প্রকার ভালমন্দ কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে এমন একটা তাড়না থাকলে সে অতোটা উন্মাদ হয়ে উঠতো না। আত্মসমালোচনা তাকে সীমাহীন পাপাচার থেকে ফিরিয়ে রাখতো। মানুষের প্রতি ভালবাসার দরিয়ায় সে সাতার কাটতো, বারুদের গন্ধে মাতলামির পথ থেকে সে সরে দাঁড়াতো। যে কোন সুস্থ্য বিবেকবান মানুষই বুঝবেন এ পৃথিবীতে অল্প সময়ে দুনিয়ার বিচার ব্যবস্থায় সব বিচার আচার হয় না। অনেক ফাঁক ফোকর থেকে যায়। ধনী হয়ে কেউ জন্ম নিয়ে অধিকতর ধনবান হয়ে সুখের সাগরে ভাসতে ভাসতে মৃত্যু বরণ করেন। অথচ বস্তিতে জন্ম নিয়ে সমাজের অনাচার অবিচার সহ্য করে কোনদিন এক মূহুর্তের জন্য সুখের মুখ না দেখেই কেউ মৃত্যু বরণ করেণ। স্বাভাবিক ভাবেই বোঝা যাচ্ছে এই দু'শ্রেনীর লোকদের যদি পুণঃরায় একটা নিরপেক্ষ বিচরালয়ের সামনে হাজির হবার ব্যবস্থা না থাকে তাহলে পৃথিবীতে আরও মারামারি কাটাকাটি বেড়ে যাবে। কারণ দুনিয়ার মানুষরা মনে করবে পরকাল যেহেতু নেই, অন্যকোথাও যেহেতু জবাবদিহিতার কারবার নেই সুতরাং আমার সর্বশক্তি নিয়োগ করে হিটলারী ও বুশ স্টাইলে আমার ক্ষমতা আমি জাহির করব। আমি জানি আমার লেখার মূল বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়ে অনেকেই লেখাটাকে সময়োপযোগী বলে স্বীকৃতি দিবেন। আমি তাদের এ মতামতকে ও শ্রদ্ধা করি। তাদের কাছে এ আবেদনটুকুই করবো যে, ভেবে দেখবেন মৌলিক মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গি আপনাকে আমাকে অবশ্যই মানুষকে ভালবাসতে শিখাবে। আমাদের একটা সমাজকে এমন দুরাবস্থা থেকে রাতারাতি উন্নতির জন্য সেই মৌলিক মানবগুনের স্ফূরণ ঘটানোই যথেষ্ট হতে পারে।

সাম্যের সমাজ বিনির্মানে আপনার পারলৌকিক কোন কমিটমেন্ট না থাকলে অর্থাৎ মানুষ আল্লাহর সৃষ্টির সেরা জীব, মানুষকে সেবা না করলে আল্লাহর ইবাদাতের অর্থই অনর্থক। আমাদের সমাজে ইসলামের উপস্থাপনা হয়েছে আংশিক। কোথাও খণ্ডিত কোথাও বিকৃত আকারে। বান্দার অর্থাৎ মানুষের হক আদায় না করলে হাশরের ময়দানে তাকে কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। অতএব মুসলিম মাত্রই সদাব্যস্ত থাকবে মানুষকে নিয়ে। প্রথমতঃ তার বাব মা আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে, তারপর প্রতিবেশী, তারপর সমাজের অন্যান্য অভাবী-নির্যাতিত নিপীড়িত লোকদের নিয়ে। এর বাইরে আবার ইসলাম কি? নামাজ বলবেন। সেখানে মানুষের ভেদাভেদ ভুলে যাবার-এক কাতারে দাঁড়িয়ে কাধে কাধ মিলিয়ে আল্লাহর ইবাদতের শিক্ষা দেয়া হয়। যিনি ভালকাজে অগ্রগামী তাকে ইমাম বানানোর নির্দেশ আছে। রমযানেও নিজের সকল

www.pathagar.com

রিপুকে অবদমন করে আল্লাহর সৃষ্টি মানুষের জন্য খাবার নিয়ে তাদের কাছে যাবার শিক্ষা দেয়, যাকাততো আরও সরাসরি অভাবীদের হকের কথা বলে। ধনীদের টাকায় গরীবের হক পাওনা আছে। ধনী হিসাব করে গরীবের দরজায় টোকা দিয়ে সে টাকা দিয়ে আসতে বাধ্য। এখন ভেবে দেখুন যে ব্যক্তি সমাজে ধনবান হবেন তার দায়িত্ব ও কর্তব্যটা কত বেশি। আর যিনি অভাবী তাকে আল্লাহ এভাবেই দায়িত্ব মুক্ত করেছেন। হজ্বে মহামিলনের মাধ্যমে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দেয়। যদিও এখানে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ তথা সকল মানবগোষ্ঠির জন্য এক বছরের একটা পরিকল্পনা ও ডিকলারেশন আশার কথা ছিল, তা আসে না। এটাও পরিবর্তিত পরিস্থিতি যা মানুষের জন্য সুখকর নয়। আর তাই যারা পারলৌকিক প্রসঙ্গ থাকলে বিরক্ত হন তাদের কাছে আমার নিবেদন, একবার কুরআনটা বাংলা গল্পের মতো করে হলেও পড়ে ফেলুন। আপনিতো কতো লেখকের লেখাই পড়েন। আমি তো আপনার মতই একজন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ। আপনাকে এমন আবেদন আমি করতেই পারি। কারন আমি আপনার কল্যাণকাঙ্খী একজন মানুষ, আপনার বন্ধু। কুরআন পড়লে আপনার অন্তর আত্মা খুলে যাবে। পারলৌকিক প্রসঙ্গ ধর্মীয় প্রসঙ্গ শুনলে যাদের গায়ে জ্বর আসে তাদের এক শ্রেণীর লোকদের কিছু যুক্তিকে আমিও মানি। ধর্মীয় অপব্যাখ্যা এবং স্বার্থান্বেষী এক শ্রেণীর লোকদের ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবের কারণে এমনটা হয়েছে। ছোট একটা উদাহরণই বিষয়টাকে পরিস্কার করতে পারে। যেমন এক সময় রেডিও শোনা না জায়েজ মনে করা হত। এবং টেলিভিশন দেখা হারাম ঘোষনা করা হয়েছে। কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই কথাগুলো শুনলে যে কোন মানুষেরই খটকা লাগার কথা। আসলে রেডিও টেলিভিশন এসব হচ্ছে যন্ত্র। আধুনিক প্রচার মাধ্যম। এসবের হাত পা নেই, বিবেক বুদ্ধি নেই। আমরা বাস্তব জীবনে যেসব কাজ করি তার মধ্যে ইসলামের দৃষ্টিতে বর্জনীয় ও প্রশংসনীয় দু'ধরনের কাজ রয়েছে। যা আমরা বাস্তব জীবনে করতে পারি নিষেধ নেই অর্থাৎ হারাম না সেটা রেডিও টেলিভিশনে প্রচার করতেও বাধা নেই। অর্থাৎ এর বিপরীত অযৌক্তিক ফতুয়া যখন কোন লোক ইসলামের পক্ষে দেবেন তখন মানুষের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হবে বৈ কি! তবে সময়ের ব্যবধানে মানুষ এখন বুঝতে পেরেছে, ইসলামকে বুঝার জন্য কুরআনকে বাংলা ভাষায় আমাদের শিক্ষিত মানুষের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে। দ্বিতীয় একটা বড় কারণ হচ্ছে এক শ্রেণীর ইসলাম প্রিয় ব্যক্তিরা অতি সস্তায় জান্নাত পাবার ব্যবস্থা রেখেছেন। যা যে কোন বিবেকবান লোকের কাছেই গ্রহণ যোগ্য নয়। গতকাল এলেখাটা শুরু করার দশ মিনিটের মাথায় আমার কাছে মসজিদ থেকে একটা দল এলো ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য। তাদেরকে আমার রুমে প্রবেশের সাদর আমন্ত্রণ জানালে দু'জন ঢুকলেন। বসার অনুরোধ করলেও বসলেন না। বললেন বরগুনা থেকে গ্রুপ এসেছে, ঘূর্নি দুর্গত এলাকা থেকে। আমি তাদেরকে আহ্বান করলাম কি লাগবে জানার জন্য। সন্ধ্যার পর ঈমান আমলের উপর কথা শোনার জন্য দাওয়াত দিলেন। বিশ বাইশ বছরের ছেলে। মাদ্রাসার ঢং এ লম্বা জুব্বা। মাথা কান রুমালে পেচানো। খুব কষ্ট পেলাম। অস্ফুটস্বরে

www.pathagar.com

বললাম তোমার এলাকার মানুষ মরে গেছে, মানুষ আর পশুর লাশ একত্রে ভাসছে দাফনের সুযোগ পাচ্ছে না, খাবার নেই, নেই পানি, মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। আর এ তরুন এসেছে ঈমান আমলের দাওয়াত নিয়ে। এ ইসলামের দাওয়াত কি কেউ নেবে? কোন সুস্থ্য মানুষ। যে এলাকায় তার ঈমান-আমলের পরীক্ষা দেয়ার কথা অর্থাৎ বরগুনা, পাথরঘাটা, বেতাগী, মৃজাগঞ্জ জুড়ে সকল মানুষের সামনে ইসলমের শাশ্বত ও বাস্তবরূপ তুলে ধরার কথা তা না করে সে আমাদেরকে দাওয়াত দিতে এসেছে যারা ঐ এলাকায় পাঁচ বার গিয়ে ত্রান ও ঔষধ দিয়ে এসেছে। সিডরে মানসিক বিপর্যয়ের উপর গবেষণা শুরু করেছে। এসব দেখলে খুব কষ্ট লাগে। এ কষ্ট কাউকে বলা যায় না। আমি আবারও বললাম তোমার এলাকায় সাদা চামড়ার বিদেশীরা ঘর তৈরী করে দিচ্ছে, ঔষধ দিচ্ছে আর তুমি সফরে বেরিয়েছ। আল্লাহ কি এতোটাই অবিবেচক (নাউজুবিল্লাহ্)? জান্নাত কি দরিয়ার নোনা জল-হাত বাড়ালেই পাওয়া যাবে? ইসলামের অপব্যাখ্যা দিয়ে যদি কেউ ফায়দা আদায় করে তাদের সামাজিক ভাবে রুখতে হবে। সেজন্য ইসলামের শাশ্বত রূপতো দায়ী নয়। আর একটা কারণ হচ্ছে ইসলামকে পালন করতে হলে কিছু ত্যাগ তীতিক্ষা প্রয়োজন হয়। কিছু নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয়। এই ত্যাগ স্বীকার ও নিয়ম কানুন মেনে চলার জন্য যিনি প্রস্তুত হবেন না তার পক্ষে ইসলামকে অনুসরণ করা সম্ভব না। বিশ্বের প্রচলিত অন্যান্য ধর্মে বাধ্যবাধকতা এতোটা বেশি নয় বলে কোনটা পালন করলে সকল ধরণের সংস্কৃতি অপসংস্কৃতি অনুসরণ অনুকরণ করা যায়। তাই ইসলামকে নিয়েই এতা টানাটানি। একজন মুসলমানের ঈমান আনার পর নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত আদায় যেমন প্রাথমিক কাজ। তদ্রুপ সৎ কাজের আদেশ দান এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার প্রচেষ্টা চালানো প্রাথমিক কাজের অংশ বিশেষ। সামাজিক দায়বদ্ধতা ইসলামে এতোটা সুনিপুণ ভাবে সজ্জিত যা জানলে অনেক মানবতাবাদী ব্যক্তিবর্গ বিশ্বের বিভিন্ন কর্ণার থেকে মুসলিম হবার জন্য ঝাপিয়ে পড়তেন এবং আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে হচ্ছেও তাই। আজ বিশ্বজুড়ে মানুষের মনে ইসলামের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ বেড়েছে। আল কুরআনে কি আছে তা জানার আগ্রহের শেষ নেই। প্রতি বছর পাশ্চাত্য জগতে প্রচুর ধনী ও শিক্ষিত লোক মুসলিম হচ্ছে। আমি যে প্রসঙ্গে কথা বলছিলাম যদি ইসলামকে আপনি না ধারণ করেন তাহলে আপনার মানবিক গুনাবলী সমূহ বিকশিত হবে না পুরোপুরি। কি কারণে আপনি কষ্ট স্বীকার করবেন? মানবিক কারণের যেখানে পরিসমাপ্তি হবে সেখানে পারলৌকিক, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মতো একটা চাহিদা এসে আপনাকে আরও ত্যাগী, আরও কষ্টসহিষ্ণু আরও দানশীল হতে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করবে। আমাদের প্রিয় নবীর পুরো জীবনটাই কষ্ট আর কষ্টে ভরপুর। শুধু শারীরিক নয় তার মানসিক যাতনার কোন শেষ ছিল না। রাসুল (সাঃ) ইচ্ছা করলেই যে সমাজের রাষ্ট্রনায়ক হতে পারতেন বিনা যুদ্ধে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়- সেখান থেকে তিনি বিতাড়িত হয়েছেন, রক্ত ঝড়িয়েছেন। এসব ইতিহাস পাঠকদের জানা। ইসলাম

www.pathagar.com

যতটুকু মানবতা শিক্ষা দিয়েছে তার কানাকড়িও আমাদের মধ্যে নেই। থাকলে আমাদের অবস্থা এতোটা খারাপ হত না।

মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো বিশ্বজুড়ে একই রকমের। জৈবিক চাহিদা তার মধ্যে সবচে বড় এবং প্রধান। ক্ষুধার তাড়নায় আমাদের খাদ্য প্রয়োজন এবং তা বলতে গেলে প্রতিদিনই কয়েকবার খেতে হয়। হাইপোথ্যালামাসের হাংগার সেন্টার যখন জেগে ওঠে তখন না খেলে আর উপায় থাকে না। পেট চো চো করে। এদিক সেদিক করে খাদ্য সংগ্রহ করতে না পারলে বিকল্প পথে পা বাড়ায় মানুষ। চুরি ডাকাতি ছিনতাই করতেও সে পিছপা হয় না। যারা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তাদের এক শ্রেণী হচ্ছে এই পেটের যন্ত্রনায় বিপথগামী লোকজন। ক্ষুধার মত মৌলিক তাড়না যে কত কষ্টের ও ভয়াবহ হতে পারে তা আমরা মোটেই টেরপাই না। কারণ এ অবস্থাটা আমাদের হবার আদৌ সম্ভাবনা নেই। আমরা কোন কারণে ঘর বাড়ি সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেলে আমাদের সার্টিফিকেট আমাদের ঢাল হয়ে দাঁড়াবে। রমযানে রোজায় আমাদের ক্ষুধার তাড়নার যন্ত্রনাটা উপলব্ধি করার কথা ছিল। কিন্তু আমাদের ফ্রিজভর্তি খাবার আর পকেট ভর্তি টাকা সে অনিশ্চিয়তা দূর করে দেয়। আমরা আশ্বস্থ হই। আর এক ঘন্টা পরইতো ইফতারির টেবিলে ঝাপিয়ে পড়া যাবে। ক্ষুধার যন্ত্রনায় যে শিশু বর্ষাভেজা অসহায় কাকের মত দিনভর কাঁদতে থাকে আর ঝুপড়ির সামনে হামাগুড়ি দিতে দিতে মেইন রাস্তার দিকে চলে যেতে থাকে তার ভবিষ্যত কি। তার বেঁচে থাকার মূল্য কতটুকুন। এ দৃশ্য ঢাকা শহরের যত্রতত্র অলিতে গলিতে আমাদের চোখে পড়ে। পার্কে, ফুটপাতে, মসজিদের সিঁড়ি গোড়ায় এমন শিশুমুখ অজস্র আমরা দেখি। অনেক শিশুকে তাদের বাবা মা ভিক্ষার সময় বহন করে নিয়ে চলে। বাচ্চাগুলোর রোদ বৃষ্টিতে বেশ কষ্ট হয়। তারপরও ওদের চেহারা দেখলে যারা ভিক্ষা দেন তাদের মন গলে তাই ওদেরকে ব্যবহার করা হয়। ভিক্ষুকরা জানে কি করলে ভিক্ষা পাওয়া যাবে, তাই কৌশল হিসেবে তারা তাই ব্যবহার করে। ভিক্ষার সময় চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন এবং রোগ উপসর্গ দুটোই উপস্থাপন করে অনেকে। কেউ এলিফেনথিয়াসিস রোগের বিশাল হাতি মার্কা পা অথবা পেটের ছিদ্র দিয়ে কোন রস বেরোনোর দৃশ্য দেখিয়ে ভিক্ষা করে। কেউ বলে অপারেশনের জন্য টাকা প্রয়োজন। ভিক্ষুকরা পথচারীদের গাড়ির লোকদের অনেক জ্বালায় এমন মন্তব্য আজকাল খুব শোনা যায়। ভিক্ষাবৃত্তিতে যেহেতু একদম বিনা খরচেই ভাল আয় হয় তাই অনেকেরই এ পেশাটা প্রিয়। গ্রাম থেকে বৃদ্ধদের ঢাকায় আগমন চোখে পড়ার মত। ক্ষুধা এখানেও জড়িত। সখে কেউ ভিক্ষা করে না। যারা পেশাজীবী ভিক্ষুক তাদের কথা ভিন্ন। ওদের শিকড় অনেক গভীরে। ক্ষুধা নিবারনের জন্য খাদ্য প্রয়োজন। এই মৌলিক চাহিদাকে কেন্দ্র করেই আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের সারাদিনের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। কি ঘাট শ্রমিক, কি রিক্সাওয়ালা, কি একজন জেলে, কৃষক অথবা গার্মেন্টস শ্রমিক। শিশুশ্রম আমাদের দেশের বিশাল এক সমস্যা। যে বয়সটাতে এ শিশুদের স্কুলমুখী হবার কথা

www.pathagar.com

সে বয়সটাতে তারা অন্যত্র বিরাজমান। কেউ মিনতি টানে, কেউ হোটেলে কাজ করে, কেউ লেদ মেশিনে শ্রম দেয়, কেউ গার্মেন্টস এ সহকর্মী হিসেবে কাজ করে, আর গ্রামের ছেলে মেয়েরা অধিকাংশই কৃষি কাজে শ্রম দেয়। আজকাল স্কুলের যাবার হার অনেক বেড়েছে। কিন্তু এরাই আবার ফাঁক ফোকরে এসব কায়িক শ্রমে জড়িয়ে পড়ছে। বাস্তবতাও তাই। এ ছাড়া মানুষের কাছে এটা ফুটে উঠেছে যে পড়াশোনার কোন দামই নেই। সবাইতো বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে না। তাহলে এই মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে লাভ কী! আমাদের আজকের শিশু কিশোররা আগামী দিনের রাষ্ট্র পরিচালক, সচেতন নাগরিক হবে। তাদের শারীরিক ও মানসিক প্রাবৃদ্ধি দেখলে কান্না পায়, হতাশ হতে হয়। কেবল ঢাকা শহরের গোটা কয়েক হাতে গোনা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরাই তো দেশের নাগরিক না। দেশের বাকী স্কুলগুলোতে কি পড়ানো হয়, কারা পড়ে, কত ভাগ শিশু এখনো স্কুলমুখী নয় এসব কি আমাদের জানা আছে! এসব ব্যাপারে রাষ্ট্র কিংবা সমাজের উদ্যোগ কি! কারও কারও মতে তাৎক্ষনিক সমস্যা মেটানোর জন্য বাবা মারা শিশু কিশোরদের স্কুলে না পাঠিয়ে ঘরের কাজে লাগান, শিশুশ্রমে নিয়োজিত করে দু'পয়সা রোজগার করেন। মানুষের মৌলিক এ সকল চাহিদা মেটানোর দায়িত্ব কি ঐ ব্যক্তির নিজের? তার অক্ষমতাই কি তাকে ক্ষুধার সাগরে ফেলে দিয়েছে আর সেখান থেকে বাঁচার জন্য সে বিপথগামী হয়ে চুরি ডাকাতি করছে? রাষ্ট্র বা সমাজপতিদের কি কোন ভূমিকা নেই এখানে? দারিদ্র বিমোচনের কত শ্লোগানইতো আমরা শুনি কিন্তু দারিদ্র কেন ঘাড়ে এভাবে জেকে বসে আছে? ধনী গরীবের ব্যবধান কেনই বা প্রতিনিয়তই বেড়ে যাচ্ছে। মানুষ কেন অনিশ্চিয়তা ও পেরেশানীর মধ্যে দিন কাটাচ্ছে? এ প্রশ্নের জবাব কি? মানুষের কাছে কি মানুষের বিন্দুমাত্র মর্যাদা আছে? মানুষকে মানুষ বলে যখন আমরা বিবেচনা করি না তখনই তুচ্ছ জ্ঞান শুরু করি। অবজ্ঞা করি, অবহেলা করি, ঘৃণা করি, নির্যাতন করি। আমরা যদি মানুষকে তার মর্যাদাটুকু দিতে জানতাম তাহলে নিশ্চয়ই ধ্বংস ডেকে আনার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি করতাম না। পৃথিবীর অমঙ্গল, অকল্যাণ ও অশান্তির মূল কারণই হচ্ছে সৃষ্টির এই সেরা জীবের প্রতি অবিচার। অবিচার অর্থাৎ তাকে তার স্থানে রেখে মূল্যায়ন না করা। মানুষকে তার সামান্য ভুলের জন্য যেমন মাত্রাতিরিক্ত শাস্তি পেতে হয় এ সমাজে। আবার আর এক শ্রেণীর মানুষের সীমাহীন অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার ও নির্যাতনের পর ও তাদেরকে সমাজ কিছুই বলে না, সে কারনে সমাজে শান্তি আসে না আসে অশান্তি। সমাজের চোখ, দৃষ্টিভঙ্গি অনেক শক্তিশালী তাকে কেউ রাতারাতি বদলাতে পারে না। কিন্তু যারা সমাজকে পরিচালনা করেন তারাও মানুষ এবং এদের অধিকাংশ লোকই শিক্ষিত, কেউ কেউ উচ্চ শিক্ষিত। তারা দেশের বাইরেও সরকারী, বেসরকারী কাজে ভ্রমণ করেছেন। অনেক ধরণের শিক্ষা নিয়েছেন। তাদের এ শিক্ষার বহিঃপ্রকাশও আমাদের কখনো কখনো চোখে পড়ে। তবে দুঃখের বিষয় এ সকল লোকের কর্মকাণ্ড যতোটা না সমাজকে গড়ার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে তারচে ধ্বংসের কাজেই বেশি ব্যবহৃত হয়। বিগত এক বছরে আমরা অনেক শিক্ষিত বিজ্ঞ লোকদের

www.pathagar.com

অপকর্মের ফিরিস্তি দেখেছি। এখনো অনেক নাম আসেনি হয়তো, একদিন তাদের ব্যাপারেও আমরা জানতে পারব। অপরাধের তো শেষ নেই। সবগুলো সরকারের আমলে এসব অপকর্মকে প্রশ্রয় দেয়া অথবা উৎসাহিত করা আমাদের দেশের রাজনীতির এজেন্ডা হয়ে গেছে এবং একটা সামাজিক রীতিতে পরিণত হয়ে গেছে। কেন হঠাৎ এদের প্রসঙ্গ তুললাম। কারণ এ সকল সমাজ পতিরা কমবেশি পড়াশুনা করেছেন। রাজনৈতিক মঞ্চে তাদের বক্তব্য শুনলে তাদের দেয়া উপমা, যুক্তি উপস্থাপনা, বিরোধীদের যুক্তিখন্ডন ও অন্য নেতাদের চরিত্র হরণ প্রক্রিয়া শুনলে তাদের আক্ষরিক জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি বলতে অসুবিধা হবে। সচিবালয়ের ব্যক্তি বর্গরাতো উচ্চ শিক্ষিত। যারা অপকর্মের দোসর হয়েছেন তারা খুব চালাক লোক। অনেকেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এমন অপকর্মে শরীক হয়ে। কারণ রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতায় বসানোর ক্ষেত্রে তার সীমাহীন ভূমিকার জন্য তাকে পুরস্কার হিসেবে দ্রুত প্রমোশোনের ব্যবস্থা করে আসল চেয়ারে বসানো হয়েছে। তিনি আবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। এরা কি জানেন না কল্যাণ-অকল্যাণ। ভাল-মন্দ কি তাদের কাছে অপরিচিত শব্দ? মোটেই না। তারা দেশের কি হল বা না হল, মানুষ সুখে থাকল কি না অথবা মানুষের মধ্যে হানাহানি কাটাকাটি বেড়ে যাবে কিনা, দারিদ্রতা-বেকারত্ব কমবে না বাড়বে এসবে তাদের কোন মাথা ব্যাথা নেই। কেবল নিজ পরিজন সন্তানদের নিয়ে তাদের চিন্তা। বিদেশের মাটিতে ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনা ও বসবাসের ব্যবস্থা হয়ে গেলেই সবাই হাফ ছেড়ে বাঁচে। এ দুর্বলতা থেকে কেউ বেঁচে নেই। অন্য মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা না থাকার কারণে, হৃদয়ে ন্যূনতম মানুষের প্রতি ভালবাসা না থাকার জন্যই ঐ সকল রাজনীতিবিদরা, সমাজপতিরা,আমলারা দেশের বিরুদ্ধে যায়, জাতির স্বার্থবিরোধী যে কোন কর্মকাণ্ড করে ফেলতে পারেন। বিগত সরকারগুলোর আমলে গ্যাস ফিল্ডের চুক্তি, কয়লা খনির চুক্তি, মিগকেনাসহ হাজারো চুক্তি যে দেশের কল্যাণের জন্য নয়, দেশের অভুক্ত মানুষের ক্ষুধা নিবারণের জন্য নয়, বেকার লাখ লাখ শিক্ষিত যুবক যুবতীদের জন্য নয় তা কার না বোঝার ক্ষমতা আছে। যে কোন পেশার কথাই আসুক না কেন সব পেশাগুলোতেই দুর্নীতি বাসা বেধে আছে। দুর্নীতি এমনভাবে নার্সিং পেয়েছে অনেক ভালমানুষও আজ নিজের চেহারা আয়নায় দেখতে ভয় পায়। এ অবস্থাটা, আমাদের অবশ্যই কাম্য না। পদস্থ ঐ সকল সরকারী চাকরিজীবী, দেশবরণ্য ঐ সকল ব্যবসায়ী অথবা আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত ঐ সকল এনজিও কর্মীদের যদি জিজ্ঞেস করি যে আপনারা দুষ্ট রাজনীতিবিদদের অপকর্মে সহযোগিতা করেছেন, হালুয়া রুটি খেয়েছেন বলেই তারা তাদের অপকর্ম চালিয়ে যেতে পেরেছে, আপনারা কি অস্বীকার করতে পারবেন কথা সত্যি নয়। আপনার নিজের ব্যক্তিস্বার্থে আপনি ছিলেন অন্ধ। অন্য কারও তোয়াক্কা আপনি করেননি। বিবেককে তালাবদ্ধ করে রেখেছিলেন। পেছনে ফেলে আসা আপনার গ্রাম্য বাল্যজীবন, মফস্বল শহরের কৈশরের চেতনা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্যাগ- ন্যায়ের পথে লড়তে গিয়ে কারারুদ্ধ হওয়া সব 'ভুলে গিয়েছিলেন। মানুষকে ভালবাসার সে স্বাদ ভুলে গিয়ে

www.pathagar.com

সরকারী পদোন্নতির স্বাদটা আপনার চিহ্বায় লেপ্টে গিয়েছিল। এখন আপনার কি ভাবনা আপনিই জানেন। আপনাদের বিবেক মরে গেছে, আত্মাও নির্জীব। আপনি কি একবারের জন্য 'না' বলতে পারতেন না? চাকরি হারালে কি হত না খেয়েতো আর মরতেন না। আপনাদের অসহযোগিতায় কোটি মানুষ সুন্দর জীবন ভোগ করতো, আপনি চাকরি হারিয়েও শান্তি পেতেন। সরকারের মন্ত্রীরা বিপাকে পড়তো, সরকার মন্ত্রী পরিবর্তনে বাধ্য হত। কোন ব্যক্তি ক্যান্সারে মারা গেলে আমরা তার মৃত্যুদেহটা দেখি। রোগটাকে এভাবে বর্ণনা করি 'শরীফ সাহেব ফুসফুসের ক্যান্সারে মারা গেছেন। মূলতঃ শরীফ সাহেবের ফুসফুসের একটা সেলে প্রথম পরিবর্তন ঘটে, স্বাভাবিক ফুসফুসের কোষ থেকে অস্বাভাবিক ক্ষতিকর কোষে পরিণত হয় এবং ক্রমান্বয়ে তা সংখ্যায় দ্রুত বাড়তে থাকে। একসময় এ ক্যান্সার দেহের অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়ে। হতে পারে ব্রেন বা কিডনীতে। ক্যান্সার যেমন একটা সেল থেকে ছড়ালো একটা জীবদেহও একটা কোষ থেকে মাল্টিপ্লাই করে পূর্ণতা লাভ করে। সুতরাং কোন সমাজকে নতুন করে গড়ার প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণের আহ্বান টাও কারও পক্ষ থেকে আসতে হবে। যে সমাজে সমাজপতিরা নষ্টামির জাল ফেলে রেখেছে সে জাল ছিড়ে বেড়িয়ে আসার উদ্যোগ তো কাউকে না কাউকে নিতে হবে। আপনি শিক্ষিত সরকারী কর্মকর্তা কেন প্রতিবাদ না জানিয়ে তাদের সাথে কণ্ঠ মিলাচ্ছেন, বুক মিলাচ্ছেন? জানেন তো আপনাদের সিদ্ধান্তে দেশ ও দশের ক্ষতিটা কত ভয়াবহ হয়ে যাচ্ছে। আপনার পরিচয়টা সবাই জানে ভাল মানুষ হিসেবে, ভালই কেবল না, বিচক্ষন মানুষ হিসেবে জানছে। কারন পত্রিকার পাতায় আপনার লেখা সকলের দৃষ্টি কেড়েছে। আজ আপনি বলুন বিগত দুইটা সরকারের সময় আপনি টানা মন্ত্রনালয়ে আছেন, আপনার চাতুড়তার কারনে দুই সরকারের আমলেই সুবিধা পেয়েছেন, প্রমোশন নিয়েছেন। আজ আপনার সকল কর্মকাণ্ড ফাঁস হয়ে গেছে। আপনি বিব্রতবোধ করছেন। আপনি এবং আপনার মত অনেকেই ভেবেছিল কিছুই হবে না। আমরাও অনেকে জানতাম সম্ভবতঃ এদের কিছুই হবে না। কিন্তু দেখা গেল না, কিছু একটা হয়েছে। সত্যিকার বিচার কারও হবে কিনা কে জানে। তবে যতটুকু হয়েছে এতটুকুন এদেশের মানুষ ভাবতে পারেনি। মানুষ বিচার না দেখে দেখে অভ্যস্থ হয়ে গেছে, তাই তার বিচার হতে পারে ভাবতেও পারে না, কল্পনা করতেও ভুলে গেছে। যা বলছিলাম। আপনাকে তো রাজনীতিবিদরা বন্দুকের নলের মাথায় একাজ করতে বাধ্য করেনি। আপনি এদেশের সাধারণ মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার কথা জানেন, তাদের দুরবস্থা দূরীকরণে কি ভূমিকা নেয়া প্রয়োজন তা বোধ করি একজন ডক্টরেট ডিগ্রীধারী লোক হিসেবে আপনার অজানা নয়। আপনি একদমই নিজস্বার্থে একাজগুলো করেছেন। আপনার গুলশানের বাড়ি কেনার জন্য ছেলেমেয়েদের আমেরিকায় লেখাপড়া করানোর জন্য, মালয়েশিয়ায় 'মাই সেকেণ্ড হোম' খরিদ করার জন্য টাকা বানিয়েছেন। নিজে চুরি করেইতো ক্ষান্ত হননি, আপনার অধীনস্থ লোকদেরকেও চুরি করার সুযোগ করে দিয়েছেন। এমনটা তখনই হয়, যখন কোন মানুষের সমাজের প্রতি, মানুষের প্রতি কোন কমিটমেন্ট থাকে না।

মানুষের প্রতি দরদ, মায়া, ভালবাসার অভাব থাকলে তাদের মাধ্যমে এমন দুর্নীতিই নয় যে কোন খারাপ কাজ করা সম্ভব হয়। এসকল অবিবেচক ও পাশবিক প্রবৃত্তির লোকরাই দু'টা বিশ্বযুদ্ধে অজস্র মানুষকে খুন করেছে। আমাদের দেশেও একাত্তুরে নির্বিচারে নির্মমভাবে মানুষ খুন করেছে এজাতীয় খারাপ মানুষেরা। মানুষের প্রতি ভালবাসা থাকলে তারা কিভাবে পারে মানুষকে অকাতরে খুন করতে? একটু ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করলেই আমরা দেখতে পাব যে অধিকাংশ খুন, ধ্বংসলীলা ঘটানো হয় হিংসা বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা বা যশ-খ্যাতি পাবার তাড়নায়। নিরেট মানব কল্যাণ বা মঙ্গলের জন্য কেউ বিশাল ধ্বংসযজ্ঞতো দূরে থাক অতি সামান্য রক্তপাতও কামনা করবে না। মানুষকে ভালবাসার বিভিন্ন নিদর্শন পৃথিবীতে যুগ যুগ ধরে আছে। সেসব শাশ্বত নির্দশন বিশ্লেষণ করলে সহজেই অনুমান করা যাবে মানুষের প্রতি যাদের শ্রদ্ধাবোধ আছে, যারা অন্য মানুষকে নিজের মতই মনে করে তারা সদা তৎপর থাকে মানুষের উন্নতির, শৃঙ্খলা মুক্তির, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির। সর্বোপরি সুন্দর জীবনে অধিষ্ঠিত করার প্রত্যাশায়। এমন মানুষ আমাদের সমাজে কম থাকলেও আছে। তারা সংঘবদ্ধ না হলেও তৎপর আছে। তারা নানান হেডিং-এ তাদের মানবিক দুর্বলতা সহ আছেন, অল্পতে তুষ্ট তারা। তাদের প্রচেষ্টা যদি তারা স্ব স্ব স্থানে থেকেই বৃদ্ধি করেন তাহলে আর যা হোক খুন খারাপি সমাজে কমবে। রাজনৈতিক দলগুলোর অকারণে হানাহানি, হ্রেষাহ্রেষী কমবে, ঐক্যমতে পৌঁছবে দলগুলোর নেতারা। মানুষকে ভালবাসেন এমন লোকদের মধ্যেও পছন্দ, অপছন্দ থাকতে পারে, সব বিষয়ে মতৈক্য নাও থাকতে পারে কিন্তু তারা কাউকে ঘৃণা করে তাদের অযৌক্তিকভাবে সমাজচ্যুৎ করার নামে রাষ্ট্রে অশান্তি ডেকে আনবেন এমনটা আশা করা যায় না। মানবতাবাদী লোকদের দৃষ্টি থাকে অনেক দূরে। তারা ব্যক্তি গোষ্ঠিরচে রাষ্ট্র, জাতি, পৃথিবী মানবকূলকে অনেক বড় করে দেখেন। তারা নিজেরা স্বপ্ন দেখেন ও মানবসমাজকে স্বপ্ন দেখান। মানুষের পরিচয় তাদের কথায়, কাজে, লেখনীতে তুলে ধরেন। ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে স্বার্থপর সমাজপতিদের চোখ রাঙ্গানিকে উপেক্ষা করে তারা ভাগ্যাহত ঐসব মানুষের জন্য নতুন সমাজ বিনির্মানে থাকেন সদা তৎপর। তাদের শক্তি তাদের আত্মবিশ্বাস। আত্মোপলব্দি থেকে এরা দৌড় শুরু করে, নিজস্ব চেতনা তাদের এ বিপরীত স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে বেড়ায়, আর আত্ম সমালোচনা তাদেরকে নিরপেক্ষতার আসনটা থেকে সরে যেতে বাধা দান করে। মানুষকে ভালবাসা ইবাদাত মনে করে তারা সংসারের অনেক দায়িত্ব সরিয়ে নিয়ে আসে রাস্তায়, বস্তিতে। নাম না জানা শিশুদের স্কুলমুখী করার দায়িত্ব নিয়ে নেয় নিজের কাধে। টীকা দিবস পালন, যুবকদের স্কিল বাড়ানোর মাধ্যমে কিভাবে চাকরি দেয়া যায় সে চিন্তায় বিভোর থাকে সর্বক্ষণ। এদের একটা নেশায় পেয়ে বসে। নেশাখোররা নেশাবস্তু সেবনের পর সে বস্তু থেকে আর দূরে থাকতে পারে না। বারবার ছুটে যায় ঐ নেশাবস্তুর নিকট। না গেলেই নয়। সমাজ পাগল, মানুষ প্রেমী মানুষগুলো তাই পুরো সমাজটাকে একআত্মা মনে করে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। তারা জানেন চোখ বুজলেই সব শেষ। এক

www.pathagar.com

কাফনের কাপড় সবাই পড়ে কবরে যায়, এক চিতায় সবাই ভস্ম হয়। জন্মানোর সময়তো আরও বেহাল অবস্থা। তাহলে এতো অহংকার আর দাপট কেন। আপোষে সোজা হয়ে গেলেই হয়, ঝামেলা মুক্ত- দ্বন্দ্বহীন জীবন। জীবনের প্রয়োজনের যদি একটা সীমারেখা টানা যায় তাহলে এরচে ভালজীবন আর কি আছে। মনোবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে প্রয়োজনকে সীমিত করে জীবন যাপনের দর্শণকে ফিট করতে পারাটাই একটা বিজয়। প্রয়োজন একটা আপোক্ষিক ব্যাপার। ক্ষুধা একটা মৌলিক চাহিদা। তা সত্বেও একই ক্ষুধার তাড়নায় একেকজন একেক রকম সাড়া দেয়। আবার অনেকে ক্ষুধা টেরই পায় বেশ বিলম্বে। যাই হোক এইসব আপেক্ষিকতাকেও নজরে আনতে হবে। যারা জীবনভর মানব কল্যাণে কাজ করবেন তারা ইহলোকে কিছু চান না। তারা তাদের মানসিক তৃপ্তির জন্য করেন। তাদের হৃদয় প্রশান্তিতে ভরে থাকে। মায়ার মনটা মানুষের জন্য উদার করে খোলা না রাখলে পরবর্তী বংশধররা কিছুই শিখতে পারবে না, জানবে না তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে। সবকিছু এলামেলো হয়ে যেতে পারে। দেখা যাবে ছেলে ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত বাবার জন্য কিছু ঔষধের টাকা ছোট ছেলের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। বাবা এ টাকায় মোটেই সন্তুষ্ট নয়। বারবার তাই জিজ্ঞেস করছে 'খোকা কবে আসবে'? কেউ মুখ খুলে বলে না যে খোকা আর এ ঈদে আসবে না। বাবা বুঝতে পারে। তার কষ্ট লাগে, গাল বেয়ে পানি পড়ে। এ ছেলেকে কত শত জায়গায় ঘোরাতে গিয়ে কত প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন বাবা, আজ তার এই আচরণ।

আমাদের হৃদয় বিচলিত হয় যখন দেখি র‌্যাংগস ভবনের ধ্বংসস্তুপের মধ্যে চাপা পড়া জীবন্ত মানুষকে লাশ হয়ে বেড়ুতে হয়। আমাদের বিবেক পাথর হয়ে যায়। অন্তর পুড়ে যায়। সিডর একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ এখানে মানুষের কোন হাত ছিল না। র‌্যাংগস ভবন ট্রাজেডি প্রাকৃতিক নয়, মানবসৃষ্ট। মানুষের প্রচেষ্টায় যা এড়ানো যেতো। আমাদের দেশে ক্ষুধা, দারিদ্র, বেকারত্ব ও নেশা মৌলিক ও মানবসৃষ্ট সমস্যা যা সকলে মিলে রোধ করা যায়। আমাদের নিজেদের জীবনে পড়াশুনা করে শান্ত মেজাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। বেকারত্ব, ক্ষুধা ও নেশাকে আমাদের সমস্যা সমূহের টপ প্রায়রিটি দিতে হবে। একটা সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ ছাড়া কোন সরকার দেশ পরিচালনা করতে পারে না। তদ্রুপ একজন ব্যক্তির কিংবা সমাজেরও চোখ ছিল এসকল কর্মকাণ্ডের উপর। দর্শণ মানুষকে সুনির্দিষ্ট দিকে পরিচালিত করে। দর্শণবিহীন ব্যক্তির জীবনের কোন মূল্য নেই। যাদের ব্যক্তি দর্শন ভাল তারা তাদের ব্যক্তি জীবনে বেশ সাদামাটা জীবন যাপন করেন। সাধারণ মানুষের কাছাকাছি বসবাসে অভ্যস্ত এ সকল লোকদের জীবনে বড় ধরণের টার্গেট থাকে না। তাদের টার্গেট মানুষকে ভালবাসা। তাদের টার্গেট নির্ধারিত হয় তার আওতার মধ্যে। মানুষকে ভালবেসে বেসে তাদের জীবনে নতুন এক প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। আমরা কেন পারবো না, সবাই পারে। অতএব খুব ব্যস্ততার মাঝেও তাদের দৃষ্টি চলে যায় ভাগ্যাহত মানুষদের দিকে। কেবলমাত্র মানুষের প্রতি ভালবাসা পারে তাদেরকে ঐক্যের সিঁড়িতে একত্র করতে। একটা সমাজের

উন্নতির জন্য যতোগুলো মৌলিক বিষয়ের প্রয়োজন তার গুরুত্বানুযায়ী শ্রেণী বিন্যাসে মতভেদ থাকতে পারে কিন্তু সমাজের সকল স্তরের সব ধর্মের এবং সবগোষ্ঠী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে যে কাজ করতে হবে সম্ভবতঃ এ ব্যাপারে কোন মতভেদ থাকার কথা নয়। জাতির উন্নতির জন্য মৌলিক বিষয়ে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ থাকতেই হবে। এর বিকল্প কোন পথ নেই। কোন রাজনৈতিক দলের নেতার মতামত বা দর্শণে দেশের কোন কল্যাণ বা ভাল হলে তা যেহেতু 'অমুকে দিয়েছে এটা নেয়া যাবে না'- এ ফর্মূলায় চললে কোনদিনই দেশ সামনে এগুবে না, দেশের জনগন বিশেষ করে তরুনরা দিশেহারা হয়ে যাবে। আমাদের দেশে এটা মস্তবড় এক ব্যাধিতে পরিনত হয়েছে। ভাল কাজের প্রশংসা করতে লোকজন ভুলেই গেছে। দোষক্রুটি ধরার ব্যাপারে, খুব ছোট খাট বিষয়ে সমালোচনা করার ক্ষেত্রে লোকদেরকে যতোটা উৎসাহী ও তৎপর দেখা যায় কারও প্রশংসা করার ক্ষেত্রে ততোটা উৎসাহী কাউকে পাওয়া যায় না। এটা আমাদের সৃষ্টির অংশ। রাজনৈতিক নেতা নেত্রীদের কাছ থেকেই মূলতঃ এটা এসেছে। পলিটিশিয়ানদের বক্তৃতার স্টাইল পর্যন্ত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতারা অনুসরণ, অনুকরণ করে থাকে। আর এটাই স্বাভাবিক। রাজনৈতিক নেতা নেত্রী বলে নয় সার্বিকভাবেই ভালটা মানুষ যেভাবে অনুকরন করে তারচে খারাপটা অনেক দ্রুততার সাথে অনুকরন, অনুসরন করে। খুব কম রাজনৈতিক নেতা নেত্রীরাই গাল মন্দ অথবা ব্যঙ্গাত্মক ভাষা ছাড়া কথা বলে থাকেন। অন্য রাজনৈতিক নেতা নেত্রীদের চরিত্র হরণের মাধ্যমে নিজেকে পবিত্র করতে চাওয়ার বিকৃত মানসিকতা জনগণের কাছে দৃষ্টিকটু। নিরুপায় জনগণ। চারদিকে অন্ধকার দেখে তারা। নিজের দলের কোন সুন্দর কর্মসূচী নেই, দলে আদৌ গণতন্ত্রের চর্চা নেই অথচ দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মায়া কান্নায় অস্থির এসব নেতা নেত্রীদের যারা সারাদিন অন্যলোকের তোষামোদ করেন তারাও ঐ একই ভাবে দূষিত মানুষ। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যদি মানুষের ভালবাসায় উদ্দীপ্ত হয়ে রাজনীতি করে থাকেন তাহলে হরতাল করে গাড়ি, বাড়ি ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের মতো ঘটনা ঘটাচ্ছেন কেন? ন্যূনতম ভালবাসা এদের মানুষের জন্য আছে কি? প্রমাণ করেন। দুঃখ প্রকাশ করেছেন কি কোনদিন হরতালে দেশের যে বিরাট ক্ষতি হয় সেজন্য? সাধারণ মানুষকে চোখ বেধে রেখে এরা হাতি দেখায়। তারা যাকে ধরে, যা ধরে তাকেই হাতি মনে করে। এদেরকে শিক্ষিত হতে দেবে না, গণতন্ত্রের সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা তারা শেখাবে না। মানুষের অধিকার কি তা তারা জানাবে না, কারণ তাহলে নিজেরাই ধরা পড়ে যাবে। আশ্চর্য্য রকমের চিন্তাভাবনা পোষণ করেন আমাদের রাষ্ট্র পরিচালকরা। এসবকিছুই মানুষকে বোকা ভাবার কারণে করা সম্ভব। মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করে বলেই তারা ভোটের সময় এক কথা বলে ভোটে জিতে ফিক করে হেসে অন্য কাজ করে বলে 'আবার ভোট আসুক দেখা যাবে'। নিঃসন্দেহে রাজনীতিবিদগণ জনগণের জন্য রাজনীতি করেন। তাদের মুক্তির জন্য তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য রাজনীতিবিদদের কমিটমেন্টও থাকে। অনেকেই ছাত্র জীবন থেকে ত্যাগ তীতিক্ষার

www.pathagar.com

মাধ্যমে নিজের রাজনৈতিক জীবনের ক্যারিয়ার গঠন করেন। তাদের মানুষের প্রতি ভালবাসা থাকে, জাতির জন্য ওয়াদা থাকে। কিন্তু রাজনৈতিক কালচারে ব্যাপক পরিবর্তনের কারণে তাদের প্রবাহের সাথে টিকে থাকার তাগিদে তারা পূর্বের অবস্থান থেকে সরে আসেন। অল্প অল্প করে সরে আসতে আসতে এক সময় তারা টেরই পান না কতদূর তারা চলে গেছেন তার আদর্শ থেকে। এখনও তিনি দাবী করেন মানুষের জন্যই তার সবকিছু বিসর্জন দিয়েছেন। দেশ, মানুষ, মৃত্তিকার জন্যই তিনি যে কোন কিছু করতে প্রস্তুত। অথচ ব্যবহারিক ভাবে প্রকাশ পায় ভিন্ন কিছু। সময় বয়ে চলে। সময়ের বয়ে চলার সাথে সাথে অনেক কিছুই পাল্টে গেছে। দেশীয় কৃষ্টির পরিবর্তন, মানুষের রুচির পরিবর্তন, মানুষের চাহিদার ধরণ ও পরিমাণ পরিবর্তন এনেছে দেশের মধ্যে। দেশের বাইর থেকে পরিবর্তনের ঢেউ এসে আছাড় খেয়ে পড়েছে। পরিবর্তিত বিশ্বের সাথে তাল মেলাতে আমাদের দেশের মতো ছোট ও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর বেহাল অবস্থা। কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা একক রাজনৈতিক দলের পক্ষে এ বিরাট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা আদৌ সম্ভব নয়। পুরোজাতি ঐক্যবদ্ধভাবে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে কাজে না নামলে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সম্ভব হবে না। রাস্তায় মারামারি করে, গার্মেন্টস পুড়িয়ে কর্মীদের চাংগা রাখা যাবে, জাতির কিছু হবে না। রাস্তার ও ফুটপাথের শিশু নারীদের পেটেও ভাত পড়বে না। কোন কর্মসংস্থানও হবে না। প্রচণ্ড আত্মসমালোচনায় নিজেকে পবিত্র করতে হবে। আমি এ পৃথিবীর, আমার দেশের, আমার সমাজের এক নম্বর ব্যক্তি কেন হব না যে মানুষের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগে সর্বদা প্রস্তুত। এমন সিদ্ধান্ত আমিই নেব প্রথম। অন্যরা সবাই ভাল হবে আমি আমার অবস্থান থেকে নড়ব না এমন মানসিকতা আমাদেরকে একদম পঙ্গু করে দিয়েছে। আমাকে আমি সার্বিকভাবে পরিশুদ্ধ করব তারপর অন্যদেরটা আশা করব। সময়মত অফিস করব, অফিসের কাজ ফেলে রাখব না, খামোখা ফাইল আটকাবো না, কেউ আটকালে তাকে অনুরোধ করব দ্রুততার সাথে কাজটা করে দিতে। বসের টেবিলেও কৌশলে ফাইল দ্রুততার সাথে যাতে সামনে এগোয় তার তাগিদা দেবো। সকলের সাথে সু-আচরণ করব। অফিসের ক্লার্ক হই আর অফিসার হই আমাকে বিশ্বাস করবে একশ ভাগ লোক। আমাকে মিথ্যুক প্রমাণ করতে গেলে যে মিথ্যাবাদী সেই মিথ্যুক হয়ে যাবে। কর্মব্যস্ত যাবে আমার সারাটা দিন। বাসায় আমার পরিবার রাতের খাবারে আমার অপেক্ষায় থাকবে। আমাকে দেখলে আমার সন্তানেরা উৎফুল্ল হবে। আমার উষ্ণতায় তাদের অন্তর তৃপ্ত হবে, তারা আমার সকল অক্ষমতাকে মাফ করে দেবে। আমার স্ত্রী ও সন্তানরা জানে আমি কতটা সৎ। এই সততাই তাদের অংহকার। তারা এটুকু শিক্ষা পেয়েছে যে মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। জন্মগতভাবেই তাদের অধিকার আছে সমাজে ভালভাবে বসবাস করার। আমাদের পেটে ভাত আছে, মাথা গোঁজার ঠাই আছে। সেটা দু'রুমের ছোট কামরা হোক আর যাই হোক। কাপড় চোপড়ও পড়তে পারি অথচ এ সমাজে আমাদেরচে দুরবস্থার মধ্যে বসবাস করে এমন লোকের সংখ্যাই বেশি। আমার সন্তানদের এতোটুকুন বুঝ ব্যবস্থা আমাকে

অহংকারী না করলেও গর্বিত করে। অনেক লোকই উচ্চ শিক্ষা নিয়েও এতোটুকু বুঝ বুঝতে চান না। আমি এতেই তৃপ্ত যে আমার গ্রামের বাড়ির বৃদ্ধ বাবা মা ছোট ভাই আমাকে ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত নেন না। আমার ভাগের জমিটুকুন তারাই ভোগ করেন এতে আমারও বাবা মার প্রতি পরোক্ষ কিছু দায়িত্ব পালন হয় বলে মনে করি। একটা ঈদ গ্রামের বাড়িতে করলে লোকজন দেখা করে, মতবিনিময় হয় তাদের বলতে ভুল করি না ভাল থাকতে হলে সকলকে নিয়ে থাকতে হবে। একাকী ভাল থাকা যায় না। মনোযোগ দিয়ে সকলে শোনে। আমি নিজেকে এভাবে উপস্থাপন করলে অন্যদেরকে এমন একজন দায়িত্বশীল ও সচেতন নাগরিক হিসেবে পাবার আশা করতে পারব।

একজন ব্যবসায়ীকে এভাবে সমাজ বির্নিমানে অংশগ্রহণ করতে হবে। অন্যায় ভাবে অবৈধ পথে টাকার পাহাড় তৈরী করে সে টাকায় হজ্ব, ওমরাহ্ করে, যাকাত দিয়ে লোকদের কাছে হাজী মহসীন সাজার কি মূল্য আছে? আপনিতো জানেন আপনার নিয়ত কি। কেন আপনি যাকাত দিচ্ছেন, যাকাতের টাকার উৎস কি। রমজানে আপনি একদিকে জিনিসপত্রের দাম বাড়ানোর জন্য সমিতির মিটিং করছেন, সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। আবার অন্যদিকে গ্রামের বাড়িতে নির্বাচনী এলাকায় কম টাকায় সাবসিডি দিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস বিক্রি করে পত্রিকার হেডিং হচ্ছেন। চমৎকার সব ফর্মুলা! আপনি দেশ ও জাতিকে ভালবাসার যে ফর্মুলা দিচ্ছেন বুকে হাত দিয়ে বলেন আপনার মনটা কি এতে তৃপ্তি পাচ্ছে? কি করবেন তা আপনারও জানা আছে। সিদ্ধান্ত নেন মানুষকে যেহেতু ভালবাসাতে চান, দেশকে যেহেতু স্বনির্ভর দেখতে চান, মানুষের কল্যাণে দেশের স্বার্থে যা প্রয়োজন তাই করবেন। দেশ বিরোধী কিছু করবেন না বরং বাধা দেবন সর্বত্র। দেশীয় পণ্যের প্রচার প্রসার কিভাবে হয় সেটা করতে হবে লাভ দু'পয়সা কম হোক। আগামীকাল এ পণ্যই বিদেশের মাটিতে রপ্তানী হবে। ঔষধ শিল্পের উদাহরণ আমাদের চোখের সামনে আছে। আপনি আপনার মতোই অন্য মানুষদের ভালবাসতে শুরু করুন- সত্যিকার ভালবাসা, দেখবেন কতো সহজেই একাজটা করা সম্ভব। আজ যা অসম্ভব মনে হয় কাল তা সম্ভব হয়ে উঠবে। ব্যবসায়ী হিসেবে মানুষকে যতোটা সেবা দেয়া যায় আপনি দিন। খাবার বা পণ্যে ভেজালের যে হিড়িক পড়েছে তা কি আমাদের সমাজের মানুষেরই ক্ষতি করছে না? নানান প্রকার রোগের সৃষ্টি করে শারীরিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপক ক্ষতির সৃষ্টি করছে। এ ব্যাপারে আপনার কি কিছুই করার নেই? ভেবে দেখুন-অবশ্যই আছে। আপনি যদি আপনার দেশের মানুষকে ভালবাসেন এ ভেজাল দেবার কাজটা আপনাকে দিয়ে করানো সম্ভব হবে না। এর মত জনবিরোধী, সমাজ বিধ্বংসী কাজ আর কি হতে পারে? প্রতিটি পেশার মানুষকে আজ সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আমি শুধু দেবই, নেব না। যে যে পেশাতেই থাক না কেন একটু ঠাণ্ডা মাথায় একাকী বসে আত্ম সমালোচনা করলে যে ভুল ত্রুটিগুলো বেরিয়ে আসবে সেগুলো দূর করলেই যথেষ্ট। এজন্য অন্য কারও পরামর্শ নেয়ারও প্রয়োজন নেই। যারা মনে করেন যে তারা মোটামুটি পরিশুদ্ধ মানুষ তেমন কোন সমস্যা তাদের আচার

www.pathagar.com

আচরণ ও পরিকল্পনায় নেই তাদের নিয়ে আমার কোন বক্তব্য নেই। কারও নিরপেক্ষ আত্মসমালোচনায় যদি কেউ নিজেকে স্বচ্ছ ও ভাল মানুষ হিসেবে দেখতে পান তবে তাকে এটুকু বলা যায় অন্যকেও পরিশুদ্ধ হতে সাহায্য করুন। তারা ছাড়া বাকীরা যারা মনে করেন আমাদেরই এ সমাজ, এ সমাজের মানুষরা আমাদেরই অংশ বিশেষ। তাদের ছাড়া আমরা নিজেরা সুখী হতে পারবো না। যারা মনে করেন একটা দেহের পায়ের গোড়ালিতে ব্যাথা করলে যেমন চোখের পাতা গভীর রাতে খোলা থাকে, ব্রেইনসেল কাজ করতে থাকে। আবার ব্রেইনে রক্তক্ষরণ হলে পা চলে না। একটার বিফলতার দায়ভাগ অন্যদের বহন করতে হয়। একটা অঙ্গ ব্যাথা পেলে পুরো শরীর পুড়ে যায়। একটা সমাজও একটা দেহের মত। সমাজের একটা শ্রেণীর দুরবস্থায় অন্যরা যদি বেখেয়াল থাকে আনন্দ তামাশা বিত্ত বৈভবে কেবল তাদেরকেই নিয়ে মেতে থাকে তাহলে তাদেরকে সজীব ও সজাগ সমাজের অংশ বলা যাবে না। তাদেরকে সমাজের মৃতাংশ হিসেবেই ডিক্লার করতে হবে। রমজান কিংবা ঈদের সময় ভিক্ষুককেও ভিক্ষা দিতে দেখা যায়। তার মানে কখনো কখনো সব মানুষই উদার হতে চেষ্টা করে। পরোপকারী হয়ে নিজেকে মহৎ মনে করে। ভিক্ষাপ্রথাই তুলে দেয়ার জন্য আজ আমরা সকলেই যদি এগিয়ে আসি একত্রে কাজ করি তাহলে দেখা যাবে সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে।

নিশ্চিতভাবে একথা বলা যায় যে, আপনি সুনিয়তে ও মানুষের খাতিরে আপনাকে বিলিয়ে দেবার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাতে সমাজ কখন কতটুকু উপকৃত হবে এবং সাম্য কবে সুবাতাস বহাবে ঘর্মাক্ত প্রাণে তা বলা মুশকিল হলেও আপনার সিদ্ধান্ত নেয়া এবং ছোটখাট ত্যাগ বা বিসর্জনের সাথে সাথেই হৃদসাগরে পরম প্রশান্তির ঢেউর দোলন আপনি টের পাবেন। কোন সমাজে বেঁচে থাকার জন্য এ ঢেউ অতি বেশী প্রয়োজন। বিভিন্ন দিবসে মঞ্চের স্বীকৃতির বহু আগে প্রয়োজন আত্মস্বীকৃতি। আমার আয়নায় আমাকে কদর্পক পুরুষ দেখা গেলে ঐ বিশেষ দিবসের পুরস্কার দিয়ে কি করব? সমাজে যে প্রচলিত পুরস্কার প্রথা বিদ্যমান যারা এ পুরস্কার হাতে ছবি তুলছেন অন্য খ্যাতিমানদের সাথে, চোখ বুঝে চিন্তা করুনতো আপনি কি শ্রেষ্ঠ ব্যাক্তি? এ পুরস্কারটা পাবার ক্ষেত্রে আপনি কি এগিয়ে আছেন না অন্য কেউ এর হকদার! দেখবেন কয়েকটা মুখ আপনার সামনে চলে আসছে। সরকারী পর্যায়ে প্রতিযোগিতামূলক সব পরীক্ষায় এমনটা হচ্ছে। যেহেতু আমারচে কম মেধাবীরা আমার সীটটা দখল করতে চাচ্ছে, ধাক্কা দিচ্ছে স্বাভাবিক ভাবেই আমাকে ও অন্য একটা উপরের সীটে আরও জোরে ধাক্কা মারতে হবে। এ পুশ থিওরীটাই অনুসরণ করা হচ্ছে। প্রশাসন থেকে শুরু করে সমাজের সকলস্তরে স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি জেকে বসেছে। কার কারণে কিভাবে তা খতিয়ে দেখার দায়িত্ব আমার না। এটা দূর করার কোন রোড ম্যাপ দেওয়াও আমার ইচ্ছা নেই। আমরা কখন সুবিচার করতে পারব, কখন দায়িত্ববান ও আমানতদার হব যখন এ জিনিসটার প্রয়োজনীয়তা আমার কাছে

www.pathagar.com

গুরুত্ব পাবে। আমি যদি আমার দেশকে ভাল না বাসি তাহলে এ কাজ করা যাবে না। দেশে মেধাশূণ্যতা বিরাজ করল না কি করল কিছু যায় আসে না। যোগ্য ও সৎলোককে পুরস্কৃত করা ও এবং অসৎ ও অযোগ্যদেরকে ভাল চাকরিতে স্থান না দেয়ার বিষয়টা সে-ই ঠিকমত বাস্তবায়ন করবে যে নিজে সৎ ও ভাল মানুষ। দেশের প্রশাসনে যোগ্য ও সৎ মানুষ আসুক, যারা সৎ ও যোগ্য সকল পেশায় তারাই নেতৃত্ব দিক এটা তিনিই চাইবেন যিনি দেশ প্রেমিক, মানুষের ভালবাসায় যার সকাল ও সন্ধ্যা হয়। পারিপার্শ্বিক মানুষকে যখন আমরা গোনায় ধরি না, তাদের আয় ব্যয়, ভাল থাকা খারাপ থাকায় যখন আমাদের কিছু যায় আসে না, তাদের অসুস্থতা যখন আমাদের মন খারাপ করে না, সমাজের নানান নির্যাতন দেখে যখন আমরা ব্যথিত হই না, তাদেরকে সীমাহীন কষ্ট ও যন্ত্রনা ভোগ করে দিনাতিপাত করতে দেখে যখন আমাদের চোখ সিক্ত হয় না তখন ধরেই নেয়া যায় আমরা একটা মানুষের শরীর নিয়েই হেটে চলে বেড়াচ্ছি মাত্র আমাদের মধ্যে কোন মানবিক সত্তা বিদ্যমান নেই। বিপ্লব করে নতুন সাম্যের রাষ্ট্র বিনির্মানের মতো কঠিন কাজে আপনাকে হাত দিতে হবে না। আপনার দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডকে অধিকতর মানবীয় পর্যায়ে নিয়ে আসতে পারলেই দেখবেন আপনাকে দিয়ে অনেক কাজই হচ্ছে।

আপনার যে সমাজে বাস সেখানে মোটেই আপনি একা নন। অনেক লোকের বাস। এদের অনেকেই সামাজিকভাবে আপনারচে ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত, কেউ কেউ আপনার অবস্থানের নিচে অবস্থান করছে। সামাজিকভাবে কিংবা অর্থনৈতিকভাবে আপনারচে ভাল অবস্থানে থাকলেই সে যে খুব ভাল আছে তা আদৌ সত্যি নয়। ঐ ভদ্রলোকই হয়েতো তার পোষ্টিং, পদোন্নতি নিয়ে নির্যাতনের শিকার, তার অসুস্থ্য মেয়েকে নিয়ে চিকিৎসকের চেম্বারে ঘুরে ঘুরে তিনি দিশেহারা। সুতরাং আপতঃ দৃষ্টিতে ভাল দেখা গেলেও সেও ভাল নেই। সমাজের সকলকে নিয়েই তো সমাজ। সুতরাং অন্যের কাছ থেকে ভাল কিছু আশা করার জন্য নিজের কাজকে সুন্দর, সহজ ও স্বার্থহীনভাবে মানবকল্যাণের স্বার্থে ব্যয় করতে হবে। তর্ক অনেক করা যাবে কিন্তু এটা স্বীকার করতে হবে যে, কেবলমাত্র নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার মাধ্যমে অন্যকে ভালকাজের জন্য, সৎ হবার জন্য আহ্বান করাই শ্রেষ্ঠ আহ্বান। এখানটাতে মানুষের মানবীয় দুর্বলতা এই যে সে অন্যকে ভাল হতে বলবে কিন্তু সে খারাপ কাজ ফাঁকে ঝোকে করবে। আবার খারাপ কাজগুলোকে এই বলে চালিয়ে দেবে যে মানুষ কখনো ত্রুটিমুক্ত নয়।

মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জৈবিক প্রয়োজনটা একই ধরণের প্রায়। তবে প্রয়োজন পূরণের পদ্ধতি ও উপায় ভিন্ন ভিন্ন। মানুষ তার ক্ষুধাপেটেই সন্তান কিংবা কখনো অন্যকেও খাবার প্রদান করে। এটা সচরাচর অন্যপ্রাণীদের মধ্যে দেখা যায় না। এখানেই আমি বলতে চাই যারা জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য খাবার জমা করে রাখে আর ঐ একই সময় অন্য মানুষ না খেয়ে থাকে অথচ তার এ ব্যাপারে কোন বোধোদয়

হয় না তাদের অনুভূতি উপলব্ধিটা আসলে পাশবিক। হয়তো সোসাল লার্নিং এর মাধ্যমে এটা দেখে দেখে আমরাও এভাবে খাদ্য জমা করে রাখতে অভ্যস্থ হয়ে গেছি, নিজেরাই বুঝতে পারছি না কতোটা অন্যায় আমরা করছি, কতটা অসভ্য এ আচরণ। থাকার জন্য একটুকরা জমি প্রয়োজন বলে আমরা অনেকগুলো প্লটের মালিক হয়ে যাই। এসব জমি বিক্রি করার ভেতরে ভেতরে নিয়ত থাকলেও থাকার জমির উপর যাকাত নেই বলে আল্লাহকে ঠকাচ্ছেন। আল্লাহকে কি ঠকাবেন! যা ঠকার তাতো আপনিই ঠকছেন। আপনি যখন নিজের সাথে প্রতারণা করবেন তখন কারও দেখতে হবে না, আপনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি নিজে জানবেন কি করছেন আপনি। কোন একটা বিচ্ছিন্ন কারণে এটা ঘটে না। যে ব্যক্তি এমন আচরণ করেন তিনি সবসময় সুকৌশলে এমনটা করেন তাও না, অনেক সময়ই এমনটা দেখা যায় যে অন্যায় করতে গেলে থ্রেট থাকলে অন্যায়ের হার বা মাত্রা কমে যায়। সমাজের চোখকে অনেকে সমীহ করেন। সমাজ যখন এমন কোন অন্যায়কে গ্রহণ করে নেয় তখন লোকদের সেসব অন্যায় করে বেড়াতে আর বাধা থাকে না। পরশী, বন্ধু-বান্ধবরা, ভাই-বোনরা দুর্নীতি করে তাই করি, না করলে কেমন দেখায়, না করলে সংসার সামলানো দায়। না করলে সন্তানের ভবিষ্যৎ কি হবে, দুর্নীতি না করলে পার্টির খরচ, নির্বাচনের খরচ আসবে কোত্থেকে এমন সব যুক্তিতে অন্যায় করে, দুর্নীতে করে মানুষ। একটা যুক্তি দাঁড় করানো যাবেই। কিন্তু এসব ব্যক্তিরা যারা অসৎ কাজের সাথে জড়িত হোক তা দুর্নীতি বা কালোবাজারী অথবা নেশাপণ্য বিক্রি করে তারা তাদের অসৎ কাজের কথা অকপটে অনেকেই স্বীকার করবেন। দু'একটা যুক্তি দেখাতে গিয়ে একসময় আত্মসমর্পন করে এরা সকলেই বলবে প্রথমে না বুঝে এ পথে পা বাড়িয়েছি, পেটের দায়ে এসেছি পরে প্রলুব্ধ হয়ে পড়েছি। এতোকম কষ্টে বেশি টাকাতো কোথাও নেই। খুব যে ঝুঁকি আছে তাও না। কিছু এজেন্সিকে সামলাতে পারলেই হল। একদম সত্যি কথা। তারচে সত্যি কথা এলোকটার ব্যাকগ্রাউণ্ড লার্নিংও হয়তো ভাল না। ছোট বেলার শিক্ষায় অনেকেরই নৈতিকতার বিন্দুমাত্র লেশ পর্যন্ত ছিল না। ঠকবাজ আর প্রতারকদের ছত্রছায়ায় বড় হলে কিভাবে দয়া মায়া ভালবাসার মত পাপড়ি হৃদয়ে বেড়ে উঠবে। কেউ কাউকে ঠকায় না অন্যকে ঠকিয়ে নিজে ঠকে। চুরি, ডাকাতি, দুর্নীতি, ও ঘুষের মহরার পর সবচেয়ে বেশী ক্ষতির মুখমূখী হয় আবার সেই গরীব। ঠকার পর উকিল ও চিকিৎসক তাদের ভিজিট বাড়ান, ব্যবসয়ী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করেন, শিক্ষক কোচিং সেন্টারের ফি বাড়ান, বাসওয়ালা-বাড়ীওয়ালা ভাড়া বাড়ান, চাকরিজীবি ঘুষের রেট বাড়ান-শুধু গরীব ও অভাবী মানুষের বাড়ানোর কিছু থাকে না। তাদের এই বাড়তি রেটের বোঝা বহন করে যেতে হয়। তাকে কেবল যন্ত্রণার যাঁতাকলে পিষ্ট হতে হয়। সবাই কষ্টকে অন্যের ঘারে ছুড়ে দেয় এবং সব কষ্ট এই হত ভাগ্য দরিদ্রশ্রেণী বহনকরে বেড়ায়। তার হাতে ছুড়ে মারার মত কিছু নেই, সে বড় অসহায়!!

www.pathagar.com

একজন ক্ষুধার্ত মানুষ রাস্তায় হাতপাতে। বিভিন্ন অনুনয় বিনয়ের মাধ্যমে কোলের শিশুকে দেখিয়ে, খাবার কেনার কথা বলে সাহায্য চায়। আর ঘন্টার পর ঘন্টা আর্জি করেও কোন সাড়া না পেয়ে আবাসিক এলাকায় চিৎকার করে কান্না করতে থাকে। তখন কুয়াচ্ছাদিত ঢাকা শহরের রাত অনেক গভীর। সে গলির মোড়ের ডাষ্টবিনে খাবার খোঁজে। কিছু একটা পেয়ে যায়। কোলের শিশুটাকে রাস্তায় রেখে দু'হাতে ময়লা ঘাটতে থাকে। এ সময় একটা প্রাইভেট কারের হেডলাইটে দেখা যায় একটা মানবশিশু রাস্তার উপর। বি.এম.ডাব্লিউ। জার্মানীর বিখ্যাত গাড়ি। গার্মেন্টস মালিক চারদিন একটানা অফিস করে শিফটমেন্ট শেষ করে বাসায় ফিরলেন। বেখেয়ালে তার গাড়ি এ শিশুটাকে পিষে ফেলতে পারতো। ষাটোর্ধ ভদ্রলোক গাড়ির হেডলাইট বন্ধ করে গাড়ি থেকে নামেন। এরমধ্যে ক্লান্ত মা দৌড়ে এসে মেয়েকে কোলে তুলে নেয়। ঢাকা শহরে এসব দৃশ্য নতুন নয় যে গাড়ির মালিকের এদৃশ্যটা দেখে মনটা ভেঙ্গে দলে মুচরে যাবে। পকেট থেকে একটা নোট বের করতে যায়। না, একশ না, পাঁচশ টাকার নোট চলে আসে। টাকাটা দিতেই মা বললো 'অনেক খিদা স্যার, সারাদিন না খাইয়া আছি'। গাড়ির পেছন থেকে ড্রাইফুডের দুটো প্যাকেট আর একবোতল পানি দিয়ে তিনি প্রস্থান করেন। এমন দৃশ্য খুব কম। গাড়িটা হাইবিম দিলেই তিন বছরের বাচ্চাটা রাস্তার একপাশে চলে যেতো, তা না হলে হর্ণ বাজালেই মা দৌড়ে এসে ওকে কোলে নিতো। গাড়ি তার পথে চলে যেতো। বেশির ভাগ সময়ই পথিকের চোখ এসব দৃশ্য দেখে না। অনেকে এমন দৃশ্য দেখে ব্যাকুল হন, তারা অনেক উপকারও করেন কিন্তু ইদানীংকালে ভিক্ষাবৃত্তিটা একটা পেশা আকারে আবির্ভুত হবার কারণে অনেকেরই মায়ামমতা কমে গেছে এবং তাদের মন উঠে গেছে। অনেকেরই বুঝতে কষ্ট হয়, কে আসল ক্ষুধার্ত আর কে ক্ষুধার নামে ব্যবসা করছে। তারপর ও যারা ভিক্ষা করে তাদের প্রতি আমাদের কিছু দায়বদ্ধতা থেকেই যায়। আমরা তাদেরকে ভিক্ষা না দিলেও অন্ততঃ তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করব না। গলাধাক্কা দেব না, বিরক্তি প্রকাশ করব না, কারণ আমরা জানি না কোন কারণে তার অবস্থানে আমি থাকলে কি করতাম। সিগনালে গাড়ি থামলে ভিক্ষুকরা নানান সাজে যেভাবে ভিক্ষা চায় তা বেশি বর্ণনা না করাই ভাল। এসি গাড়ির গ্লাস লাগানো থাকে বলে হাতে আংটির পাথর দিয়ে গ্লাসে আঘাত করে। মোটেই সুখকর দৃশ্য নয়। এরপর ভিক্ষা না দিলে কিংবা চাহিদার কম দিলে অনুশ্চস্বরে গালাগাল করে। এ সমস্যাটার চট করেই কোন সমাধান নেই। অনেকগুলো এপ্রোচে এর সমাধান নির্ভর করে। আজ আমরা ভিক্ষা বৃত্তির সমস্যা, বস্তির লোকদের সমস্যা, নোংরা পরিবেশ তৈরী করার সমস্যাকে যেভাবে দেখছি সমস্যাগুলো এভাবে হঠাৎ তৈরী হয়নি। এই ভাসমান শহরমুখী লোকগুলো গ্রামে ছিল। অধিক লোক-কম কাজ, নদী ভাংগণ, ধানি জমিতে বসত বাড়ি, আত্নীয় স্বজনদের হাংগামা এদেরকে শহরে ঠেলে পাঠিয়েছে। আবার শহরে পোষাক শিল্পসহ অন্যান্য শিল্পকারখানা, পরিবহন বাণিজ্যে কিছু কাজ বাজ আছে, স্থাপত্য শিল্পে আছে কাজ যা তাদেরকে শহরে আসতে আকৃষ্ট করেছে। ঢাকা শহরে কোটি লোকের

বেশি বাস। সুতরাং এখানে অনেক প্রকারের কাজ ও অকাজ দু'টোই আছে। কেউ এসে কাজে লাগে। কাজে শ্রম বেশি, পয়সা কম। শহরে কিছুদিন থাকলে চোখ ফুটে ওঠে তখন অকাজে অনেকে মন দেয় কারণ সেখানে শ্রম কম, পয়সা ভাল। এই যে গ্রাম থেকে শহরে আসা, জমিক্ষেত গরু বিক্রি করা, নাও জাল বিক্রি করা, শহরের লোকদের মাধ্যমে বারবার প্রতারিত হওয়া, মালিকদের মাধ্যমে নির্যাতিত হওয়া তাদেরকে অনেক ক্ষেত্রে হিংস্রও প্রতিশোধ পরায়ণ করে তোলে। একেতো তাদের শিক্ষার অভাব তারপর অর্থনৈতিক দৈন্যতা, এর উপর মালিক শ্রেণীর অবিরাম নির্যাতন-নিষ্পেশন। তারা সহসাই এগুলোর প্রতিবাদ করে না, করতে পারে না। তবে অনুকূল পরিবেশ পেলে কেউ ফুসলে দিলেই তারা শুধু প্রতিবাদই নয় প্রতিশোধও নিয়ে ফেলে নিমিষেই। বিভিন্ন সময় গার্মেন্টস্ শ্রমিকদের সংঘবদ্ধভাবে গার্মেন্টসে আগুন লাগানো ও ভাংচুর ঐ প্রতিশোধের চিহ্ন বহন করে। সব মালিক খারাপ না বা সব মালিকরাই নির্যাতন চালায় তাও না। তবে অনেক মালিক তাদের শ্রমিকদের প্রতি যত্নবান নন। এ প্রসঙ্গ নিয়েও তর্ক করা যাবে, সমাধান হবে না। মালিকের ফ্যাক্টরীতে কাজ না থাকলে শ্রমিকরা টের পায় তাদের চাহিদা এমনিতেই কমে যায়। বুঝিয়ে বললেই তারা বুঝ নেবে। কিন্তু ঈদে বোনাস না হোক আসল বেতন না দিয়ে মালিকের নতুন গাড়ি কেনার আনন্দতো শ্রমিকরা সহ্য করবে না। এ ব্যাপারটা এতোটাই মৌলিক যা বলার অপেক্ষা রাখে না। শ্রমিকরা যাদের উস্কানিতে গার্মেন্টস এ আগুন লাগিয়েছে তারা কখনোই শ্রমিকদের ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এ কাজটা করেছে তা নয়। রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে তারা কাজ করেছে। গার্মেন্টস পোড়ালে কি বেতন বাড়ে? কখনোই না। পোষাক শিল্পের সাথে অনেক মানবদরদী এককালের ছাত্র নেতারা আছেন, জনদরদী রাজনীতিবিদরা আছেন তারা জানেন না এদের কতটুকু প্রাপ্য? তাদের দামী গাড়িগুলো কিংবা লেক সাইডের বাড়িগুলোতো এদের ঘামের বিনিময়েই হয়েছে। ঐ সকল নেতারা কি পারেন না শ্রমিকদের একটা ন্যূনতম মজুরী ঠিক করতে যা তাদের মৌলিক প্রয়োজন মেটাবে। যে যায় লংকা সেই হয় রাবন। আজ যাদেরকে আমরা স্বভাবদোষে গরীব হয়েছে বলে গালমন্দ করছি তাদের গরীব থাকার বা গরীব হবার পেছনে আমাদের কি ভূমিকা আছে সেটাওতো বিবেচনায় আনতে হবে। এক সময় ধানমন্ডিতে সরকারী কর্মকর্তাদের এক বিঘার প্লট দেয়া হয়েছে। আজ তার নাতিরা সে প্লট টুকরা টুকরা করে সোনার দামে বিক্রি করছে বা ফ্ল্যাট করে ভাড়া দিয়ে বসে বসে খাচ্ছে। এমন হাজার সামাজিক অবিচার সমাজে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সুতরাং কে কার দোষে কি হয়েছে ঢালাওভাবে না বলাই ভাল। আজ আমরা যারা শিক্ষা নিয়েছি স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছি তারাও সুযোগ পেয়েছি বলেই এ জায়গাটাতে এসেছি। সমাজের অধিকাংশ লোক শিক্ষার এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। তারা অফিসারই বা কিভাবে হবে আর সরকারী প্লটই বা কিভাবে পাবে! যারা সেনানায়ক-যুদ্ধে জয়ী হন তাদেরকে বিজয়ের জন্য-সাহসীকতার জন্য খেতাব দিয়ে, মেডেল দিয়ে, বিজয়রিবন পড়ার অনুমতি দিয়ে

পুরস্কৃত করেন। তাদের জন্য লাখ লাখ টাকা কিংবা বারিধারার কোন প্লট দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়নি। কারণ তাদের বীরত্বের পুরস্কার বা স্বীকৃতি এসব লৌকিক স্থাপনা দিয়ে সম্ভব নয়। সুতরাং যারা অফিসার যারা শিক্ষা নিয়েছেন তাদের বড় পুরস্কার তিনি যেভাবেই হোক শিক্ষিত হয়েছেন, জীবন সম্পর্কে বুঝতে পেরেছেন। বাংলাদেশের মত একটা দেশে যেখানে অধিকাংশ লোক শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত, যেখানে অধিকাংশ লোক দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে, যেখানে মানুষ চিকিৎসা পায় না, দু'দিনের বেশি কোন লোক নিখোঁজ হলে নিশ্চিত খুন হয়েছে অথবা পাচার হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়, যে দেশে নির্যাতিত হলে থানায় কিংবা কোর্টে কেস দেয়া যায় না সেদেশে আপনি-আমি শিক্ষা পেয়েছি, দুনিয়াটাকে বুঝতে শিখেছি, দু'বেলা খেতে পারি এরচে বড় আর কি আছে। আপনি-আমি বুঝতে শিখেছি এ বিশ্ব ভ্রমাণ্ডে মানুষের মত জ্ঞানী শক্তিমান প্রাণী একটিও নেই। মানুষের বুদ্ধির কাছে অন্য প্রাণীরা সব পরাজিত। শিক্ষিত মানুষের শিক্ষার কাছে অন্য সব কিছুই ম্লান তা অর্থ হোক আর বিত্তবৈভব হোক। সুতরাং শিক্ষিত মানুষদের সরকার চাকরি দেন, বেসরকারী সংস্থা চাকরি দেন, তারপর আবার তাদের জন্য নানান প্রকার সুবিধার প্রয়োজন আদৌ আছে কিনা প্রশ্ন উঠাটা স্বাভাবিক। এ প্রশ্ন কেউ তুলছে না, তুলবেও না কারণ যারা প্রশ্ন করতে জানেন এবং প্রশ্নটা তুললে বিভিন্ন মহলে আলোচিত হবে বলে বুঝেন তারাইতো এ সুযোগটা ভোগ করেন। সুতরাং তারাতো এ প্রশ্ন কখনোই তুলবেন না। সরকারের পক্ষ থেকে যে সুযোগটা আসে সেটাতো সরকারে যারা থাকেন তারাই বিশেষগোষ্ঠির স্বার্থে নিয়ম করে বন্টন করেন মাত্র। ঐ সুযোগ সুবিধা বন্টনের মধ্যে সাধারণ মানুষের কোন ভাগ নেই। বন্টনকারীর দোষ নেই। সীমিত সুযোগ সুবিধা যখন বিলি করা হয় তখন প্রায়রিটি দেখতে দেখতে দলীয় লোক, সরকারী তল্পীবাহকবৃন্দ, পেশী শক্তিবাহিনীকে সন্তুষ্ট করে আর জনগণের ভাগটা থাকে না। সাধারণ মানুষের জন্য তাই আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতিটুকুই অবশিষ্ট থাকে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ব্যক্তি অন্য মানুষকে মানুষের মর্যাদায় সার্বক্ষণিক বিবেচনায় রাখেন এবং সে অনুযায়ী তার সারাদিনের কর্মকাণ্ড পরিচালিত করেন তিনিই শিক্ষিত মানুষ। এ মানুষটির আক্ষরিক জ্ঞান না থাকলেও তার শিক্ষাই আসল শিক্ষা। সমাজে দু'শ্রেণীর শিক্ষার একটা এই মানুষ চেনার শিক্ষা যা তাকে অধিকতর হিউম্যান হিসেবে পরিচিত করে। যে শিক্ষাগ্রহণে একজন মানুষ অন্য মানুষের কাছে দেবতার পদে বসে যায়। আর অন্য প্রকারের শিক্ষাটা হচ্ছে কোন বিষয়ে টেকনিক্যাল নলেজ বা কারিগরী শিক্ষা। বিশেষায়িত জ্ঞান। আমরা প্রথম শ্রেণীর জ্ঞান নিয়ে কথা বলছি। আমাদের সমাজে যারা একাডেমিক শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তারা অনেকেই এখনও একজন সুন্দর মানুষ হতে পারেননি। সব ধরণের সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে অন্য মানুষকে ভালবাসার শিক্ষাটা তিনি এখনও পাননি। যে কারণে তার আত্মিক প্রবৃদ্ধি সেরকম হয়নি। অভাব আর অভাব তার চারদিক ঘিরে রেখেছে। অন্তর তার আলোয় পরিপূর্ণ নয়। খুব সহজ নয় একাজটি করা। লোকালয়ের মানুষগুলো স্বার্থপরতার বিষবাষ্প ছড়াচ্ছে সর্বক্ষণ, তাদের অনেকেই সামাজিক ভাবে স্বীকৃত, পুরস্কৃত- বিশাল ব্যক্তিত্ব।

www.pathagar.com

তাদের সংস্পর্শে এসে আপনি নিজেকে ধন্য মনে করছেন। টেলিভিশনের টকশোতে আপনি সিডিউল দিয়ে শেষ করতে পারছেন না, প্রেসক্লাবে গোলটেবিল বৈঠকে আপনি বারবার আমন্ত্রিত হন। তাছাড়া আপনার তথাকথিত নিরপেক্ষতার একটা সীল আছে। সবাই আপনাকে ডাকে। এতে আপনার তৃপ্তির শেষ নেই। বন্ধু বান্ধবরা টেলিফোন করলে আপনার ব্যস্ততা টের পায় ও ঈর্ষান্বিত হয়। আপনি ভীষণ পুলকিত হন এবং জীবনের বেঁচে থাকাটা স্বার্থক বলে ভাবেন। আপনিতো ব্যস্ত, একটু সুস্থতার সাথে বসে ভাবেনতো আপনি করছেনটা কি? এটা কি শিক্ষিত মানুষের কাজ। এ জবাবটা আপনি খুব দ্রুতই পেয়ে যাবেন। চব্বিশ ঘন্টা আপনি যা করছেন তার কতটা মানবকল্যাণে আর কতটা সমাজ বিধ্বংসী কাজে ব্যয় হচ্ছে, কোনটা দেশের পক্ষে আর কোনটা দেশের বিপক্ষে তা আপনার মত বুদ্ধিমান মানুষ অবশ্যই জানে। দেশকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়ার সকল চক্রান্তের সাথে আপনি জড়িত। ভিনদেশীরা দেশ শাসন করুক আপত্তি নেই কিন্তু আপনার বিরোধী মহলের লোকরা কিছু করুক তাতে আপনার আপত্তি। আপনি নিরপেক্ষ হবার চেষ্টা করুন, অন্ধভাবে পথ চলা পরিহার করুন। দেখবেন সারাজীবনের সব ভুলগুলো ধরা পড়ছে। ভুলের উপর আর যাই হোক সত্যি প্রতিষ্ঠিত হয় না। সত্যিকার অর্থে শিক্ষিত না হলে এই খাই খাই ভাবটা কোনদিনই কমবে না। কারণ হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় খাই খাই ভাব কমাতে পারে না। ধর্মীয় অনুশাসন ও নৈতিক শিক্ষা মানুষের চাহিদা কমায়। সুতরাং আমাদের নৈতিকতা বাড়ানোর জন্য সকল প্রকার পড়াশুনার সাথে থাকতে হবে, বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনার উপস্থাপক হতে হবে, অজ্ঞতার চিকিৎসা নিতে হবে। নানান প্রকারের পড়াশুনা না থাকলে হৃদয় আলোকিত হয় না। নৈতিক শিক্ষা না পেলে মানুষকে ভালবাসতে গেলে কষ্ট হয়। এ কাজটাতে মজা লাগে না। আর অন্যদিকে যারা নৈতিক শিক্ষা পেয়েছেন, মানুষকে ভালবাসাই যাদের ব্রত, তাদের এসব কাজে মজা লাগে, কোন প্রকার ত্যাগে তাদের কষ্ট হয় না। মানুষের ভাললাগা মন্দলাগায় তারা ব্যাকুল হন। হৃদয় কেঁপে ওঠে। মানুষের কোন মর্যাদা তার কাছে নেই বলেই এ্যাপার্টমেন্ট বানালে দুই হাজার স্কয়ার ফিট বাড়ির ডিজাইনে কাজের লোকের জন্য ঘুমাবার ছোট একটা রুম হয় না। তাপরও বিরক্ত হন এ্যাপার্টমেন্ট মালিক কারণ ঝাড়বাতির জন্য ড্রইংরুমে কোন পয়েন্ট রাখা হয়নি। কাজের লোকের জন্য ওরচে বড় বাথরুম দরকার নেই। সব দরকারটুকু যেন তাদের। ছোটবেলা থেকে মানুষকে ভালবাসার চর্চা না করলে জীবনে অনেক পস্তাতে হবে একদিন। যাদের হৃদয়টা মানুষদের ভালবাসার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে, যারা সমাজের কোথাও বিপথগামীতা, পথ ভ্রষ্টতা দেখলে ছুটে যান কোলে তুলে নেন অভুক্ত শিশুকে কমলাপুর রেলস্টেশন থেকে। সমাজের সচেতন ও বুদ্ধিমান মানুষরা মানুষকে ভালবাসেন। তাদের ভালবাসার কথা কেউ কেউ প্রকাশ করেন। ভালবাসা বিহীন জীবনের কোন মূল্য নেই। মূল্যহীন তাৎপর্যহীন জীবন নিয়ে বেঁচে থেকে লাভ কি। তা একটা দিনই অতিরিক্ত হোক না কেন? এমন জীবন আমাদের কাম্য নয়। যে জীবন অন্য মানুষকে ভালবাসার জন্য নয়, যে জীবন সমাজের সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ

www.pathagar.com

করার কাজে লাগে না সে জীবন নিয়ে আমার লাভ কি। আমি এমন জীবন চাই না যে জীবন দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ। দিনে এক আর রাতে এক, বাবার কাছে এক আর শ্বশুরের কাছে ভিন্ন। অন্তরে মুখে বিপরীত ধর্মী কল্পকাহিনী পুষে রাখলে উন্নত জীবন কিভাবে পাওয়া যাবে। দ্বান্দ্বিক জীবন যাপন করে মানুষ মরে যাবে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গিয়ে শরীর ও মনে নানান রোগ বাসা বাধবে। তাই সর্বাবস্থায় প্রশান্ত মেজাজে থাকার জন্য সৎ ও ভাল কাজ করতে হবে।

মানুষকে ভালবাসার মাধ্যমে মনুষত্যের যে বহিঃপকাশ আমরা দেখতে পাই তা জন্মগতভাবেই শুধু মানুষের মধ্যে থাকে না, জন্মের পর ও মানুষ মনুষত্বের গুনাবলী অর্জন করে এবং অব্যহতভাবেই বৃদ্ধি পায় উপযুক্ত পরিবেশ পেলে। এ লার্নিংটাকে 'সোসাল লার্নিং' বলে। সোসাল লানিং এর মাধ্যমে মানুষ অধিকাংশ জিনিস আয়ত্ব করে কিন্তু আয়ত্ত করার মতো মানসিক অবস্থা থাকতে হয়। সমাজের সকল বাসিন্দাই একইভাবে শিক্ষাগ্রহণ করে না। শিক্ষা নেয়ার জন্য স্বতন্ত্র কিছু 'কিউ' থাকে, সেটা যার থাকে না তার লানিং হয় না। মানুষের প্রতি মানুষের কিছু ব্যক্তিগত এবং সামাজিক দায়িত্ব থকে, মানুষকে ভালবাসতে হয়। সুখে দুঃখে তার পাশে দাঁড়ানো একপ্রকার দায়িত্ব। এটা সমাজ থেকে, প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষনের মাধ্যমে শেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ প্রশিক্ষণ ভাল কাজ করে। উন্নত সমাজে আমরা এর বহিঃ প্রকাশ দেখতে পাই। এর বাইরেও আমরা অনেক মানুষকে দেখি যাদের শুধু হৃদয় নয় মনপ্রাণ সবটাই ভালবাসায় টইটুম্বুর। কোন অক্ষরজ্ঞান নেই, তেমন কোন উন্নত সমাজের বাসীন্দা নয় যেখান থেকে সামাজিক শিক্ষা গ্রহণ করা যায় তারপরও চলনে বলনে ভাষণে তোষণে আচরণে ব্যবহারে শুধুই মানবপ্রেম। মনে হয় এ এক সাধনা তার। যার বাইরে কোনকিছুই এ সকল লোক ভাবতে পারে না। অপরের প্রতি দায়িত্বানুভূতি তাদেরকে সর্বদা তাড়িত করে বেড়ায়, বিচলিত করে রাখে। সে দায়িত্বে অবহেলা হলে কিংবা ঘাটতি হলে টেনশনে মরে যায় এসব ব্যক্তিরা। এ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোন রকম সংকীর্ণতা তার কাজ করে না। কোন ধর্ম, বর্ণ গোত্র বা গোষ্ঠিস্বার্থ তার চিন্তায় চেতনায় স্থান করে নিতে পারে না। তার অদম্য উৎসাহ উদ্দীপনা ও আগ্রহ ব্যাকুলতা সবকিছু মানবকল্যাণ ও মানব সুখকে কেন্দ্র করে হওয়াতে সে শুধু তার কাজে স্বার্থকতা খুঁজে পায়। সে তার প্রচেষ্টাকে স্বার্থকতার মানদণ্ড বিচার করে। মানুষের কর্মের ফলাফলের উপর নির্ভর করে যদি কেউ সুখ বা প্রশান্তি পেতে চায় তাহলে পরোপকার বা মানবসেবাসহ অধিকাংশ ভাল কাজ করা বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ এসব ভাল ও কল্যাণমূলক কাজের শুরুতে ব্যর্থতাই থাকে বেশি। সুতরাং কোন কাজ প্রগতিশীল ও মানব কল্যাণের জন্য বিবেচনায় রেখে কেউ করল অথচ এর ফলাফল তার অনুকূলে না এলেও সে তৃপ্তি পাচ্ছে কারণ দায়িত্ব ছিল কাজটি দুনিয়াতে স্বার্থহীনভাবে মানুষের জন্য করার। তা সে করেছে। কাজের পদক্ষেপ নেয়াটাই জরুরী, ফলাফল নয়। ফলাফল একদিন হবেই। এমন মানুষের সংখ্যা আমাদের সমাজে আছে, তবে কম। এরা হয়

www.pathagar.com

জন্মসূত্রেই পরোপকারী, মানুষকে ভালবাসায়ই যাদের পরম আনন্দ অথবা যারা সমাজ থেকে বুঝতে পেরেছেন মানুষের প্রতি ভালবাসা একপ্রকারের সামাজিক দায়িত্ব। মানুষের প্রতি দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত হবার জন্য সমাজে অনেক উদ্দীপক ব্যবস্থা থাকে। রাষ্ট্র ভূমিকা পালন করে, ভূমিকা রাখে জাগ্রত জনতা। মানুষ যখন টেরপায় সমাজ সংসারে একাকী ভালভাবে বসবাস করা যায় না। একাকী ভালথাকার ব্যর্থ চেষ্টা করা যেতে পারে বটে কখনোই সুখলাভ সম্ভব নয়। তবে যাদের কাছে সুখ বা প্রশান্তির বিকৃত সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা আছে তারা লৌকিক এসব বিত্তবৈভবে তখনও চরম তৃপ্তি পাবে যখন তার প্যারাডো জীপ পিষে যাবে পথশিশুকে। এটা এক ধরণের সেনসেশন। সুখানুভূতির ঐ 'সেনশেসনটা' কারও স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেললে তারাই কেবল একাকী সম্পদ অর্জন করে, শিক্ষা লাভ করে, ডক্টরেট ডিগ্রিধারী হয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারেন, সুখী হতে পারেন। সমাজের কার হাড়িতে চাল আছে কি নেই, কোন তোতা ড্রাগ নিলো কি আত্মহত্যা করল, কোন ব্যবসায়ী চাঁদাবাজের হাতে খুন হল এতে তার কি বা আসে যায়! গুলশানের লেক ভরে যে চোরা বিশাল ফ্ল্যাট বাড়ি বানিয়েছে তাতে তার শেয়ার আছে এতেই তো আনন্দ। একদমই পাশবিক এ আনন্দ, অতি আদিম। এটা মৌলিক চাহিদা নয়, কোন ফাইনেস্ট চাহিদাও নয়। এ এক ধরণের বিকৃত রুচির পরিচায়ক, স্যাডিস্টিক অভ্যাস।

রাষ্ট্র মানুষের মধ্যে মানবীয় গুনাবলী অর্জনের জন্য যে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা রেখেছে তা অপ্রতুল, ত্রুটিযুক্ত ও দোষে ভরা। যারা রাষ্ট্রের নেতৃত্বে থাকেন তারা তাদের ব্যক্তিগত চরিত্র চিত্রনের মাধ্যমে মানুষের প্রতি ভালবাসার উদাহরণ তুলে ধরতে পারেন। খুব কমই আমরা এমন দৃষ্টান্ত দেখতে পাই যা দেখে সমাজের সাধারণ লোকজন উৎসাহে ঝাপিয়ে পড়বে নিজেকে মানবপ্রেমে উৎসর্গ করার জন্য। সিডরে সবাই ত্রান সংগ্রহ করে বিতরণ করেণ। এমন স্বার্থক প্রচেষ্টাকে আমরা সাধুবাদ জানাই, গুড অর্গানাইজার আমাদের সমাজপতিরা। এদের কেউ তার সম্পত্তির একটা বড় অংশ সিডর দুর্গতদের জন্য বিলিয়ে দিতে চান, ঘোষনা করলে এটা সাধারন মানুষকে খুব বেশি নাড়া দিত। এটা স্বাভাবিক ব্যাপার ও সাধারণ ব্যাখ্যা। দেশকে গড়ার জন্য নেতৃত্বের পক্ষ থেকে অসাধারণ কিছু দৃষ্টান্ত স্থাপন প্রয়োজন তা সম্ভব না হলে জনগণের মাঝে নতুন উৎসাহ বা উদ্দমের সৃষ্টি হবে না। সমাজের বুদ্ধিজীবিদের অবস্থাও এমনটাই। তারা টকশো ও গোলটেবিল বৈঠকের সিডিউল নিয়ে যতোটা ব্যস্ত এসব মৌলিক মানবীয় ব্যবহারিক কাজে অতোটা উৎসাহী নন। কারণ একাজগুলো হচ্ছে বাস্ত ব যেখানে শারীকিভাবে উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। লোক তৈরী করা, ত্যাগের জন্য নিজের প্রস্তুতি নেয়া, অন্যকে প্রস্তুত করা। এ ত্যাগের জন্য সময় ও অর্থের জলাঞ্জলী দেয়ার জন্য কার সময় আছে। হ্যাঁ, বিশ্বব্যাংক বা অন্যকোন দেশ থেকে একটা ডোনেশেন পেলে কাজ করতে অনেকেই প্রস্তুত হবেন, নিজের পরবর্তী চলাফেরাটাও স্বাচ্ছন্দপূর্ণ হবে। এছাড়া নিজের খেয়ে বনের মহিষ তাড়াবে কে?

www.pathagar.com

আমাদের চারদিকের বস্তুনিচয়কে আমরা সেন্সরীঅর্গান দিয়ে অনুভব করি এবং সেই অনুভব অনুভূতিকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভাল-মন্দ, কম-বেশি, উন্নত-অবনত, সুন্দর-অসুন্দর পারসিভ করি। অজস্র কার্যকারণ বা ফ্যাক্টর এর সাথে জড়িত থাকলেও যারা জন্মগতভাবেই এসব বস্তুনিচয়কে খুব দ্রুততার সাথে সঠিকভাবে পারসিভ করতে পারেন তাদের পারসেপশন উন্নতমানের বলে আমরা ধরে নেই। সঠিক পারসেপশন বলতে কোন কিছুকে সেই জিনিসটার মত করেই বুঝতে পারাকে বুঝায়। ধরা যাক যারা লণ্ডনে যাননি তাদের সামনে হাইড পার্ক, কেনসিংটন প্যালেস ও রানীর বাড়ির বর্ণনা দেয়া হল। এ বর্ণনায় শ্রতাদের একেকজনের একেকপ্রকার ধারণা ঐ পার্ক ও প্রাসাদ সম্পর্কে হবে। তারপর তাদেরকে ঐ স্থানগুলো পরিদর্শন করতে দিলে তারাই বলবেন কার কতটুকু মিলেছে। যার যতটুকু বাস্তবতার সাথে মিলবে এই বিষয়টাতে তার পারসেপশন উন্নত বরে ধরা হবে। তাই আমাদের পারিপার্শ্বকে, জীবনযাত্রাকে এবং সর্বোপরি এ পৃথিবীকে সঠিকভাবে পারসিভ করতে না পারলে গন্তব্যে পৌঁছা যাবে কঠিন। এজন্যই মানুষের শিক্ষা প্রয়োজন। নানান জাতের শিক্ষা মানুষের পারসেপশনকে বাড়ানোর বা উন্নত করার কাজে লাগে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাসহ যে কোন প্রকারের শিক্ষাই হতে পারে পারসেপশনকে সঠিক ও উন্নত করার সহায়ক শক্তি। ড্রাইভিং শেখার জন্য পঞ্চেন্দ্রিয়কে ব্যবহার করতে হয়। প্রশিক্ষনার্থীর কেউ কেউ খুব তাড়াতাড়ি গাড়ি চালোনো শিখে ফেলবে, তাদের কেউ এমন আছেন যাদের কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই অথবা শহুরে জীবন শুরু করেছে কেবল কয়েকমাস। এ ব্যক্তির পারসেপশন বেটার। বুদ্ধিমত্তার সাথে এসব মেন্টাল প্রসেস জড়িত হয়ে কর্মসম্পাদন করে। কেউ ভাল ফুটবল খেলে, কেউ ভাল বাঁশী বাজায়, কেউ ভাল এ্যাথলেট। এরা সকলেই ঐ নির্দিষ্ট বিষয়টির ক্ষেত্রে সুনিপুন কলা কৌশল অন্যদেরচে ভাল বুঝতে পারেন। কতকটা হয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কিন্তু তারও আগে ঐ বিষয়ে তার জন্মগত একটা পারদর্শীতা থাকে যেটা সবচে মূল্যবান। আমরা জানি না এই জন্মগত রশদ বা উপাদান কার কোন বিষয়ে বেশী বা কম থাকে। জানলে খুবই ভাল হত। জানার ব্যবস্থা একদমই নেই তাও বলা যাবে না। মনোবিজ্ঞানীরা শিশুদের মনোজগতে বিচরণ করে তাদের ভাল লাগা খারাপ লাগা, পারদর্শীতা, কোন বিষয়ে তাদের আগ্রহ বেশি এবং পরবর্তীতে ভাল করার সম্ভাবনা আছে বিজ্ঞানসম্মত ভাবেই নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বলতে পারেন। আসল কথা হচ্ছে আমাদের জন্মসূত্রে পাওয়া বুদ্ধিমত্তা অথবা অন্য কোন যোগ্যতার জন্য কেউই দায়ী নয়। কেবল মেডিকেল কারণে যদি ভ্রুনে কোন সমস্যা হয় এবং সেজন্য ব্রেইনে সমস্যার কারণে বুদ্ধিকম হয় এটা ছাড়া আমরা জন্মের পর সামাজিক প্রশিক্ষণ অথবা প্রতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কিভাবে আই.কিউ বাড়াতে পারি অথবা বেটার পারসেপশন তৈরী করতে পারি সে চেষ্টা করা উচিৎ। এক্ষেত্রে একটা উদাহরণ দেয়া যায়। 'গণতন্ত্র' নামে তথাকথিত পপুলার একটা সিস্টেমের নাম আমরা জানি। আমরা সকলে গণতন্ত্রের পুজারী অথচ কেউ এটাকে অনুসরণ করি না। গণতন্ত্রের চর্চা না করলে কি তার সুফল পাওয়া যাবে? আদৌ না।

www.pathagar.com

তদ্রুপ আমরা রাসুল (সঃ) কে ভালবাসি, তার পোষাককে ভালবাসি তার মতো দাড়ি রাখতে পছন্দ করি অথচ তার ব্যবহারিক জীবনকে অনুসরণ করি না, তার চরিত্র থেকে শিক্ষা নেই না। রাসুলের (সাঃ) ত্যাগের প্রতি আমাদের আগ্রহ থাকে না। আগ্রহ থাকে বিভিন্ন ধরনের কিস্‌সা কাহিনী শোনার ব্যাপারে। অনেক সময় এসব গল্পগুজব শুনে কেঁদে বুক ভাসাই কিন্তু রাসুল (সঃ) এর কষ্টের জীবনকে আদৌ অনুসরন করি না। যা অনুসরন করলে মানবতা মুক্তি পেতো। আমরা যদি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিষয়টা মাথায় নাও রাখি শুধু সামাজিকভাবে মানুষ যতোটুকু প্রশিক্ষণ পায়, বয়স বাড়ার সাথে সাথে সে যতটুকু বুঝতে পারে তাই তার জন্য যথেষ্ট, যদি তার আশেপাশে নিদর্শণ সৃষ্টিকারী দু'চারজন লোক থাকে। শহুরে ধনাঢ্য ব্যক্তি প্যারাডো ও ট্রাকসহ সিডরের পর একবেলা ত্রাণ বিতরণের জন্য পাথরঘাটা নিজ ইউনিয়নে গেলেন আর একজন ঐ এলাকারই অশিক্ষিত মানুষ যিনি বরাবর সবার বিপদে পাশে থাকেন এবং যিনি মনে করেন বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবাদত- এরা দু'জন কি এক? এক নয়। দ্বিতীয়জন নিঃস্বার্থ ভাল মানুষ,এতে সন্দেহ নেই। তাই তিনি সিডরের পর প্রথমেই লাশ সংগ্রহ ও দাফনের ব্যবস্থা করেন। তিনদিন একটানা নির্ঘুম থেকে নিজের ছেলে মেয়ে ও প্রতিবেশিদের নিয়ে উদ্ধারকার্য চালান।

আমরা যখন বিপদে পড়ি, রোগাগ্রস্থ হই, উদ্বেগপূর্ণ জীবন যাপন করি তখন যে আমার পাশে দাঁড়ায়, সাহস দেয়, আমাকে উৎসাহিত করে, যার অনুপ্রেরণা আমার ভেতরে আশার সঞ্চার করে সেই আসল মানুষ। তাকেই আমরা শ্রদ্ধা করি, তাকেই আমরা পছন্দ করি, ভালবাসি। সুক্ষ্মভাবে মানবচরিত্রকে বিজ্ঞান ভিত্তিক বিশ্লেষণ করলে অনেককিছুই হয়তো বেরিয়ে আসবে। কিন্তু আমরা ব্যবহারিক জীবনে কি ঐ রকম বিচার বিশ্লেষণ করে মানুষকে মূল্যায়ন করি? সমাজে চলতে চলতে পারস্পারিক উঠা বসা ও লেনদেনের মাধ্যমে একে অপরকে বুঝতে পারি এবং এভাবেই আমাদের সম্পর্ক গড়ে উঠে, টিকে থাকে অথবা ভেঙ্গে যায়। কেন মানুষ অন্যের বেদনায় বেদনার্ত হয় না - এ প্রশ্নের অনেক উত্তর হবে। কেউ এ প্রশ্নটাকে গ্রহণ করবেন না। কারণ এটা কোন প্রশ্নই না। কারণ হচ্ছে মানুষ মানুষের ব্যথায় যন্ত্রণায় বিপদে এগিয়ে আসে, সমব্যথী হয়। সবাই আসে না বা সবার এগিয়ে আসার ধরণটাও হয়তো এক না। তবে এ প্রশ্ন কেন এলো যদি মানুষ মানুষের প্রয়োজনে সেভাবে কাজই করে থাকে ? প্রশ্নটা আজ এজন্যই বড় করে এসেছে যে, যতটুকু ভালবাসা বা মায়া একজন মানুষের প্রতি অন্য মানুষের থাকা উচিৎ তার যথেষ্ট ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই ভালাবাসা বা এই দায়িত্ববোধ, সহমর্মিতা পরিমাপের কোন যন্ত্র নেই আর বিপদে এগিয়ে আসা কিংবা মানুষের প্রতি ভালবাসার কোন স্টাণ্ডার্ড পরিমানও নেই যে এতটুকু প্রদর্শন করলে তাকে ভাল মানুষ বলা যাবে। তাকে মানুষ হিসেবে তার দায়িত্বটুকু পালন করেছে বলে ধরে নেয়া যাবে, সে দায়মুক্ত হবে। তবে এসব ক্ষেত্রে যে আল্লাহ এ পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন, এ মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর দেয়া ঘোষণাটাই স্ট্যাণ্ডার্ড।

www.pathagar.com

কোথাও এসেছে তারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি রহমদিল আবার কোথাও আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন এভাবে তারা নিজেদেরচে অন্যের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেয় যদিও তারা অভাবে রয়েছে। সুরা হাশরের এ আয়াত কারও হৃদয়ে প্রবেশে করার পর তার জীবনে আর কোন 'সুস্থতা' থাকতে পারে না। 'অসুস্থতাই' তার জীবনের জন্য সুস্থতা। তার কষ্টার্জিত অর্থ আর তার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হবার জন্য ব্যাংকে বসে থাকবে না। ঘুমের বা বিশ্রামের ফুসরত কই। গরীব, অভাবী, অভুক্ত, নানান ভাবে নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর কুরআনী আহ্বান তাকে উদ্বেলিত করে সর্বক্ষণ ঘোরের মধ্যে রাখবে। আর কি করা যায়। যে আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক, প্রভু তার আহ্বান আমরা প্রত্যাখ্যান করি কিভাবে। 'আমার' বলতে কোন জিনিসের আর অস্তিত্ব থাকে না। আমাদের কাছে যে অর্থ সম্পদ জমা আছে তা মূলতঃ আমানত। আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত। এই কনসেপ্ট বস্তুগত পুঁজিবাদী কনসেপ্টের বিপরীত। পুঁজিবাদ মানুষের কাছ থেকে সামাজিক ও রাষ্ট্রিয় কলাকানুনের মাধ্যমে পুঁজির পাহাড় গড়ে তারপর বুভুক্ষু মানুষের জন্য রিলিফ নিয়ে যায়। তারা এসব নিয়ে পলিটিক্স করে। জন্মগতভাবে সকল মানুষের অধিকার আছে মৌলিক সমস্যাগুলো মেটানোর, এগুলো রাষ্ট্রেরই কাজ। আর রাষ্ট্রকাঠামো বিনির্মানে জনগণের অংশগ্রহণ অবশ্যম্ভাবী। ব্যক্তিগঠনে কুরআনের এ আহ্বানের পাশাপাশি রাষ্ট্রগঠন ও রাষ্ট্রীয় কল্যাণের জন্য কুরআন আহ্বান জানায়। জালিম অধ্যুষিত এলাকা থেকে নির্যাতিত ও নিস্পেষিত পুরুষ মহিলা ও শিশুদের মুক্তির জন্য টাকা পয়সা খরচ করা ও সময় খরচ করে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে বলেছে কুরআন। ঐ নির্যাতিত জনগোষ্ঠির সাথে এই ভাল মানুষরা মিলে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করবে সৎ ও খোদাভীরু রাষ্ট্র প্রধান অথবা ভাল নেতৃত্বের জন্য। সুতরাং আল্লাহই উৎসাহিত করেছেন মানুষকে অন্য মানুষের খাতিরে সর্বস্ব উজার করে দিতে। এজন্য এ দানকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেবার ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আল্লাহ। আল্লাহর প্রেরিত নবী রাসুলগণ যাদের দায়িত্ব ছিল পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করা- মানুষের প্রতি অন্য মানুষের দায়িত্ব কর্তব্য কি তা মুখে বলা ও নিজেদের ব্যবহারিক জীবনে পালনের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা-তারাও পৃথিবীতে মায়া ও ভালবাসার খুশবু ছড়িয়েছেন। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর সারাটা জীবনই উৎসর্গ করেছেন মানুষের ভালবাসায় ও কল্যাণে। পৃথিবীর সকল সত্যকে স্বীকার করা ও এক প্রকারের সাধুতা তা আমার বিপক্ষে বা পক্ষে যে দিকেই যাক না কেন। ধর্মকে অস্বীকার করতে গিয়ে এক শ্রেণীর মানুষ ধর্ম প্রচারকদের বিরোধীতা করেন, তাদের চরিত্র হরণ করার চেষ্টা করেন। এ অসত্য কাজটা করতে গেলে তারা নিজেরাই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েন। ধর্ম স্বীকার করেন কি না করেন ইতিহসাকে তো অস্বীকার করতে পারেন না। নবী রাসুলদের নিস্পাপ চরিত্রের উপর কালিমা লেপন করতে চাওয়াতো বোকা ছাড়া আর উন্মাদ ছাড়া কারও পক্ষেই সমীচীন নয়। যাই হোক সত্য স্বীকার করা সত্যকে প্রচার করা মহৎ কাজ। মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন যে, যে ব্যক্তি নিজের জন্য যা চায় অন্যের জন্য তা না চায় সে আমার দলভূক্ত নয়। এ প্রসিদ্ধ বানী আমাদেরকে কুরআনের সুরা

www.pathagar.com

হাশরের ঐ আয়াতটির মতই নিজকে অপরের জন্য বিলিয়ে দিতে নির্দেশ করে পরামর্শ দেয়। রাসূল (সঃ) নিজে যা বলতেন তা করতেন, এটা সর্বজনস্বীকৃত আমরা মানুষের ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মানবকল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য কুরআন ও হাদীসে আরও নির্দেশ, উপদেশ দেখতে পাই। মূলতঃ এসব বানী যদি কেউ অনুকরণ অনুসরণ না করে তাহলে সে টের পাবে কিভাবে মানবকল্যাণে উৎসর্গীকৃত জীবনে কত স্বাদ। আমরা রাসুলের (সঃ) জীবনের প্রতিটা মুহূর্তই দেখি এই সৃষ্টির সেরা মাখলুকাতের কল্যাণে নিজেকে ব্যস্ত থাকতে এমনকি নামাজের কাতার থেকে বেরিয়ে গিয়ে সোনার মহড় বিলিয়ে এসে প্রশান্ত চিত্তে প্রভুর দরবারে দাঁড়াতে দেখি। রাসুলের (সঃ) সাম্যের সমাজ আমরা দেখিনি, শুনেছি কেবল। রাসুলের (সঃ) জীবনের, ঐ সমাজের প্রতিফলন আমাদের সমাজে ঘটানোর মাধ্যমে সমাজে শান্তি ও সুখ প্রতিষ্ঠা করা আমাদের কাজ। ঐ সময়ের সুখ শান্তির সংবাদ যদি আমাদের ভাল লাগায়, এতদিন পরেও আমরা সে সময়ের সুবিচার ও ভ্রাতৃত্ববোধের সংবাদ শুনে তৃপ্তি পাই ও বিমোহিত হই। সাহাবীদের আনুগত্যতা, দেশপ্রেম ও সামাজিক দায়িত্ববোধের কারণেই যদি তারা দীর্ঘ দিনের বংশীয় ও গোত্রীয় কোন্দল নিমিষে ভুলে গিয়ে পরস্পর পরস্পরকে আপন হিসেবে বুকে টেনে নিতে পারেন তাহলে আমরা কেন পারব না। অনেকে মনে করেন আল্লাহর নবীর পক্ষে রাসুলদের পক্ষে যা সম্ভব ছিল আমাদের পক্ষে তা সম্ভব না। আসলে এ সময়েও এটা সম্ভব। সমাজকে তারাই পরিচালিত করবে সমাজের মানুষের প্রতি যাদের কমিটমেন্ট বেশি। যারা মানুষকে ভালবাসবেন তাদের দুঃখ কষ্টে তাদের পাশে দাঁড়াবেন, একটা সুশাসনের রাষ্ট্র নির্মাণে ওয়াদাবদ্ধ হবেন তাদের আল্লাহ রাষ্ট্র ক্ষমতা দেবেন। আমাদের সুনিয়ত আছে, পরিকল্পনাও করি কিন্তু সুআমলের বেশ অভাব। দেশ স্বাধীনের পর কতোগুলো বছর পেরিয়ে গেল। কত নেতা নেত্রী এলেন, চলে গেল। পত্রিকার পাতা জুড়ে কত ছবি ছাপা হল, কত খবর প্রকাশ পেল। দেশের কি মৌলিক পরিবর্তন হল? তেমন কিছুই হয়নি। দেশের পরিবর্তন যা হয়েছে তা অংশবিশেষ লোকদের কেন্দ্র করে। দেশের উন্নতির কথা বলতে হলে এর অধিবাসী একশ ভাগ লোককে সামনে রেখে কথা বলতে হবে। কত ভাগ লোক খেতে পায়, কত ভাগ লোক শিক্ষিত, কত ভাগ লোক খোলা আকাশের নিচে টয়লেট করে। এর পরিসংখ্যান নিতে হবে। আগে কত শতাংশ ছিল বর্তমানে কত? শিশু মৃত্যু মাতৃমৃত্যু হার দেখতে হবে, বেকারত্বর হার দেখতে হবে, মাদকের প্রভাব, সন্ত্রাসের দৌরাত্ব চাঁদাবাজির হার ও দেখতে হবে। এসব কি বেড়েছে না কমেছে। জনজীবনে এর প্রভাবে লোকজনের মনোভাব কি! নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি আর অভিজাত এলাকায় এ্যাপার্টমেন্টের সংখ্যা বৃদ্ধির কোনটায় লোকজন বেশি খুশি হয় বিবেচনা করতে হবে। মোবাইল ফোনের কলরেট কমাটা দেশের উন্নতির লক্ষণ না দেশীয় উৎপাদিত পণ্য বাজারে বেশি বাজারজাত হবার কারণে পণ্যের মূল্য কমাটা দেশের উন্নতির লক্ষণ বুঝতে হবে। আশ্চর্য লাগে যখন আমরা শিক্ষিত মানুষের মুখে মিথ্যা শুনি। সত্যের মত করে সমাজের কর্তা ব্যক্তিরা যখন মিথ্যা বলেন সে সমাজে কিভাবে

www.pathagar.com

শান্তি আসবে। রাজধানী ঢাকা শহরের দু'একটা রাস্তাঘাটকে সুন্দর করা আর কিছু চোখ ঝলসানো ইমারাত কি দেশের উন্নতির মাপকাঠি।

হাজার হাজার লোক প্রতিদিন এক বেলা আধা বেলা না খেয়ে দিন কাটায়, রাজধানীর ব্যস্ততম রাস্তার ফুটপাতেই ঘুমায় সহস্র লোক। বস্তি আর পার্কতো বাদ। এসব স্থানেই তাঁদের নিত্যদিনের সংসার। দে আর মাইগ্রেটিং ফ্রম প্লেস টু প্লেস। একটা বড় বস্তা মাথায়, হাতে আর একটা, সাথে বউ ও তিনটা বাচ্চা। বিকালের মধ্যেই এলাকা ছাড়তে হবে। এখানে দোকান বসবে, মাস্তানদের নির্দেশ। তাই চলে যাওয়া। একটা সংসার। শেরপুরের এ লোকটার কাছে সমাজ কি, সংসার কি দেশের উন্নতি অবনতির সংজ্ঞা কি। বিকালের পর সন্ধ্যা। কোথায় পৌঁছবে এলোক? অনেকদিন ধরে কোন কাজ নেই। তিন বাচ্চাসহ কেউ কাজে নেবে না। অথচ অনেক বাড়ির লোকজনই বলেন 'কাজের লোকের খুব অভাব'। আমরা কি কেউ এই লোকটার দু'বস্তার সংসারটার কথা নিজ জীবনে ভাবতে পারি। এমনটা আমার জীবনে হতে তো পারতো! ইচ্ছে করেতো আমি আমার বাবার সংসারে জন্মাইনি। এও একজন মানুষ। ঐ ভদ্রলোকের মতো আমি এ সংসারের বস্তার মালিক হলে, ওর মতই গ্রাম থেকে শহরে আর শহরে প্রবেশের পর মহল্লা থেকে মহল্লায়, রাস্তা থেকে পার্কে ঘুরে বেড়াতাম। আমরা কি জানি তার জীবনে স্ট্রেচগুলো কি? সেটা কি সকালে লিফট না চলা, সেটা কি শীতে ইঞ্জিন ঠাণ্ডা থাকার কারণে গাড়ি স্টার্ট না নেয়া বা ভুলে মোবাইল বাসায় রেখে আসার মত স্ট্রেচ না কম বেশি। আমরা কি তা জানি? আমরা কি বলতে পারব এ লোকের কোন দুঃখ আছে কি-না। তার দুঃখবোধ প্রকাশ কি আমারই মতো যে টি রুমে হাসতে হাসতে বলব 'আপা মনটা ভাল নেই, চেম্বারে রুগী কমে গেছে'। পাঁচ সদস্যের সংসার চালাতে তার প্রতিদিন কত খরচ হয় আর সে কয় টাকা রোজগার করে? তার বাচ্চারা কি স্কুলে যায়? ওদের কি এডুকেশন পলিসি প্রয়োজন? ছোট বাচ্চাটার কি টীকা দেয়া হয়েছে। তা কি ও জানে কেন টিকা দেয়া দরকার। আমরা কি কেউ এতটুকু বুঝতে পারি জীবন তার কাছে কেমন? হয়তো পারি না। তাকে নিয়ে আমার কি কোন ধরণের আগ্রহ আছে? তার বাচ্চাদের মলিন মুখ, অজান্তে পাড়ি জমানোর উদ্বেগ, স্ত্রীর নোংড়া কাপড় ও এ্যানিমিক চেহারা কি আমাদের কিছু বলে? আমরা কি এমন দৃশ্য দেখতেই থাকব আর আমার না পাবার বেদনার কথা বলে বেড়াব। চলতেই থাকবে এভাবে?

একজন মানুষ কিছু চাহিদা জন্মগতভাবেই নিয়ে জন্মায়। ক্ষুদা, তৃষ্ণা, ঘুম তার মধ্যে অন্যতম। কিছু চাহিদা আর পরিপার্শ্ব থেকে তৈরী হয়। সমাজের শিক্ষা তাকে এসব শেখায়। বিয়ে করার সময় কোন ধরনেন স্যুট বা কোন জাতীয় শাড়ী বর বা কনেকে দিতে হবে তা সমাজ শেখায়। বিদেশ থেকে ফেরার সময় আত্মীয়দের কতটা মূল্যবান গিফট দিতে হয় তা সমাজের শেখানো প্রশিক্ষণ। সামাজিক এসব রীতিনীতির প্রশিক্ষণ একেক সমাজে একেক রকম। দেশভেদে সমাজ ভেদে এ ভিন্নতার কারণে

www.pathagar.com

মানুষের জীবন যাপনের মান ওঠা নামা করে। সামাজিক চাপও দায়বদ্ধতার কারণে কোন সমাজে কাউকে দুধ বেচে মদ খেতে হয়। অনেকের মেহমানদারীর সামর্থ নেই অথচ লোকে কি বলবে তাই নাতির খতনায় ভোজ, মেয়ে তুলে দেয়ার সময় বিশাল আয়োজন, জামাইকে যৌতুক না চাইতেও মটর সাইকেল কিনে দেবার প্রতিশ্রুতি প্রদান এসবই নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সামর্থের বাইরের কাজ। এসকল অকাজ, কুকাজ যখন কাজে পরিণত হয় তখন মানুষের জন্য কাজ করার সময় কই। সেজন্যই যারা মানবকল্যাণে আত্মাহুতি দেবেন তাদের সকলের সবধরণের সামাজিক কু-প্রথার বিরোধীতা করতে হবে অন্ততঃ যে সামাজিক প্রথায় অপচয় হয়। দারিদ্রপীড়িত এ সমাজে কোন ধরণের অপচয়ের সুযোগ নেই। ধনী বলে খ্যাত মানুষদের ও অপচয় করা উচিৎ না। কারণ সবধরনের অর্থই আমাদের দেশের সম্পদ। সুতরাং যে কোন ধরণের অপচয়কেই রোধ করা আমাদের কর্তব্য। কারণ ঐ সম্পদটুকুন অভুক্ত মানুষদের প্রয়োজন। প্রয়োজন সমন্বয়ের। ধনীদের টাকার পরিমাণ অনেক। নিজেদের টাকার প্রতি মায়া আছে ঠিকই কিন্তু তারা অপচয়ও করে থাকে প্রচুর। ভাবতে কি পারেন আপনার বাসি ও পঁচে যাওয়া খাবারের পরিমাণ প্রতিদিন কত? একটু খেয়াল করলেই এ খাবারটা অভুক্ত মানুষগুলোর জন্য দেয়া যেতো। অবশ্যই আমাদের সিরিয়াসনেসের অভাব আছে। সিরিয়াসনেস থাকলে ঐ খাবার যথাস্থানে পৌঁছে যেতো। সিরিয়াস হবেন কিভাবে! সিরিয়াস হবার জন্য কোন উত্তেজক থাকতে হবে। কোন এক বিশেষ ধরনের মটিভেশন কাজ করতে হবে- নইলে সচেতনতা বৃদ্ধি পায় না, সিরিয়াস হওয়া যায় না। কি কারণে মানুষ সিরিয়াস হয়ে নিজের সবকিছু বিসর্জন দেবে। যথেষ্ট কারণ ও ব্যাখ্যা স্পষ্ট না থাকলে কেউ কি বোকার মত সব অন্যদের বিলিয়ে দেবে নাকি? মানুষের ভালবাসায় উদ্বেলিত হয়ে এসব করতে হবে। আল্লাহ করতে বলেছেন তাই করতে গেলে প্রশান্তি সহকারে মানুষের জন্য করা যাবে কারণ এটা ঈমানের অংশ। ঈমান আনার পর মানুষের জন্য করণীয় কাজগুলো না করলে মূলতঃ ঈমানের দাবীই পালন করা হয় না। যখন একজন মানুষ নিজেকে বিশ্লেষণ করেন, বুঝতে পারেণ আমারও কিছু করণীয় আছে। 'সরকার করে না কেন' বলে ফাঁকি দিলে হবে না। বুঝতে হবে যে আমরা প্রতিটা নাগরিকই এক একটা সরকার, বিশেষ করে শিক্ষিত লোকরা। "আমাদের জীবনতো একটাই"- ইদানীং বিজ্ঞাপনেও এ ডায়লগ শোনা যায়। জীবনতো একটা, তাই ফ্রেশ থাকতে চাই। জীবন একটা কিন্তু সেটার সমাপ্তি আছে। অতএব কেউ যদি বলে সে জীবনকে ফ্রেশ রাখার জন্য অন্যায়ভাবে অর্থ উপার্জন গ্রহণযোগ্য। যেহেতু শরীরটা আবার মাটিতেই মিশে যাবে সুতরাং মাটির কাছাকাছি থাকাটাই ভাল। একটা শরীরে একই সময়ে আমরা একটা সার্টই পড়ি, পড়ি একটা প্যান্ট। তারপরও কেন এতো হা পিত্তিস। এই হাপিত্তিসটাই এক ধরণের অসুস্থতা। চাহিদার যখন শেষ থাকে না তখন চাহিদা মেটানোর জন্য অন্যায়, অনৈতিক ও অবৈধ কাজতো করতেই হবে। সমাজের অন্যায় ও অনৈতিক কাজগুলো করে সব শিক্ষিত লোক। এই গতানুগতিক শিক্ষা আমাদের মুনাফিক

www.pathagar.com

হিসেবে তৈরী করেছে। মানুষ জন্মগতভাবেই দ্বান্দ্বিক। তাকে আধুনিক শিক্ষা কিছুটা সংস্কারমুক্ত করেছে ঠিকই, কিন্তু দ্বন্দ্ব তার জীবনে রয়েই গেছে বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব বেড়ে গেছে। সামাজিক একটা বড় ধরণের পরিবর্তনের জন্য উদার মানসিকতা সম্পন্ন নৈতিক বলে বলীয়ান কিছু নিবেদিত প্রাণ অতিব জরুরী। এরা জৈবিক সুখকে বড় করে দেখবে না, আত্মিক তৃপ্তিটাকে বড় করে দেখবে। লৌকিক বিত্তবৈভব তাদের আকৃষ্ট করবে না বরং পারিপার্শ্বিক অন্যান্য লোকদের ভাল থাকা খারাপ থাকা তাদের মাথা ব্যাথার কারণ হবে। তাদেরকে কখনো হতাশা গ্রাস করতে পারবে না কারন কর্মের ফলাফলের উপর নয় তার প্রচেষ্টার উপর সে সন্তুষ্ট। তারা সমচিন্তার লোকদের খুঁজে ফেরে তাদের সাথে ওঠা বসায় সুপ্ত স্বাচ্ছন্দ বোধকরে। কারণ চিন্তা ও রুচিতে অমিল থাকলে তাদের সাথে সাময়িক সময়ের জন্য চলা যায় কিন্তু দীর্ঘপথ চলা যায় না, বড় পরিকল্পনাও গ্রহণ করা যায় না। যারা আত্মোৎস্বর্গী মহামানব তাদের সাহচার্যই অন্যরকম। তাদের কাছাকাছি থাকা মানে একটা নিশ্চিত জীবন। তারা আমাকে সবকিছুতে প্রাধান্য দেবে। এমনকি কথা বলার ক্ষেত্রে সে আমারটা আগে শুনবে ও আমার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালাবে। তারা এ সকল কাজে একটা সুখ অনুভব করেন। তাই ক্লান্তিহীন তিনি এ কাজ করে যান হাসিমুখে। এদের সংখ্যা সমাজে যখন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হয়ে যাবে তখন সমাজটা পরিবর্তিত হয়ে যাবে। সমাজের সার্বিক রূপই পাল্টে যাবে। ব্যক্তিগতভাবে সৎ, মহৎ ও নিষ্ঠাবান এমন লোক সমাজে বেশ আছে। কিন্তু তারা সমাজের নেতৃত্ব দিতে অপ্রস্তুত। কখনো চলমান রাজনৈতিক কুকালচারকে অপছন্দ করে বলে এপথে পা বাড়ায়নি, কখনো এতোটা ঝুঁকি নেয়ার অথবা বিতর্কিত হবার সাহস করেনি। তাত্বিকভাবে এসব ব্যক্তিরা জানেন সমাজের আমুল পরিবর্তনের জন্য রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ছাড়া সম্ভব নয়। কিন্তু ব্যবহারিকভাবে এ কাজটা করার ঝুঁকি সবাই নিতে পারেন না। অথচ আজ সমাজ পরিবর্তনের জন্য এ ঝুঁকি নেয়ার লোকই বেশি প্রয়োজন। মানুষের ভালবাসার খাতিরে মানবিক কারণে যাদের পাশে দাঁড়ানোর প্রশ্ন উঠছে সেই নীরিহ ও ভাগ্যাহত মানুষগুলোর সমাজে কোন পাওয়ার নেই, চেয়ার নেই। একটা সাম্যের সমাজ কায়েমের কথা উঠলেই চেয়ার আকড়ে বসে থাকা ব্যক্তিদের মাথা খারাপ হয়ে যায়। তারা জোট বাধবে, তাদের সুখ কেড়ে নেয়ার চেষ্টা হচ্ছে এমন হেডিং এ তারা হাউকাউ বাধিয়ে দিয়ে আত্মরক্ষার জন্য বিদেশী প্রভুদের কাছে নালিশ করতেও পিছপা হবে না। তাদের যেহেতু দেশের প্রতি কোন প্রকার কমিটমেন্ট বা ভালবাসা নেই তাদের স্বার্থে যে কোন কারও ক্ষতি করতে কিংবা দেশের ক্ষতি করতেও তারা চিন্তা করবে না। আজকের সমাজপতিরা ভাল থাকার, ক্ষতি হবার, উন্নতির, প্রসারতার যে সংজ্ঞা আটছেন তা মূলতঃ নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর বেলায় প্রয়োজ্য। মানুষের বেলায় উন্নতি অবনতি পাওয়া না পাওয়ার সংজ্ঞা ভিন্ন। আমি আমার এলাকার একজন শিক্ষিত ব্যক্তি। পচিশ ত্রিশ বছর আগে আমি যে ডিগ্রি নিয়েছি আমার পর আর কেউ সেই ডিগ্রি নিতে পারেনি। আমিই প্রথম ও শেষ। ব্যাখ্যা করা যায় নানাভাবে। আমার এলাকাতে আমার মত শিক্ষিত লোক দ্বিতীয়টি

www.pathagar.com

নেই। পত্রিকায় আমরা এমন খবর পাই। আমেরিকার অমুক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ঐ ডিগ্রি পেয়েছেন, বাংলাদেশে তিনিই প্রথম অথবা সাউথ ইষ্ট এশিয়ায় তার এ খেতাব প্রথম। অথবা অমুক সেমিনারে তার উপস্থিতি বাংলাদেশ থেকে এমন কোন সেমিনারে প্রথম। মানুষ এসব দেখে হাসতে পারে সে প্রসঙ্গ বাদই দিলাম যিনি ডিগ্রিধারক ব্যক্তি তিনি নিজেই বিশ্লেষণ করুন, বিচার করুণ- হাসবেন। প্রতারনার এসব ধরণ এমন এমন লোক ব্যবহার করেন যা সত্যিই লজ্জার। সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করে পেশাগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের এ এক চমৎকার কৌশল। এরা একটা স্বার্থান্বেষী মহল। এদেরকে প্রতিহত করতে আইন সহযোগীতা করতে পারে। তা করবে না, কারণ সর্বত্রই এ জাতীয় লোক আছে। বর্তমান সময়টা তাদের জন্য। এদের কাছে সুখ শান্তির সংজ্ঞা ভিন্ন। ইফতারীতে আজানের পর পরই ওনাদের মত লোকরা শরবতের গ্লাসটা সর্বাগে টানবেন, একটুকরা বরফ যোগ করবেন। শরবতে চুমুক দেবেন আর তৃপ্তি নেবেন। মাহফিলে ক'জন লোক, শরবত সবাই পেল কিনা কিছু যায় আসে না। ওদিকে কয়েকজন লোক যে ইফতারীই পাননি সেদিকে খোয়ল নেই। অন্য একজন সকলের ইফতারী হাতে পৌছলো কি-না ভেতরে কয়টা প্যাকেট আছে খোঁজ নিয়ে অতিরিক্ত প্যাকেট আনতে বলে তার উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করে। সবাই যখন একই খাবার পেল, খেয়ে নামাজে দাঁড়ালো তখন তার মনে হল সে শরবত ছাড়া আর কিছু মুখে দেয়নি। কেউ কেউ দৌড়াদৌড়ি বন্ধ করে খেতে বলেছিল। এটাতে তার তৃপ্তি। এমনভাবে সবকিছুতেই সংজ্ঞার পরিবর্তন হয়, ব্যখ্যা বিশ্লেষণের ভিন্নতা চোখে পড়ে। আর তাই সমাজের বিভিন্নজন তাদের খোড়া যুক্তিতে অপকর্ম করার সুযোগ পান। আমরা শিক্ষাটা সঠিক ভাবে পাইনি বলেই এ অবস্থা।

আমার পাশের লোকটি যদি ধনী হন, যদি দায়িত্ববান ব্যক্তি হন, তার মধ্যে যদি মানুষের প্রতি অগাধ ভালবাসা থাকে, তিনি যদি পরোপকারী হন, তিনি যদি আমানতের কোন খেয়ানত না করেণ, তিনি যদি চরিত্রবান হন তাহলে আমিই সবচে বেশি খুশী হব। আমার মতো সৌভাগ্যবান তখন আর কেউ হবে না। আমি তার সৌভাগ্যবান প্রতিবেশী হব। আমি হতে পারব তার গর্বিত সহকর্মী, আমি হব তার অধীনস্থ একজন স্নেহপরায়ন কর্মচারী যার মাথার উপর বিশাল এক ছাতা। আমি এমন লোককে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করতে কাপর্ণ্যতা করব না। আমরা সব সময়ই ভুলটা বুঝি। সমাজের একটা বড় শ্রেণীকে পশ্চাতে ঠেলে আমরা কি সুখ পাব? তাদেরকে পরিকল্পিতভাবে হয়তো আপনি আমি দূরে ঠেলছি না, তাদেরকে ঠকাচ্ছি না কিন্তু তাদের ক্রমশঃ এভাবে দুরবস্থা থেকে অধিকতর দুরবস্থায় নিপতিত হবার বিষয়ে আমাদের নীরবতাই সহায়তার নামান্তর। আমরা নীরব থাকলে প্রমানিত হয় যে আমরাও অন্যান্য স্বার্থান্বেষী মহলের মতই এক কাতারে দাঁড়িয়ে আছি, মানুষকে মুক্তি দেয়ার ক্ষেত্রে আমাদের কোন পরিকল্পনা নেই। সুতরাং চুপ থাকার কোন সুযোগ নেই। কথা আমাদের বলতেই হবে এবং তা আমাদের প্রয়োজনে। আমাদের সুখ বিঘ্নিত

www.pathagar.com

হোক, শান্তি বিনষ্ট হোক তা আমরা চাই না। তাই যারা নির্বোধ তাদেরকে যুক্তি দিয়ে বুঝানো যে, সুখ-শান্তি সমাজের একা কেউ ভোগ করতে পারে না।

ভালবাসা বা মায়া মমতা নেই এমন কোন মানুষ পাওয়া যাবে না। বুদ্ধি প্রতিন্দ্বীকে দেখা যায় তার ছোট বোনকে কোলে তুলে বারবার চুমা দিতে। এদেরকে বাবার অসুস্থতার সময় কাঁদতে দেখা যায় অর্থাৎ তাদের বুদ্ধি বিবেচনা কম থাকলেও অনুভূতিতে নাড়া লাগে এবং সে আপ্লুত হয়। সমাজের সব লোকই মায়াবী ও দয়ালু। ক্ষেত্র বিশেষে এদের দয়া মায়া ও ভালবাসার প্রকাশ ঘটে। কারও ক্ষেত্রে নিজের সন্তানের বেলায়ই মায়ার স্তর অতিদ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায়। একই রোগ বারবার হলেই বিরক্ত হয়ে চিকিৎসা বন্ধ করে দেয় কেউ, একবার পরীক্ষায় খারাপ হলেই স্কুলে যাওয়া বন্ধকরে দেয়, স্ত্রীকে রান্না বান্না ঘর সংসারের কাজে সহযোগিতাতার বদলে রাগারাগি ও চিৎকার করে। সাধারণতঃ লোকজন নিজের স্ত্রী সন্তান ও বাবা মার প্রতি বেশ দয়াবান হন এবং ভাল আচরণ করেন। এসব ক্ষেত্রে তাদের কম বেশি ত্যাগও করতে দেখা যায়। পরীক্ষার দিন সকাল বেলা বাবার হঠাৎ প্রেসার বেড়ে গেলে তাকে হাসপাতালে নেয়া, তার পাশে থাকার দৃষ্টান্ত মোটেই বিরল নয় বরং এটা স্বাভাবিক দৃশ্য। বাবা-মা ভাই বোনের বেলায় অনেকে নির্দয়ও হন ক্ষেত্র বিশেষে। যারা পারিবারিক পরিমণ্ডলে ভাল মানুষ বলে পরিচিত নন, যারা এখানে পরীক্ষিত দয়ালু লোক নন, যারা পরিবারে ভালবাসার ঘ্রান ছড়াতে ব্যর্থ তারা বর্হিঃসমাজে এসব গুণাবলীর ব্যাপক বিস্তার ঘটাবেন আশা করা মুশকিল। স্বাভাবিক ক্ষেত্রেগুলোতে এটা অনাকাঙ্খিত। তবে যাদের পরিবারের কাঠামোটাই ত্রুটিযুক্ত, যেখানে সব সদস্যরাই সন্দেহপ্রবন, বিশৃঙ্খল জীবন যাপনে অভ্যস্থ সে পরিবারের কোন সদস্য হয়তো নিজ পরিবারের লোকদেরচে অন্যদের বেশি ভালবাসতে পারে, তাদের পছন্দ করতে পারে। বাইরের লোকদের প্রতি দায়িত্বপালনে পরিবারের কাছে বিতর্কিত হতে পারে। এমন ও হয় এহেন আচরণে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা হতবাক। তবে এমনটা ব্যতিক্রম। যারা মানুষের জন্য নিবেদিত, মানুষকে ভালবাসেন, যাদের হৃদয় দয়া মায়ায় টইটুম্বুর তারা ঘরে বাইরে সর্বত্র সমান। তাদের হৃদয়ে প্রেম ভালবাসা এতই বেশি থাকে যে তারা যতই প্রেমময় হয়ে সমাজ সংসারে সুখ বিতরণে ঝাপিয়ে পড়ে ততবেশি তা হৃদয়ে ফের বাসা বাধে। যেন তা কখনোই নিঃশেষিত হবার মত নয়। সংসারে তো বেশি ঝামেলা থাকে তা তাকে কখনোই হতবিহবল করে না। ভালবাসার মানুষগুলোর চরিত্রই আলাদা। তারা বাবার বিপদে অশ্রুসিক্ত হয়, মার অসুস্থতার কথা শুনে সব ফেলে দৌড়ে আসে, বোনের উপর বোন জামাইর অত্যাচারের কথা শুনে তাদের, মাঝখানে পড়ে মীমাংসা করে, সিমেন্টের মত কাজ করে, চাকরির টাকায় নতুন শার্টটা ছোট ভাইর হাতে তুলে দেয়, তারা শ্বশুরকে আসল বাবা জ্ঞান করে। স্ত্রী টের পায় না তার কোন বড় ভাই নেই, শ্বশুরবাড়িতে সে বড় ভাই। শ্বাশুড়ীর কড়া মেজাজে বিরক্ত হয় না, বউকে বলে শোকরিয়া আদায় কর যে অন্ততঃ তোমার শ্বাশুড়ী রগচটা না।

www.pathagar.com

সবই আল্লাহর ইচ্ছা। বউ অবাক দৃষ্টিতে তাকায় 'কি ভাল কাজ করেছি জীবনে যে তোমার মত একজন ফেরেস্তা টাইপের মানুষ আমর স্বামী হল'। বউয়ের ঠোঁট নড়ে ওঠে। আবেগে উদ্বেলিত হয়। কি হল। লুকিয়ে ফেলে 'না কিছু না তোমাকে দেখছি'। কোন একজন চিকিৎসকের প্রশংসা করেছিলাম অন্য মহিলা চিকিৎসকের সামনে। শোনার পর বলেলন পুরুষদের ভালোর সার্টিফিকেট মেয়েরা দিলেই ভাল হয়। বুঝলাম আমার মন্তব্যে তার আপত্তি আছে। তদ্রুপ বিবাহিত জীবনে স্ত্রীর নিরপেক্ষ সার্টিফিকেটটাই একজন পুরুষের জন্য উত্তম সনদ। কাজেই ঐ ভদ্রলোকের পৃথিবীতে পাবার মত আর কি আছে। পৃথিবী থেকে মানুষ কি নিয়ে যায়। সুনাম, সুখ্যাতি, সুকর্মের স্বীকৃতি। আমরা বিশ্বাস করি মানুষ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেও তার সুকর্মের ফলাফল সে পেতেই থাকবে। দুনিয়ার কোন বিত্তবৈভব, অর্থ সম্পদ সে সাথে করে নেয় না। সবটাই রেখে যায়। কার জন্য রেখে যায়? তার স্ত্রী ছেলেমেয়ে ও স্বজনদের জন্য। সে জানে না তার স্বজনরা এ সম্পত্তি রাখবে না অভাবের কারণে অথবা স্বভাবের দোষে বিক্রি করে দেবে। তার এ সম্পদ সংগ্রহে সারাটা জীবন কেউ সৎ পথে যুদ্ধ করেছে, কেউ অন্যায়ভাবে কখনো স্বাচ্ছন্দে কখনো অত্যধিক ঝুঁকি সহকারে কাটিয়ে দিয়েছে।

আজ যারা ঘুষ গ্রহণ করছেন অতি কড়া রেটে তারা নিঃসন্দেহে অধিক ঝুঁকি নিয়েই একাজ করছেন। কারণ রিস্ক বেড়ে যাওয়াতে রিস্ক এলাউন্স যোগ হয়েছে। তাই অফিস আদালতে কাজ হচ্ছে কম কারণ ঘুষ নেই ফাইলের গতি মন্থর অথবা গতি আছেতো রেট গেছে বেড়ে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে বর্তমান সরকারের অভিযানকে প্রাথমিকভাবে অনেকেই স্বাগতম জানিয়েছিল। তাদের ধারণা ছিল ঘুষ, দুর্নীতি নির্মুল হয়ে যাবে। আসলে কি তা যায়? পুরো সিস্টেমটা নষ্ট হয়ে গেছে। সিস্টেমেই গলদ আছে। আমাদের আইন কানুনগুলোই দোষে পরিপূর্ণ। দীর্ঘদিন ধরে কেউ এব্যাপারে উদ্দ্যোগ নেয়নি। সরকারী নিয়ম কানুনে দুর্বলতা ও জটিলতা থাকলে সাত পাঁচ বোঝানো যায়, আইনের ফাঁকে ফেলে দর কষাকষি করা যায় তাই এসব নিয়ম কানুন আর সরলতা লাভ করেনি। বৃটিশ আমলের জটিলতা বহন করেই চলছে। অনেকক্ষেত্রে সরকারী কর্মকর্তারা অধীনস্থ কর্মচারীদের কাছে নানানভাবে জিম্মি থাকে। ইচ্ছা থাকলে, সুনিয়ত থাকলেই সব ঠিক হয়ে যায় না। সবগুলো পেশায় হাজার হাজার লোক আছে। তারা নিজস্ব স্টাইলে চেষ্টাও করছেন কিন্তু এ সৎ লোকদের বিপরীতে অসৎ লোকের সংখ্যা বেশি এবং তারা নেতৃত্ব দিচ্ছে সবকিছুর। মুশকিলটা এখানেই। আজ চালের কেজি চল্লিশ টাকা। এক বছরে কি এতোটা বাড়তে পারে চালের দাম। এটা এদেশে হয়েছে। অথচ তেমন কোন বড় ধরণের বিপর্যয় এদেশে হয়নি। গণতন্ত্রকে বেকায়দায় ফেলার জন্যই এটা করা হয়েছে। গণতন্ত্রের প্রয়োজন কি, নির্বাচনই যে একটা দেশের গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার প্রথম ধাপ তা এখন সবাই টেরপাচ্ছে। সবাইতো শেষ হয়ে যাচ্ছেন কবে আর বুঝবেন। বুঝার দিনতো আর

www.pathagar.com

থাকছে না। দেশই যদি অন্য লোক চালায় তাহলে আপনারা রাজনীতি করবেন কিভাবে। আপনাদের গোয়ার্তুমির জন্য তো আজ দেশের এ অবস্থা। অন্যরাও চাঞ্চ নিচ্ছে। টকশোতে একটাই কথাঃ সব নাকি রাজনীতিবিদদের দোষ। কেন মানুষ নিজের দিক তাকায় না। যে অবসরপ্রাপ্ত সেক্রেটারী আজ প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রীদের দোষারোপ করছেন তিনি কেন সেদিন লজ্জায়, ঘৃনায় দেশ মাতৃকার টানে চাকরিতে ইস্তফা দেননি। আমরাতো কোন সচিবের পদত্যাগের ঘটনা শুনিনি বা কাগজেও দেখিনি। অনেকেই লুটতরাজ করেছে, বড়দের ভাগে বেশি পড়েছে, ছোটরা কম পেয়েছে। হ্যাঁ একটা নির্বাচিত সরকার অনেক ক্ষমতাবান। তারা জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে আসে বলে তাদের অপরাধগুলোও চট করে কেউ সমালোচনায় আনে না। কিছুদিন অপেক্ষা করে। যতোই ক্ষমতাবান হোক না কেন নির্বাচিত সরকারের অপকর্মের বিরোধীতা সরকারী চাকরি করে করা না গেলেও পদত্যাগতো করা যায়। এসবই করতে পারে সে দেশের প্রতি যার প্রেম আছে, দেশের নীরিহ জনগনকে যে ভালবাসে। পদলোভের চে যার মধ্যে সত্য বলার আকাঙ্খা অনেক বেশি। যিনি শিক্ষাগ্রহণ করেছেন এজন্য যে দেশের মানুষ সত্যালোয় আলোকিত হবে ভেবে, তিনি কোনকিছুকেই পরোয়া করেন না। তার কাছে সত্য মিথ্যার রং সুস্পষ্ট। সিদ্ধান্ত নিতে যার বুক কাপে না। আপোষে তার অস্থিরতা বাড়ে। নতজানুতা তাকে অসুস্থ করে ফেলে। তাই এসব উন্নত মানুষদের দুষ্ট রাজনীতিবিদরাও ভয় পায়। শিক্ষিত মানুষের শিক্ষার মর্যাদা পায় তখন যখন তার শিক্ষা দশের কল্যাণে, পৃথিবীর অগ্রগতির পথে কাজ করে। আমাদের দেশে অন্ততঃ বর্তমান সময়ে অধিকাংশ লোকই ইচ্ছা কিংবা অনিচ্ছায় তার শিক্ষাকে জাতির উন্নতির কাজে লাগাতে পারছেন না, ব্যর্থ হচ্ছেন। আমরা এ ক্ষেত্রে পরিবেশের দোহাই দেই। পরিবেশ তার কাজ করার পথে বাধা হয়ে আছে। পরিবেশ দূষিত সন্দেহ নেই। পরিবেশতো উপগ্রহ থেকে নেমে কেউ দূষিত করেনি। আমাদের মত শিক্ষিত লোকদের হাত ধরেই পরিবেশ নষ্ট হয়েছে। আমরা আমাদের ব্যক্তি স্বার্থকে বড় করে দেখেছি। আমার নিজের পদোন্নতির জন্য প্লটের জন্য, বাড়ির জন্য, এসি ক্রয়ের জন্য, শালার চাকরির জন্য, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য আমরা সর্বদা সুবিধা নিয়েছি। আমার শিক্ষাকে কখনোই আমর আত্মসমালোচনার কাজে ব্যয় করিনি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমি কখনো নিজের চেহারাটা দেখলাম না আছে কি না কোন দাগ এ চেহারায়। সবসময় কাটিয়ে দিয়েছি অন্যের সমালোচনায়, অন্যের দোষ ধরার কাজে। কে কখন কি করে, কে কার বিরুদ্ধে বলে, কার টেবিলে ঘুষের ফাইল বেশি যায়, কোথায় সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে। এসব কাজেই যদি আমার সময় কাটে তাহলে আমার শিক্ষার মানেটা কি দাঁড়াবে? আর সত্যি কথা বলতে কি এসব কাজেই কি আমাদের অনেকের অধিকাংশ সময় কাটে না? ভোটের সরকারের আমলে জনপ্রতিনিধিদের প্রচুর ক্ষমতা থাকে। তারা সে ক্ষমতা নামক অস্ত্রটার যথেচ্ছা ব্যবহার করে, প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করে বেসরকারী সংস্থাপনাগুলোর উপর ও ছড়ি ঘুড়ায়। এ সকল ব্যক্তিদের সন্তুষ্ট রাখার জন্যই আমাদের যাবতীয় আয়োজন। ‘এ কৃষ্টি কোন

একটা বিশেষ আমলে বাধভাঙ্গা পানির মত ঢুকে পড়ে সমাজকে নষ্ট করে দিয়েছে'- সবগুলো রাজনৈতিক দলের নেতাদের এ দাবী আপত্তিকর ও হাস্যকর। এখানেই ওনাদের সমস্যা। সব মানুষকে বোকা ভাবে। আমাদের সমাজে নেতাদের বা কর্তা ব্যাক্তিদের তোষামোদির যে কৃষ্টি চরমে পৌঁছেছে এটা সব সমাজে সব আমলেই ছিল। কিন্তু তা রোগে পরিণত হয়নি আগে। বর্তমানে এটাকে রোগ বলা চলবে। কথা বলার শুরুতেই অহেতুক, অপসাঙ্গিককভাবে নেতা নেত্রীদের প্রশংসা করার কারণ এ কথাগুলো নেতানেত্রীর কানে গেলে আমার পদোন্নতি আমার আবেদন নিবেদন সব নিমিষেই মঞ্জুর হয়ে যাবে। মোটেই ভুল ধারণা নয়। সুযোগ সুবিধা দিয়ে সরকারে যারা আছেন তারা তাদের কাজ করিয়ে নেন। এভাবে করে বিগত দিনগুলোতে ভুলের মধ্যেই আমাদের দিন কেটেছে। সরকারের সমালোচনা হয়তো অনেকে করেছে। তারা পাত্তা দেয়নি। সরকারে থাকলে হুশ থাকে না। তারা মনে করে তারাই ভাল দেশ চালাচ্ছেন। এমন উন্নতি দেশের আগে হয়নি। কিছু জরীপও তারা সেমিনার করে ধরিয়ে দেয়। পনের কোটি লোকের একটা দেশ। পুরো জনশক্তিকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার পরিকল্পনা করে সুনির্দিষ্ট টার্গেটে না এগোলে দেশের উন্নতি কোন দিন চোখে পড়বে না। বর্তমান সরকার জনগণের সরকার না, চালের কেজি চল্লিশ টাকা সত্যি কথা। কিন্তু জনগণের সরকারের দৌড়াত্যতো জনগণ কম দেখেনি। আমরা কি এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি না? এ পরিত্রাণ পাবার যন্ত্রটা কি রিক্সাওয়ালার ক্রিং ক্রিং বেলটা নাকি খেয়ানৌকার মাঝির বৈঠাটা, নাকি কৃষকের কীটনাশক ছিটানোর মেশিনটা, নাকি গার্মেন্টস কর্মীর সেলাই মিশনটা? এর কোনটাই না। এরা সবাই ভোটার, জনপ্রতিনিধিকে নির্বাচিত করে। যারা নির্বাচনে অংশ নেন তাদের মধ্য থেকেই ভোট দিতে হয়। আমার এদের কাউকেই পছন্দ করতে হবে। বর্তমানে যারা রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থী হন তাদের অধিকাংশ লোক টাকা ও পেশীশক্তির মানদণ্ডে মনোনয়ন পান, যিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী তারতো এ শক্তি দুটো আরও প্রখড়। কাজেই শিক্ষিত ও মানবপ্রেমী মানুষের রাজনীতিতে আসার পরিবেশ তৈরা না হলে সঠিক জনপ্রতিনিধি হচ্ছে না। এ শূন্যতাটা আজ আমাদের রাজনীতে বড় সমস্যা। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যেদিন গণতন্ত্র আসবে সেদিন সবদলেই তাদের আদর্শনুযায়ী বিভিন্ন পেশার ত্যাগী, শিক্ষিত লোকদের রাজনৈতিক দলে দেখা যাবে। আমরা জনগণরা আজ বড় অসহায়। কারণ আমরা একদিকে শিক্ষিত লোকদের দেখি দেশের সর্বনাশ করায় ব্যস্ত। দুষ্ট পলিটিশিয়ানদের তাদের সব কুকামে সহযোগিতা করে এই শিক্ষিত জনগোষ্ঠি। আবার রাজনীতিবিদের অনেকেরই জ্ঞানের অভাব। গণতন্ত্রের চর্চা দলে ও দেশে একই সাথে চলতে থাকলে ভাল ও শিক্ষিত লোকজন রাজনীতিতে আসবেন। ক্রমশঃ অন্ধকার দূর হয়ে যাবে। বর্তমান সরকার যেভাবে অতিদ্রুত দেশ ভাল করতে চাচ্ছে এতোটা সহজ কি এ কাজ? জনগণতো শত্রু না। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম এভাবে বাড়তে থাকলে লোকজনতো 'দুর্নীতিবাজ সরকারই ভালছিল-কম দামে চাল ডাল তেল খেতাম' বলবে। যে কথাটা বারবার ও

www.pathagar.com

বহুবার সূচিবাই রোগীর মত আমি বলে যাচ্ছি। মানুষের জন্য ভালবাসা থাকলে যদি কেউ জীবন দিয়ে দেবার শপথ করতে পারে যা রাজনীতিবিদরা প্রায়ই করেন তাহলে দেশের পরিচ্ছন্ন রাজনীতির জন্য আপনার একগুয়েমিপনা দূর করেন। দলের মধ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচন দেন হেরে গেলে মেনে নেন, সরে দাঁড়ান। এগুলোতো জীবন দেবারচে সহজ কাজ। কতো বুদ্ধিজীবীদের কতো বিবৃতি দেখলাম, কিন্তু বড় দুটো পার্টির মধ্যেই নির্বাচন নেই, ভোটে কেন পার্টির কেন্দ্রিয় ও স্থানীয় বডি তৈরী হয় না সেই প্রশ্ন কাউকে করতে দেখলাম না। আজব লাগে। রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করব না। যদিও প্রাসঙ্গিকভাবেই এসে যায়। শিক্ষিত লোকদের শিক্ষার প্রতিফলন ভিক্ষাপ্রদানের মাধ্যমে ফুটে ওঠে না। ভিক্ষুক একজন মানুষ। তার ক্ষুধা লাগে, পেট চো চো করে, শীতে কাপুনি ওঠে, প্রতিদিন তাকে টয়লেট করতে হয়, ঘুমাতে হয়, পরিধেয় বস্ত্র পড়তে হয়। আমার মতই তার পৃথিবীতে শিক্ষা পাবার অধিকার ছিল, অসুস্থ্য হবার পর চিকিৎসা পাবার অধিকার ছিল। দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াবার মত তারও একটা সময় আসতে পারতো। আমার মতো তারও একটা বাড়ি হতে পারতো আর চলাচলের জন্য একটা সুন্দর গাড়ি থাকতে পারতো। তার কাজকর্ম করে দেবার জন্য সব সময় দু'একজন সহকর্মী থাকতে পারতো। তার কথাবার্তা আমার মতোই সাজানো গোছানো মনোমুগ্ধকর হতে পারতো। তা কেন হল না। তার কেন একটা সাজানো বাড়ি থাকলো না। তার স্বাস্থ্য রক্ষার ও শিক্ষা নেবার অধিকার থেকে কেন সে বঞ্চিত হল এ প্রশ্নের উত্তরটা সে দিবে না। সমাজের কাছেও একজন আধুনিক শিক্ষিত মানুষ হিসেবে আপনাকেই এপ্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। পরকালেও আরও কঠিনভাবে আল্লাহর দরবারে হিসাব দিতে হবে। আপনি যদি একজন সমাজসেবক হিসেবে, একজন এনজিও কর্মকর্তা হিসেবে, একজন সরকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারী হিসেবে অথবা একজন যে কোন পেশার দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে এতোসব অসুবিধার কথা নিয়ে ভাবেন এবং কিভাবে দেশের জনগণের সকল প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা থেকে মুক্তি মিলবে এটা নিয়ে জল্পনা কল্পনা করেন তাহলেই বলব 'ইয়েস' আপনার শিক্ষা কাজে লেগেছে। আপনার শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। আপনাকে আপনার সুশিক্ষকরা যা শিখিয়েছেন তা আপনি কাজে লাগাচ্ছেন। আপনার ছোটবেলার অনুভূতি এখনো টিকে আছে। ছাত্রাবস্থার শপথ আপনি একদিনের জন্যও ভুলেননি। বন্দুবান্ধব ও কর্মীদেরকে দেখানো স্বপ্ন আপনি বাস্তবতায় রূপ দিতে বদ্ধ পরিকর। আপনাকে দেখে আশেপাশের লোক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে এজন্য যে এ দু'র্দিনেও ভাল লোক আছে। আপনার কারও প্রতি অভিযোগ নেই। আপনি বিশ্বাস করেন কাজের মাধ্যমেই সবচে ভালভাবে আমার পরিকল্পনা ও কর্মসূচীকে ফুটিয়ে তোলা যায়। শহর থেকে শহরে ও গ্রামে আপনার পদচারণা। কাজে আপনার একাগ্রতা ও কাজের গতি দেখে সবাই বিস্ময় প্রকাশ করে। আপনাকে দেখে লোকজন প্রশান্তি পায়। আপনি শিক্ষিত মানুষ। ঠকবাজ নন। অন্যদেরকে আপনার মত ভাবেন। চাহিদা, প্রয়োজন এগুলো অন্যদের আছে, থাকবেই এটা আপনি খুব ভাবে জানেন, অন্যরাও জানে। তারা সমাজের জন্য কমিটেড না,

আপনি কমিটেড। আপনার লাভ আপনি সময়গুলো ভাল কাজের মাধ্যমে পার করে দিয়ে অতীতের দিকে তাকালে আপনার সকল কষ্ট আনন্দে রূপনেবে আর সারাটা জীবন যিনি মানুষকে, সরকারকে দেশকে সর্বোপরি নিজেকে ঠকিয়েছেন তিনি একদিন টের পাবেন সকল সুখ ভোগই ছিল সাময়িক। অন্যায় ও ঠকবাজির কারণে অতীতের দিকে তাকিয়ে তার খুবই কষ্ট হবে। যন্ত্রনায় ভরে যাবে তার পরিপার্শ্ব। মনে হবে শিক্ষা নিয়ে নিজেই পশুর মতো জীবনযাপন করলাম। আমার এ শিক্ষার সমাজে দাম কী!

শিক্ষিত লোকেরাই সমাজ পরিচালনা করেন। সমাজে তারাই প্রভাবশালী। তারা যদি দায়িত্ববান, আমানতদার ও সৎ না হন তাহলে সমাজ এগোবে কিভাবে। বিজ্ঞানের চর্চা বলেন, অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি বলেন, আর বেকারত্ব দূরীকরণ বলেন যে কোন কাজে যে কোন সমস্যায় নীতি নির্ধারনে মূল কাজটা করেন শিক্ষিত মহল। দেশের সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু সংসদ। সেখানে পলিসি তৈরী হয়। সেই পরিসরের লোকজন শিক্ষিত। তারপর মন্ত্রীরা মন্ত্রনালয়ে সচিবদেরসহ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন ঐ পলিসিকে সামনে রেখে। তারা দেশের সার্বিক সমস্যা, সম্ভাবনার আলোকেই পরিকল্পনা নেন। অনেকগুলো বিষয় তারা পরিকল্পনা গ্রহণকালে বিবেচনায় রাখেন। সেক্ষেত্রে দেশীয় সবধরণের স্বার্থ সংরক্ষণ থেকে শুরু করে ধনীক শ্রেণী, গরীব শ্রেণীর স্বার্থ এমনকি দেশ ছাড়িয়ে বিদেশীদের সুবিধা অসুবিধাও নির্ভর করে এসব পরিকল্পনা গ্রহণের উপর। দেশের মাথা এই মন্ত্রী, এমপি ও সবিচদের গৃহীত সিদ্ধান্ত সারাদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। এই সিদ্ধান্ত ও কার্যকরী পদক্ষেপ জনগণের আশার আলো অথবা মৃত্যুফাঁদ। যারা এই পরিকল্পনাবিদ তারা শিক্ষিত মানুষ। তাদের সদিচ্ছা, তাদের মানসিকতা, তাদের সততা, তাদের কর্তব্যনিষ্ঠা, তাদের দেশপ্রেম নির্ণয় করবে কেমন পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন এই শিক্ষিত মহল। যাদের হৃদয়ে দেশপ্রেম, মানুষের প্রতি ভালবাসা আছে তাদের গৃহীত পরিকল্পনা আর যারা বিদেশী হাতে খাবার খান, কথায় কথায় পাশ্চাত্যের উদাহরণ টানেন, বিদেশী সংস্কৃতি প্রেমী তাদের গৃহীত পরিকল্পনা ও কার্যসম্পাদনতো কখনো এক হবে না। দেশপ্রেম এসব ক্ষেত্রে সবচে মূল্যবান বস্তু। কারণ অনেক চুক্তি করতে হয় বিদেশীদের সাথে, অনেক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয় যেখানে বিশ্বসংস্থাগুলোর অন্তর্ভূক্তি থাকে। অতএব এসবক্ষেত্রে দেশীয় স্বার্থ রক্ষা খুবই জরুরী যা আমাদের এই শিক্ষিত মহল নানান কারণে নানান অজুহাতে বারবার রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। মন্ত্রনালয়ের কর্তা ব্যক্তিদের অনেকেই শিক্ষিত হবার পর উচ্চ শিক্ষিত হয়েছেন। পিএইচডি করেছেন বিদেশে, বহুবার বিদেশে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। বিদেশের হাজার ভাল জিনিসের কয়টা তার ব্যক্তি জীবনে, প্রতিষ্ঠানে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে বিভিন্ন পলিসিতে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন এ প্রশ্নটা তারা নিজেরাই করে দেখতে পারেন। কোনদিন কি জাতির সামনে উপস্থাপন করে দেখিয়েছেন পাশ্চাত্যে সরকারী কর্মকর্তা আর কর্মচারীদের ব্যবধানটা শুধু কাজের মাধ্যমেই ধরা পড়ে। না পোষাকে, না কথাবার্তা চালচলনে, না বসিংএ তাদের কর্মকর্তা কর্মচারী ছাপ থাকে।

www.pathagar.com

টেকনলজিক্যাল কোন জ্ঞানের ব্যাপ্তি কি আমাদের তেমন দৃষ্টি কাড়ে, এতোশত বার গেলেন দুর্নীতির বিস্তাররোধ কিভাবে করা যাবে বুঝতে পারলেন না। হ্যাঁ যাবে, তা নিজে দুর্নীতি না করে, নিজে সরকারী আমানতের খেয়ানত না করে আর দায়িত্বশীলতার ছাপ রেখে দুর্নীতি রোধের কাজটা বুঝনো যাবে। এটা অনেক কষ্টের। এ কষ্টের কাজটা আপনাকেই করতে হবে কারণ জনগণের পয়সায় আপনি দেশে পড়েছেন, বিদেশে উচ্চ শিক্ষা নিয়েছেন। তাহলে আপনার কি এদেশটার জন্য, জনগণের জন্য কোন কিছু করার নেই? আপনার দায়িত্ব কি শুধু অফিস সময়টা অফিসে কাটানো? এতো অল্প সংখ্যক শিক্ষিত লোকদের মধ্যে আবার আপনার মত উচ্চ শিক্ষিত ও সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ক'জন আছেন? এ কারনেই জাতি আপনার দিকে তাকিয়ে। কারণ মন্ত্রীরা আজ আছেন, কাল নেই অথচ আপনার থাকাটা নিশ্চিত। কোনভাবেই আমরা শিক্ষিত মহল আমাদের দায়িত্ব এড়াতে পারি না। মানুষকে ভালবাসতে শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। তবে শিক্ষা থাকলে ভালবাসা উপস্থাপনে আপনার প্রযুক্তির উপকরণগুলো ব্যবহার সহজ হয়। আমরা এমন শিক্ষা কেন নেব যা আমাদেরকে সভ্যতা প্রচারে উৎসাহিত না করে বর্বরতার দিকে টানবে, পাশবিক জীবন যাপনে অভ্যস্থ করে তুলবে। আশ্চর্যের বিষয় সারাদিন যাদের মুখে ভালবাসার গীত শোনা যায়, শ্রমিক শ্রেণীর জন্য যাদের এককালে অনেক দরদ উথলে উঠতো আজ কর্মজীবনে শিল্পপতি হিসেবে তারাই কর্মচারীর বেতন ঠিকমত পরিশোধ করেন না। শিক্ষা আমাদের কি দ্বান্দিক হতে শেখায়? কিসের অভাব আমাদের মত শিক্ষিত লোকের? তাহলে সকাল থেকে বিকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত, ঘর থেকে অফিস, অফিস থেকে অন্যঅফিস সর্বত্র আমরা মানুষদের ঠকাচ্ছি, প্রতারিত করছি। কথার ফুলঝুড়ি দিয়ে কি আর মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন হয়। আশা প্রত্যাশাতো অন্য লোকদের প্রতিশ্রুতি। শিক্ষিত মানুষরা এদেশের সাধারণ মানুষদের অসহায়ত্বের কথা জানেন, এদের ঠকানো উচিৎ না। দেশের আপামর জনগণ গ্রামে গেলে আমাদের কাছে বিভিন্ন মন্তব্য জানতে চায়। তাদের ধারণা আমাদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা বেশ পুরানো। আমাদের কমেন্ট অতি ধারালো। তাই আমাদের শিক্ষিত মানুষের মন্তব্যকে তারা গুরুত্ব দেয়। ভোটটা সেভাবেই দেয়। শিক্ষিত মানুষদের একটা মন্তব্য বা পরামর্শ অনেক শক্তিশালী। সরাসরি ও অসরাসরি দুই ভাবেই মানুষের মতামতকে এ জাতীয় লোকেরা প্রভাবান্বিত করে। একটা সংসারে যখন বাবা মা তাদের ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হন, সন্তানদের পড়াশোনাসহ অন্যান্য কাজে বেখেয়াল থাকেন তখন সে সংসারে সুখ আসবে না, ঝামেলা লেগেই থাকবে। বাবা মা যদি পারস্পরিক বিবাদে সারাক্ষণ নিয়োজিত থাকেন সন্তানদের ভালমন্দ, সুন্দরভাবে সামাজিক দায়িত্বশীলতার সাথে বেড়ে ওঠার বিষয়কে আদৌ পাত্তা না দেন খুব স্বাভাবিকভাবেই এ সংসারের সন্তানদের সুস্থভাবে বেড়ে ওঠা হবে না। বাবা মার সচেতনতার অভাবে, উদাসীনতার কারনে, তাদের দায়িত্বহীনতার জন্য একটা সংসারের ছেলেমেয়েদের সুস্থভাবে বেড়ে ওঠা যেমন ব্যহত হয়, কখনো মানসিকভাবে তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্থ হিসেবেও ধরা পড়ে। তদ্রুপ একটা জাতির শিক্ষিত

মহলটা যাদের হাতে নেতৃত্ব, যারা সমাজকে পরিচালনা করেন, যাদের চিন্তা চেতনার উপর নির্ভর করে জাতির উন্নতি-অবনতি, দেশের মানুষের ভাল-মন্দ, তাদের কল্যাণ-অকল্যাণ তাদের সঠিক ভূমিকা রাখার বিকল্প কি! তাদের স্বার্থপর, উদাসীন ও দায়িত্বহীন হবার সুযোগ কই। এই শিক্ষিত লোকরাইতো বিভিন্ন নীতিকথা পড়ে ও পড়িয়ে এ পর্যন্ত এসেছেন। তারা তাদের ফেলে আসা দিনগুলোতে বক্তৃতায়, ভাষণে, গোলটেবিল বৈঠক, টকশোতে, ছাত্রদের ক্লাসে, অধীনস্থদের মটিভেশন ক্লাসে, সৈনিকদের দরবারে কত ধরণের উপদেশ দিয়েছেন। কর্তব্যনিষ্ঠার কথা বলেছেন, শৃঙ্খলার কথা বলেছেন, সহমর্মিতার কথা বলেছেন, আনুগত্যতার কথা বলেছেন, মানব প্রেমের কথা বলেছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যারা পাঠ দেন তারাতো এসব মৌলিক এক একটা বিষয়ে অনেকগুলো লেকচার দেন। আর জাতীয় দিবসগুলোতে আমাদের পত্রিকার পাতায় সব লেখকদের লেখায়ই দেশপ্রেম, মানবপ্রেমের প্রসঙ্গটা উঠে আসে। স্বাধীনতার পর পর এসব লেখা যুবসমাজকে, তরুণদের যেভাবে আকৃষ্ট করতো সময়ের ব্যবধানে আজ আর তেমনি আকৃষ্ট করে না, কারণ এই লেখকদের অনেকেরই ব্যবহারিক জীবনে দেশপ্রেম নেই। ন্যূনতম কমিটমেন্ট দেশের জন্য নেই। তারা অনেকেই বুঝে না বুঝে হোক অন্য দেশের সেবা করেন। মানবপ্রেমের বিন্দুমাত্র তাদের চরিত্রে নেই। কাছাকাছি অবস্থান করে এসব দ্বান্দ্বিক স্বভাব ধরা পড়েছে। তাই লেখা আর বক্তৃতা অনেক সময় কাজ করে না। এ শিক্ষিত মহলের লোকরা, যাদেরকে সমাজ গুরু মানেন যদি তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন না করে মুনাফেকী করেন তাহলে দেশের মুক্তির উপায় কি? তারা জাতির অভিভাবক। অথচ অভিভাবক সুলভ কোন আচরন তাদের কাছ থেকে না পাওয়া গেলে মানুষতো হতাশ হবেই। এই হতাশাটাই আজ সর্বত্র বিরাজমান।

মানুষ ভেবেছিল গণতান্ত্রিক সরকার ব্যর্থ। গুণ্ডাপাণ্ডারা সংসদে বসে হাসি মশকারা খেল তামাশা করে বলে দেশ রসাতলে গিয়েছে। আর তাই ওয়ান ইলেভেনের পর কিছু পত্র পত্রিকার সুবাদে আমরা বিগত পনের বছরের গণতন্ত্রের চরম ব্যর্থতা খেয়াল করলাম। বর্তমান সরকারের জয়গানে চারদিকে আনন্দ উল্লাস বইতে লাগলো। তারাই আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের তুচ্ছ ঘটনাকে বাতাস দিয়ে ছাত্রশিক্ষকদের বিপরীতে সেনাবাহিনীকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আসলে কি গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিল? মোটেই না, পনের বছরে আমাদের অর্জন অশানুরূপ না হতে পারে কিন্তু মৌলিক কিছু বিষয় অর্জিত হয়েছে। এই পনের বছরে আর কিছু না হোক মত প্রকাশের স্বাধীনতাতো মানুষ পেয়েছিল। সাংবাদিক পেটালেও পত্রিকায় আসতো, বিচারের মুখোমুখি হতে হতো, আবার প্রধানমন্ত্রীকেও মানুষ ন্যায্য কথা বলতে ছাড়তো না। ভবন যেমনই হোক সবটার ব্যাপারেই ছাত্র জনতা সোচ্চার ছিল। গণতন্ত্র কি দিয়েছে আর বর্তমান জরুরী অবস্থার তত্ত্বধায়ক সরকার কি দিচ্ছে এসব হিসাব করার দায়িত্ব এদেশের জনগণের, শিক্ষিত মহলের। চটকরেই এ ভাল ও খারাপ টাইপের কথা বলার মত

www.pathagar.com

কোন কারণ নেই। যা হবার ছিল তাই হয়েছে। এটা মানুষ তৈরী করলেও একটা প্রাকৃতিক ছাপ আছে এখানে। কারণ গণতান্ত্রিক সমাজে জনপ্রতিনিধিদের চক্ষুলজ্জা থাকে। চক্ষুলজ্জা রাখতে হয় একারণে যে কয়েকদিন পর সে আবার ঐ মানুষগুলোর মুখোমুখি হবে ভোটের জন্য। এ লজ্জাটা বোধ করি নানান কারণে আমাদের রাজনীতিবিদদের একটা বিশেষ অংশের লোপ পেয়েছে। আমাদের দেশের বর্তমান সময়টা দেশের সাধারণ মানুষের অর্জন নয়। রাজনীতিবিদ ও শিক্ষিত পেশাজীবি মহলের অর্জন। স্ব-স্ব মহলে তারা তাদের চরম দায়িত্বহীনতার পরচিয় দিয়েছেন । জনগণের ভোগান্তি হয়েছে। চাঁদাবাজী ও সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে মানুষ। এখন চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাস অনেক কম। জরুরী অবস্থা চলে গিয়ে যে কোন নির্বাচিত সরকার এলেই আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে দেশ। বেশি সন্ত্রাস, বেশি খুন খারাবি হবে। দু'বছরের না পাওয়ার বেদনা পুষিয়ে নেবে তখন সকলে। লুকিয়ে থাকা কালোছায়া আত্মপ্রকাশ করবে। তাদের জাতভাইরা তাদেরকে স্বাগতম জানাবে। জরুরী অবস্থা জারীর মাধ্যমে বর্তমান সরকার যতটুকু সফলতা আশা করেছিল তা হয়নি। লাঠি দিয়ে এভাবে স্বভাব ঠিক করা যাবে না। শিক্ষিত মানুষরা যখন ছাত্রদের উসকে দেয় জ্বালাও পোড়াও ও গাড়ি বাড়ি ভাংচুরের জন্য তখন শিক্ষা অশিক্ষা ও কুশিক্ষা সব এক হয়ে যায়। এমন শিক্ষা নিয়ে আমাদের হবে কি? কোন মহৎ উদ্দেশ্যে শিক্ষিত লোকজন সেদিন ঐ কাজগুলো করেছিলেন। সেনাবাহিনীর পোষাক, পুলিশের পোষাক পড়লেই কি তারা আমাদের শত্রু হয়ে যাবে? এরা কি ভারতীয় সেনা, না পাকিস্তানী হানাদার। আপনারা শুধু শিক্ষিতই নন। উচ্চশিক্ষিত যাদের কাছ থেকে আগামীদিনের সমাজ পরিচালকরা শিক্ষা নিচ্ছে। আপনাদেরকে অবশ্যই একটা নিরপেক্ষ ভুমিকা পালন করতে হবে। এতোদূর মহানুভবতা, উদারতা ও সংযম প্রদর্শন করতে হবে যা জাতি শুধু দেখবেই না অনুসরণ করবে। আমাদের এই একসমস্যা কারও কোন সমালোচনা করলে সে তা হজম করতে পারে না। অথচ নিজেকে গণতন্ত্রীমনা বলে দাবী করে সবাই। যার সমালোচনা হবে তার শত্রু বলবে হা, ঠিক বলেছেন। আসলে পরসমালোচনারই প্রয়োজন হয় না যদি বিবেক থাকে, যদি কেউ আত্মসমালোচনা করতে জানে তাহলে নিজের সব ত্রুটিবিচ্যুতি ধরা পড়বে। শোধরাবেন কি-না তা আপনার ব্যাপার। প্রসঙ্গক্রমে বলতেই হয় বর্তমান সরকারের অর্জনগুলো মিলিয়ে যেত না যদি তারা শুধু নির্বাচনকে টার্গেট রেখে কাজ করতো। তাহলে ২০০৮ এর ফেব্রুয়ারী মার্চেই নির্বাচন হয়ে যেত। পরবর্তী সরকার অবশ্যই গণতন্ত্রের বেশ কিছু ফর্মুলা অনুসরন করতো। ক্রমশঃ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠানিক রূপ নিতো। গণতন্ত্র শোকেচে রাখার জিনিস নয়। এটার যথেষ্ট চর্চা চাই। সেই সুযোগটাতো থাকতে হবে। বার বার জণগনের কাছে যেতে হবে। তারা তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করবেন। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা দেশ চালাবেন। গণতান্ত্রিক পরিবেশ যারা নষ্ট করেছেন ইচ্ছাকৃতভাবে তারা সকলেই এজন্য দায়ী থাকবেন। নির্বাচন দেশে হবে এবং গণতন্ত্রও আসবে তবে তার রূপরেখা কেমন হবে সেটাই প্রশ্ন।

www.pathagar.com

আমরা যে যে উদ্দেশ্যেই কাজ করি না কেন আমি যদি নিজেকে ভালবাসি, আমার দেশকে ভালবাসি, আমার দেশের মানুষকে ভালবাসি সুখ আমাদের আসবেই। আমি সমাজে সুখের জন্য বিতর্কিত হয়ে চেয়ারে থাকব না, সরে যাব। আমার উপস্থিতিতে অশান্তি, বিবাদ। আমি তাই অনুপস্থিত হয়ে যাব। আমি যাদেরকে ভালবাসব তাদের জন্য আমি সব করতে প্রস্তুত যেহেতু কোন লৌকিক প্রাপ্তির জন্য আমি কাজ করছি না। ভালবাসা শুধুই ভালবাসা। মানুষের জন্য ভালবাসা। আমার কাজের কেন্দ্রবিন্দু যদি মানবকল্যাণ হয় তাহলে সে কারনে আমি মতের ত্যাগ, পদের ত্যাগ, ভোগ বিলাস ত্যাগ সব করতে পারব। মোটেই পিছপা হব না। আমি শিক্ষিত হয়েছি বিভাজনের জন্য নয়, সংযোজনের জন্য। সংগঠিত করার জন্য। আমি শিক্ষিত হয়েছি শিক্ষা বিস্তারের জন্য, অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়ানোর তাগিদে- তাদেরকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার জন্য নয়। আমার শিক্ষা আমার চাহিদাকে সীমিত করবে, অন্যদের জন্য আমার হৃদয়ে কঠিন দায়িত্বানুভূতির সৃষ্টি করবে, ক্ষুধাপীড়িত মানুষদের জন্য মনের মধ্যে প্রচণ্ড ভালবাসা ও মায়ার টান সৃষ্টি করবে। আমার শিক্ষা আমাকে এতোটাই আলোকিত করবে সে আলোয় শত্রু বন্ধু হয়ে যাবে। যে আমাকে ভুল বুঝেছিল সে আমার অব্যাহত প্রচেষ্টায় সন্তুষ্ট হয়ে যাবে, সে বুঝতে পারবে এখানে 'মানুষ' বিবেচনাটাই প্রধান। বিন্দুমাত্র ব্যক্তিস্বার্থ এখানে কাজ করেনি। মানুষকে প্রাধান্য দিলে ধর্মীয় বিভেদ মিটে যাবে, দলীয় হেসাহেসী থাকবে না, থাকতে পারে না। মানুষের দুর্দিনে সকলে একত্রে কাছে চলে আসবে। আমি এজন্যই শিক্ষা নিয়েছি। আমার শিক্ষা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস লালনের জন্য নেইনি। কাউকে কথা বলতে দেব না আর মুখে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখার আহ্বানের শিক্ষা আমাকে কুশিক্ষিত করেছে। এ শিক্ষা আমার ভূষণ নয়। এ কুশিক্ষার আবরণ আমি তুলে ফেলব।

আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক, আমাদের ঐক্য প্রয়োজন। মানুষের ভালবাসায় আমরা ঐক্যবদ্ধ হব। হ্যাঁ, সবাই মানুষকে ভালবাসে আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু ভালবাসতে গেলে বিভিন্ন ধরণের ত্যাগ করতে হয়। এই ত্যাগ স্বীকারে আমরা অনভ্যস্থ। বহু ধরণের ত্যাগ। গ্রাম্য অশিক্ষিত কৃষকের চে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে পড়ুয়া ছাত্র আমি বেশী ত্যাগ করব।

আগেই বলেছি যে মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা জন্মগতভাবেই থাকে। এটা কারও কম কারও বেশি। পারিপার্শ্বিক অবস্থা এ বাড়া কমার ব্যাপারে নিঃসন্দেহে ভূমিকা রাখে। ক্ষেত্র বিশেষে আবার বাড়তি কমতি হয়। সকল সন্তানের জন্য সমান ভালবাসা বলে বাবা মা দাবী করলেও অথবা বাচ্চারা বাবা মা উভয়ে সমান আদর করে বলে প্রচার করলেও আসলে এখানেও কম বেশি আছে। যেহেতু ভালবাসাকে ঐভাবে ওজন করা যায় না, মাপা যায় না তাই বুঝাটাও কষ্টকর। সন্তান হিসেবে জেনেটিক টানটা হয়তো সকল সন্তানের জন্য সমান কারণ ঐ ক্রোমোজমাল ডিএনএ

www.pathagar.com

ইনহেরিট্যান্স সকলের জন্য একই রকম অথবা প্রায় কাছাকাছি। বাবা হিসেবে ' X 'অথবা 'Y' ক্রোমোজম এবং মা হিসেবে 'X' ক্রোমোজম এর জন্য ওদের প্রতি ভালবাসা, স্নেহ মমতা একইরকম। কিন্তু যে ছেলেটা সকালে স্কুলে যাবার নাম করে বন্ধুর সাথে ঢাকা থেকে কুমিল্লা বেড়াতে যায়, কথা শোনে না, স্কুল থেকে বাজে রিপোর্ট আসে, আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রাখে না আর মুখে মুখে কথা বলে সেই ছেলের ব্রেন যতো ভালই হোক আর নানা নানীর কাছে যতোই সুবোধ হোক বাবার কাছে এই ছেলে আর শৃঙ্খল মেনে চলা সুভাষী স্কুলের মেধাবী ছেলে একরকম নয় মোটেই। দুই ছেলের প্রতি দুই ধরণের ভালবাসার জন্ম নেয়। দু'ধরণের টান আর আত্মিক সম্পর্কের সূচনা হয়। বাইরের জগতের লোকদের সাথেও আমাদের সম্পর্কটা এমনই। সেখানে রক্তের কোন সম্পর্ক না থাকলেও সামাজিক কারণে তাদের প্রতি মায়া, মমতা ভালবাসা জন্মায়। আর এই লোকদের সাথে আমার সম্পর্ক, আমার ভাললাগার সাথে তার রুচির মিল অমিলের উপর নির্ভর করে আমার উপর তার ভালবসার সরূপ কেমন হবে। একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর অনেকগুলো বিষয়ের উপর এটা নির্ভরশীল। 'গিভ এণ্ড টেকের' সস্তা কথাটা আমরা এসবক্ষেত্রে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে চাই। মানুষকে ভালবাসার বিনিময়ে কোন 'টেক' নেই, আছে মানসিক প্রশান্তি। সেটা অবশ্যই বড় একটা পাওনা। এ পাওয়াটা তৃতীয় সোর্স থেকে আসে। 'গিভ এণ্ড টেক' বলতে প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষের সরাসরি ও অনেকাংশে নিষ্ঠুর নির্মম দেনা পাওনাকে বুঝায়। সন্তানের ও পিতামাতার ভালবাসার ক্ষেত্রেও আংশিক 'গিভ এণ্ড টেক' কখনো সখনো চলে আসে। অধিকাংশই হচ্ছে ন্যাচারাল। কাজেই সত্যিকারের ভালবাসাটা হবে একদমই ব্যক্তির ভেতরগত জিনিস। এটা নিখাদ পাইতে চাইলে তা কোন মূল্যমানের বিচারে পাওয়া যাবে না। আত্মিক প্রশান্তির জন্য যারা মানুষের পেছনে ঘুরে তারা শান্তি একদিন পাবেই। শান্তির আর সুখের পেছনে ঘুরে লাভ নেই। আপন কর্তব্য দায়িত্বশীলতার সাথে পালন করলে সুখ পেছনে পেছনে ঘুরবে। আমরা প্রায়শঃই মানুষের সুখ নিয়ে ভাবি, সমাজের উন্নতি নিয়ে কথা বলি। অথচ মৌলিক কতগুলো বিষয়কে এড়িয়ে চলি। এ মৌলিক উপাদানগুলোকে পাশ কাটিয়ে কোন দেশ বা জাতির উন্নতি অসম্ভব। মৌলিক এ বিষয়সমূহ নিয়ে আমাদের সমাজবিদ, চিন্তাশীল সুনাগরিকরা কথা বলেছেন, বলছেন এবং তাদের বক্তৃতায় বা লেখনীতে এ প্রসঙ্গগুলো সর্বদাই বর্তমান। এ তাদের অনুভবের কথা। তাদের শিক্ষা দীক্ষা অভিজ্ঞতা ও নিজস্ব অনুভূতি তাকে একথাগুলো প্রকাশ করতে বাধ্য করছে। যতোদিন এসব বিষয়াদি আমাদের সরকার পরিচালকদের আমলে না আসবে, আমাদের রাজনীতিবিদরা এ মৌলিক বিষয়গুলোকে পুঁজি করে ভোট না চাইবেন, মুখে আওরাবেন এক আর ক্ষমতায় গেলে, চেয়ারে বসলে বিপরীত কাজ করবেন, যতোদিন আমাদের জনগণ স্মৃতিবিস্মৃত হয়ে খুব দ্রুতই কয়েকদিনের আগের কথাও ভুলে যাবেন, একটা বিড়ি ও এক বাটি মুড়ির বিনিময়ে ভোট দেবেন, ভাল মন্দ বুঝতে চাইবেন না, আর বুঝলেও সামান্য নিজ স্বার্থকে বড় করে দেখে ফুফুতো চোর ভাইকে ভোট দেবেন যোগ্য ও ভাল

www.pathagar.com

মানুষকে ভোট দেবেন না- ততোদিন দেশের কল্যাণ হবে না, জনগণ উপকৃত হবে না কোন সরকার দিয়েই। জাতীয় স্বার্থে মৌলিক বিষয়গুলোতে সব দলগুলোর ঐক্যবদ্ধ হওয়া জরুরী। রাজনৈতিক দলগুলো জাতীয় স্বার্থকে মাথায় রেখে ঐক্যবদ্ধ হলে জনগণের মধ্যে ফূর্তির জোয়ার বইয়ে যাবে। জাতীয় ঐক্য সম্পর্কে শুধু এটুকু বলতে পারি বড় দলগুলো যদি একটেবিলে আলোচনায় বসে, মন খুলে দেশ ও জনগণের স্বার্থে কথা বলে,এক বেলা এক সাথে খায়- এ জাতি যেন পুনর্বার স্বাধীনতা ফিরে পাবে। আমাদের ঐক্যবিনষ্ট করে এক অদৃশ্য শক্তি ফায়দা লুটছে রাজনীতিবিদরা আগে না বুঝলেও এখন বুঝছেন অথচ এখনো ইগোতে ভুগছেন। ইগোর কি-আছে এখানে? আপনারা জনগণের জন্য কমিটেড। তাদের জন্য যেটা ভাল সেটা আপনার সামনে স্পষ্ট হবার সাথে সাথেই পিছনেরটা মুছে ভুল স্বীকার করে দৃশ্যমান সত্যটাকে গ্রহণ করাইতো বুদ্ধিমান মানুষের কাজ। ঐক্যের পর হচ্ছে জাতির জন্য বাস্তব সম্মত আধুনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। বয়স্কদের জন্য নতুন আঙ্গিকে টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণগুলো প্রদান করার ব্যবস্থা করা। কিশোর তরুনদের জন্য নৈতিক মূল্যবোধ সম্মলিত পুস্তিকা পাঠ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। তৃতীয় মৌলিক ব্যাপার হচ্ছে গণতন্ত্রকে পরিবার, সমাজ, দল ও রাষ্ট্রে সর্বত্র এবং সর্বদা চর্চা করার অভ্যাস করা। এটা গীতের বিষয় নয় যে সুর করে গাইতে হবে। চর্চা করতে হবে নিখুত চর্চা। এজন্য ধৈর্য্য ও সহনশীলতা জরুরী। একটা বিষয় জানা, তা বলা ও করা এক কথা নয়। গণতন্ত্র চর্চার কথা অনেকেই জানেন, সবাই গণতন্ত্রের কথা বলেন কিন্তু এর চর্চা করেন ক'জন। প্রকাশ পেয়ে গেল যে আমাদের দেশের দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা নেই। একদমই নেই। দলগুলো নিজেদের গণতন্ত্রের পুঁজারী বলে দাবী করে। কত বড় মিথ্যাচার এটা। কিভাবে দেশ এগোবে। এতো বড় অসত্যকে পিঠে করে বয়ে নিয়ে কি মরুভূমি পার হওয়া যায়? জনগণকে কি ধোকাটাই না দিচ্ছে আমাদের রাজনীতিবিদরা। আবার জনগণের ভোটের কথা বলবে কিন্তু জনগণের রায়ের উপর নির্ভর না করে ভোটকেন্দ্র দখল করা ও জালভোট দেবার মাধ্যমে সব নিশ্চিত হতে চায়। এ মানসিকতা পরিহার করা অতি জরুরী।

এ মৌলিক বিষয়গুলো ছাড়াও অনেক বিষয় আছে যা আলোচনার দাবী রাখে। আমার ধারণা ও বিশ্বাস একজন মানুষ যে সমাজেরই হোক না কেন স্বদেশ রেখে বিদেশে গেলেও তার মানবীয় গুনাবলীগুলো সে সেখানে প্রকাশ করে, আটকে রাখে না। কবে দেশে ফিরবে আর সে জাতীয়তাবাদী সৈনিক বলে তার সব মানবীয় গুনাবলী নিজ দেশেই প্রকাশ করবে এটা হয় না। ঐ ভ্রমনরত দেশে কোন সামাজিক সমস্যা হলে এবং সেখানে তার ভূমিকা রাখার সুযোগ থাকলে অবশ্যই বিকশিত হবে তার মানবীয় গুনাবলী। এটা ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত হতে পারে। অতএব মানবীয় গুনাবলী সমূহ মূলতঃ প্রয়োজনেই প্রকাশ পায়। যারা সমাজসেবী, পরোপকারী তারা সময় সুযোগ পেলেই একাজে অংশ নেয় কি স্বদেশ কি বিদেশে। তাদের কাছে

www.pathagar.com

মানুষ বলে কথা। তারা এখানে রাজনীতি খোঁজে না, ধর্ম দেখে না, বংশ গোত্রের তোয়াক্কা করে না। তাদের বিবেচনায় মানুষ হওয়াটাই যোগ্যতার মাপকাঠি। উল্লেখ্য তিনটি মৌলিক বিষয় আমার মাথায় সর্ব সময় ঘুরপাক খাচ্ছে বলে আমি উল্লেখ করলাম। এ ছাড়াও অনেক মৌলিক বিষয়ের অন্যতম হচ্ছে বেকারত্ব দূরীকরণ ও জনসংখ্যাকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করা, পরিবার পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন। এতোসব মৌলিক সমস্যার সমাধান কখন হবে তা ভেবে ভেবে আমরা সবাই অস্থির। আমাদের সবচে বড় মৌলিক গুনটার অভাবের কারণে সমস্যা আমাদের ছাড়ছে না আরও বেড়ে যাচ্ছে। এ সমস্যাটা শুধু আমাদের নয় অন্য সমাজেও প্রকট। তারা অর্থনৈতিকভাবে একটা সুদৃঢ় অবস্থানে দাঁড়িয়ে গেছে বলে, দেশে একটা রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি প্রবর্তণ করতে সক্ষম হয়েছে বলে বেশ চলছে। মানবীয় গুনাবলীর অভাব ঐসব পাশ্চাত্য দেশকেও অক্টোপাসের মতো আটকে ধরেছে। মনুষত্ব সেখানে অতি দ্রুত লোপ পাচ্ছে বলেই তারা শান্তি নয় যুদ্ধকে স্বাগতম জানাচ্ছে। যুদ্ধবাজ প্রেসিডেন্টকে আমেরিকায় দ্বিতীয়বার নির্বাচিত করে পুরস্কৃত করেছে। খুব ভালভাবে ভেবে দেখার বিষয় এটি। আজ আমাদের ক্ষুধা ও শিক্ষার সমস্যা যতোটা প্রকট তাদের তা নয়। আমাদের প্রয়োজনেই আমাদেরকে এসব সমস্যার মূল্যোৎপাটন করতে হবে। যেজন্য প্রথমেই প্রয়োজন অন্য মানুষদেরকে স্বীকৃতি দেয়া যে তারাও মানুষ। সব মানুষকে এক মানুষ হিসেবে ভাবতে হবে। বিভিন্ন উপজাতীয় বাসীন্দা যারা পশ্চাদপৎ জীবন যাপন করেন তাদের জীবনযাত্রার মান বাড়ানো তাদের সামাজিক সুযোগ সুবিধা বাড়িয়ে দেয়া এবং সর্বোপরি তারা এদেশের আর দশজন মানুষের মতোই এমন অনুভূতি সাধারণ জনগণের মধ্যে ফুটিয়ে তোলা প্রয়োজন। আমাদের দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আশ পাশের যে কোন দেশের চে সুন্দর। তবে এটা বাড়ানোর আরও সুযোগ আছে। এর সাথে যারা সমাজে সুখ বিনষ্টের কাজে নিয়োজিত, বিভিন্ন ধরণের উস্কানীমূলক কথা বলেন ও ভাংগণের বীজ বুনেন তাদেরকে এমন কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে।

আপনি যদি আপামর মানুষের কল্যাণই চান তাহলে আপনার কর্মকাণ্ডে তার ছাপ থাকতে হবে। সাধারণ মানুষ যেন টের পায় অমুক আমার সত্যিকার বন্ধু, সে আমাকে ভালবাসে। একদিন দু'দিন আপনি মানুষকে বোকা বানিয়ে রাখতে পারবেন, বহুদিন নয়। তাই যারা দাবী করেন যে তারা মানুষকে ভালবাসেন, মানুষের কল্যাণের জন্য রাজনীতি করেন তারা প্রমাণ করেন যে আপনাদের এসব বাণী সত্যি। সূর্য উঠলে সবাই টের পায়। আপনার দাবীর পক্ষে কয়টা উদাহরণ দিতে পারবেন- দেন। আপনার আচরণ কি প্রমাণ করে আপনি একজন অমায়িক মানুষ, আপনার ব্যবসার ধরণ ও এর সম্পৃক্ততা কি সাধারণ মানুষ জানলে পুলকিত হবে না আতংকিত হবে, আপনার পারিবারিক জীবনের গল্প শুনলে কি নেতা হিসেবে তারা এ জীবন অনুসরণ করবে না ঘৃনায় বর্জন করবে? এসব প্রশ্ন কি আপনি তুলেছেন কখনো নিজের কাছে?

www.pathagar.com

আমি মানুষের কাছে কতটা পছন্দের এজন্য সব সময় নির্বাচনে যেমন অংশগ্রহণের প্রয়োজন নেই তদ্রুপ কাউকে জিজ্ঞাসা ও করতে হবে না। আমাকে প্রশ্ন করলেই হবে আমার সারাদিনের কর্মকাণ্ডে আমি কতোটা সন্তুষ্ট। আমাকে কি আমি পছন্দ করি? আমার আমিত্বে কি আমি লাভবান? আমাকে আমার মত আর কে চেনে? আমি যাকে চিনি সেই আসল আমি। আর অন্যরা যা চেনে, সেটা মোটেই আমাকে চেনা না। সেখানে আমার উপস্থিতি আংশিক, খণ্ডিত। আমার বাইরে যারা আমাকে চেনেন তারা হয় কম অথবা অতিরিঞ্জিত করে আমাকে বুঝেন। তাদের কাছে আমি সারাদিনও যদি উপস্থিত থাকি তারপরও কি তারা আমাকে পুরোটা চিনতে পারবেন? আমার মনের জগতের সবটা কি বাইরে প্রকাশ পায়? আমি কি মনোজগতের সবকথা বলে বেড়াই। আমি কি চিন্তার জগতের সবকিছু আচরণে প্রকাশ করি? আমার নিজের অনিচ্ছায় যে চিন্তাগুলো উড়ে উড়ে ভীমরুলের মতো আসে সেগুলোর কথা না বললে কি কারও বুঝার উপায় আছে? তাহলে দাঁড়াচ্ছে কি আমাকে পরিপূর্ণরূপে অন্যমানুষের পক্ষে চেনা একদমই অসম্ভব। আমি আমাকেও সম্পূর্ণ চিনি না কারণ আমার সচেতন মনের খবরগুলো আমি রাখি। অবচেতন মনে যে খেলা চলে, অহরহ যে তরঙ্গ বয়ে যায় মন নদীতে তা আমার খুব কমই জানা। এ অজানা জগতের কিছু অংশ বিভিন্ন ভাবে রাতে স্বপ্নে ধরা দেয়। বলা হয় স্বপ্নে আমরা যা দেখি তার অধিকাংশটুকু মনে থাকে না। যতটুকু স্মরণ করতে পারি সেটুকু আমাদের অবচেতন মনের চাওয়া পাওয়ার প্রতিফলন অথবা সচেতন মনের না পাওয়া বিষয়গুলো। কাজেই আমরা যেমন আমাদের অনেক কাজকে নিয়ন্ত্রণ করি না তদ্রুপ আমরা আমাদের নিজেদেরকেও সম্পূর্ণভাবে চিনি না। সেক্ষেত্রে আমাকে অন্য লোকজন আর কতটুকু চেনে। আমি যদি আমাকে মানুষের সামনে খোলাখুলিভাবে উপস্থাপন করি তাহলে তারা আমাকে তাদের যোগ্যতা দিয়ে যাচাই বাছাই করে নিতে পারবে বাস্তবিক যতোটা সম্ভব। আমাকে যদি গুটিয়ে রাখি, সম্পূর্ণ প্রকাশ না করি বা আমি যা না সেটা বলে বেড়াই অর্থাৎ প্রতারণার আশ্রয় নেই তাহলেতো লোকজন আমাকে চিনতে পারবে না, ভুল করবে। অন্যলোককে আমার মত দেখে ভুল চিহ্নিত করবে। এভাবে প্রতারিত ও বিভ্রান্ত হয়ে সে ভুল সিদ্ধান্ত নেবে।

আমি যদি দেশ প্রেমিক সত্যের পুজারী মানুষটি হই তাহলে কোন ছলচাতুরীর প্রশ্রয় না নিয়ে আমাকে জনসম্মুখে উপস্থাপন করা উচিত। তদ্রুপ অন্যদেরকে আহ্বান করা যায়। তখন মানুষের প্রতি ভালবাসা, দায়বদ্ধতা সব ফুটে উঠবে। শুধু দাবী করে বেড়াবার জিনিস এটা নয়। আমার কথা আর লেখনীতে, ভাষণ আর কর্মীদের মুখে, নির্বাচনী ইসতেহার আর পোষ্টারেই শুধু নয় ব্যবহারিক জীবনে ফুটিয়ে তুলতে হবে মানুষের প্রতি ভালবাসার স্বরূপ কেমন। এর কি রঙ। ভালবাসার রঙিন রসে কিভাবে সিক্ত হতে পারে নির্যাতিত মানবতা, কত দ্রুত একটা সমাজকে পাল্টে দেয়া যায় শুধু চার অক্ষরের এ শব্দটার মাধ্যমে। ভালবাসার ছোয়ায় সব ঘুমন্তপ্রাণ জেগে উঠবে, তারা

www.pathagar.com

বুঝে নেবে তাদের স্ব-স্ব দায়িত্ব, প্রান ফিরে পাবে সব ঝিমানো মানুষ। এ স্বাদটাইতো অনেকে অনেকদিন ধরে পায়নি। ভালবাসা যে কতো শক্তিশালী তা মানুষ কখনো সখনো টের পায়। ভালবাসার প্রচার প্রসার সমাজে না ঘটলে এর যথেষ্ট বিস্তার না হলে পুরো সমাজটা কিভাবে উপকৃত হবে। গুটিকয়েক মানুষের ভালবাসাইতো সকল মানুষকে আকৃষ্ট করবে না। তাই এ জন্য প্রয়োজন অন্ততঃ শিক্ষিত লোকগুলো যেন অসততা রেখে তাদের শিক্ষার মর্যাদাটা বজায় রাখে। তারা অভাবী ও দুঃখী মানুষকে ভালবাসার মাধ্যমে তাদের পাশে দাঁড়ায়, তাদের হাত ধরে সব কাজ শিখিয়ে দেয়। বিবেচনায় থাকে এরা সাবলম্বী হলে আমাদের উপর চাপ কমবে। সামাজিক চাপ, সামাজিক অস্থিরতা, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজিসহ জনজীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে এমন বিষয়গুলো যদি আমাদের জীবন থেকে দূর হয়ে যেতো, যদি আমরা একটা সুন্দর সকাল পেতাম যে সকালের রোদে দুর্নীতি মুক্ত সমাজের ছোঁয়া আছে, বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ও গাড়ি ফিটনেস সহ নগরজীবনের সার্ভিস গ্রহণে নানান হয়রানিমুক্ত রাস্তাটি খোলা আছে। এমন একটা সকাল যদি আমরা পেতাম কতইনা ভাল হত। সমস্যাকে উৎরানোর জন্য মানুষ স্বপ্ন দেখে, পরিকল্পনা করে। এ কাজটা করতে আমরা যেদিন ভুলে যাব সেদিন নতুন দিনের আগমনের আশাও মন থেকে চলে যাবে। একটা তালগাছ একজন লাগায়। অনেক মানুষ সে গাছের তাল খায়। এক মার্কনী রেডিও আবিস্কার করেছে আর কোটি মানুষ রেডিও শোনে। তাই আমাদেরও মানুষের জন্য এ পৃথিবীতে কিছু একটা রেখে যেতে হবে। বিজ্ঞানের আবিস্কারগুলো নিঃসন্দেহে আমাদের জীবনযাত্রার মানকে অনেক গতিশীল করেছে, উন্নত করেছে। একই সাথে এর প্রয়োগ আমাদের অনেক কিছু কেড়ে নিয়েছে বিশেষ করে মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা। বিজ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগের অভাবে, অপব্যবহারের কারণে পারমানবিক যুদ্ধাস্ত্র তৈরী হয়েছে, দুটো বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছে এসব মারনাস্ত্র। বিজ্ঞানকে অপব্যবহার করার কারণে লাখ লাখ লোকের সেদিন মৃত্যু হয়েছে। আজ আমাদের দেশের কিশোর, তরুন ও যুবকদের নৈতিকতার উপর মানবিক মূল্যবোধের উপর হামলা করছে মোবাইল, ইন্টারনেট ও ডিস চ্যানেলগুলো। আমাদের সমাজের সবাই আজ হারে হারে টের পাচ্ছেন কি ভয়ানয়ক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। পড়াশোনা বন্ধ করে রাতভর বন্ধু বান্ধবীর সাথে আলাপ, ইন্টারনেটে চ্যাটিং অথবা বিদেশী নোংরা সিনেমার নৃত্য দেখা কতোটা কল্যাণকর তা এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের রেজাল্ট পাবার পর বাবা মা টের পান। ততোক্ষণে সব শেষ। এদেরই একটা অংশ নেশার জগতে পা বাড়ায়। নেশার জগতে যে একবার ঢুকে তার জীবন তো শেষ হবেই তার পুরো পরিবারটাই এক অসহ্য যাতনার শিকার হবে। আমরা তাহলে কি করলাম! কাকে ভালবাসলাম! আমার সন্তান, আমার পরিবেশ, প্রতিবেশী, দেশ কিছুই তো বাঁচাতে পারছি না। কাকে ভালবাসলাম আমরা? শুধু নিজেকে। তাওতো না। পেশাগত বা সামাজিক কোন ধরণের বড় সার্থকতা তো আমার নেই। তাহলে জীবনভর করলামটা কি? আমরা কি এমনই এক জাতি যারা নিজেরা কিছু পারি না। আমাদের সত্তা বলতে

কি কিছুই নেই? কে এমন আছেন যিনি টিভি চ্যানেল ঘাটার পর আফসোসে বুক চাপড়ান না। এমন কি হল যে সরকার এসব বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে পারছেন না? কোথায় আটকে আছে কে? আমাদের সন্তানরা কি আমাদের চোখের সামনেই মরে পড়ে শেষ হয়ে যাবে? একোন অভিশপ্ত জীবন পেলাম আমরা। এটাই কি ছিল স্বাধীন দেশের নাগরিকের পুরস্কার!

কুড়িগ্রামের এক বৃদ্ধ যার বহুমূত্র রোগ আছে তার গল্প শুনুন। বহুমূত্র রোগের কারণ কেউ জানে না। কারণ তার এ যাবৎ কোনদিন ডায়াবেটিসের টেষ্ট হয়নি। এসব টেষ্ট আজকাল অল্প পয়সায় হয় কি-না সেটা জানার চে বড় কথা হচ্ছে ডাক্তার দেখানোর কালচারই এ এলাকাতে গড়ে ওঠেনি। পৌষমাসের শেষ। বড় রাত, বারবার ঘুম ভাঙ্গে আর প্রস্রাবের জন্য বাইরে যেতে হয়। স্ত্রী থাকলে তাকে ডাকতো। গেল বছর শেষ রমজানে শ্বাসকাশে ভুগে ভুগে এ বাড়িতেই তার বউ মারা গেছে। ছেলে আর ছেলের বউ আছে। ছেলে থাকে ঢাকা। কুড়িগ্রামেই রিকশা চালাতো, এখন ঢাকায় চালায়। এই রাতে ছেলের বউকে বার বার ডেকে তোলা অনুচিৎ এ জ্ঞানটুকু বৃদ্ধর লোপ পায়নি, যদিও বউ বারবার তার শ্বশুরবাবাকে যে কোন অসুবিধায় ডাকার জন্য বেড়ার ওপার থেকে বাচ্চাদুটোকে দুপাশে শুইয়ে অনুরোধ জানায়। বুড়ার সম্ভবতঃ রক্তশূণ্যতা। এমনিতেই শীত বেশি তারপর আবার উত্তরা বাতাস বইতে শুরু করছে। ভীষণ শীত। আর এশীতে বারবার বাইরে যেতে কষ্ট লাগে। একসময় কাথাগায়ে কাঁপতে কাঁপতে জেকের শুরু করে। বাবা কম্বলটা দিয়ে যাই। অসম্মতি জানায়। তার নাতিগুলো এ শীতে কষ্ট পাবে, ওদের ঘুম ভেঙ্গে যাবে তা কি করে হয়। এ মানসিক অবস্থাটা নিয়ে বুড়ো অতি কষ্টে রাত কাটায়। সে জীবনে কখনো ঢাকা চোখে দেখেনি, ঢাকার গল্প শুনেছে মাত্র। শীতের প্রকোপ যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে বুড়োর কপালে এবার যে কি আছে কে জানে। গেল শীতে দূর দূরান্তের বেশ কিছু মৃত্যু সংবাদ তার কানে এসেছে। অনেকটাই আতংকে দিন কাটাচ্ছে সে। এর মধ্যে আবার ফজরের নামাজের জন্য ঐ দূর পুকুর পারে যায় অজু করতে। তার বাড়িতে মসজিদ নেই, দু'বাড়ি পর একখানা মসজিদ আছে। কখনো সেখানে যায়, কখনো যায় না। খুব কষ্ট হয় হাঁটতে।

কুড়িগ্রামের এ বুড়োর অনেক দুগর্তি আমাদের অজানা। যতটুকু জানলাম এটা কেমন জীবন। আমাদের নগরজীবনে অভ্যস্থ বাসীন্দারা শীত তেমন টেরই পায়না। একেতো বড় শহরগুলোতে বিশেষ করে ঢাকায় শীত কম। বছরে দু'চারটা দিন টের পাওয়া যায় শীতকাল আছে। তাছাড়া পাকা বাড়িতে রুম বন্ধ করলেই শীত শেষ। তারপর আছে শীতের একাধিক পোষাক, আছে পুরু কম্বল ও লেপ। এরপরও শীত নিবারণের জন্য রুম হিটার আছে। ঐ বৃদ্ধের কি আছে! কিছুই নেই। নিঃস্ব বলতে যা বুঝায়। তার মতো লোকের সংখ্যাই এলাকায় বেশি। কারও কাছ থেকে অতি সত্বর কোন একটা পুরনো জ্যাকেট বা কম্বল পাবে সে আশাও নেই। তার না আছে থাকার ঘর, পরিধেয় বস্ত্র ও শীতবস্ত্র, না আছে ন্যূনতম চিকিৎসা সুযোগ। হাঁটতে গিয়ে তার

www.pathagar.com

অনেকবার দাঁড়াতে হয়, বুকটা ভার লাগে। এটা কি ইসকেমিয়া? একটা ইসিজি করালে, ইটিটি করালে হয়তো বুঝা যেত হার্টের অবস্থাটা কি? ধানমণ্ডির লেকের পারে, চন্দ্রিমা উদ্যানে কিংবা রমনায় যারা হাঁটেন তাদের এ অবস্থা হলে সারাদিন কি করতেন? সাথে সাথে তার কি অভিব্যক্তি হত! এদের একটা অংশ যারা রমনায় হাঁটছিলেন তারা ইব্রাহীম কার্ডিয়াকে যেতেন বড়ছেলের পরামর্শ অনুযায়ী, কেউ চন্দ্রিমা উদ্যান থেকেই স্ত্রীকেসহ রিকশায় চলে যেতেন হার্টের শেরে বাংলাস্থ জাতীয় ইনস্টিটিউটে, এমনি ধানমণ্ডিতে যিনি হাঁটছিলেন তিনি ও বাসা থেকে ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে আসবে সে অপেক্ষা না করে হাটার এক পার্টনারকে সহ সরাসরি কাছের কোন হৃদরোগ হাসপাতালে চলে যেতেন। অনেকেই শরীরটা কেমন লাগছে বলে বাসায় যাবেন সন্দেহ নেই। এরপর পরিচিত ডাক্তার বন্ধুদের সাথে আলাপ করে, ছোটমেয়ের ডাক্তার জামাইর সাথে কানাডায় কথা বলে ডাক্তার দেখানো ও সংশ্লিষ্ট সকল ধরণের টেষ্ট দিনেই শেষ করে কি হয়েছে বের করে ফেলতেন। টেষ্ট রেজাল্ট খারাপ হলে তখন এনজিওগ্রামের সুপারিশ আসবে, এনজিওগ্রামে কয়টা কত পার্সেন্ট ব্লক ধরা পড়লো, কো লেটারাল সাপ্লাই হার্টের আক্রান্ত এলাকাগুলো কভার করতে পারে কি-না এর উপর ভিত্তি করে রিং লাগাবে, না বাইপাস সার্জারী করবে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এসবই হবে অতি দ্রুততার সাথে। এখানে যে হাঁটা পার্টির কথা বললাম টাকা তাদের কাছে কোন ফ্যাক্টর না, ঢাকায় থাকার সুবাদে এখানে সকল নাগরিকের কাছে চিকিৎসা সুবিধাটা সমান ভাবে প্রাপ্য যা বরগুনা জেলা শহরের ডিসি এসপি সাহেবও কল্পনা করতে পারেন না। কারণ ঐ জেলা শহরে এসুবিধাটুকু নেই। তাদের বুকে ব্যাথা হলে চিন্তার ব্যাপার। সম্ভবতঃ সিডর, হঠাৎ বুকে ব্যাথায় হার্টের ডাক্তার না পাওয়া, আর ঢাকা থেকে অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা মনে করেই এসব এলাকায় সরকারী কর্মকর্তারা যেতে চান না। কুড়িগ্রামের বুড়োর সাথে ডিসি সাহেবের তফাৎ হচ্ছে- ঐ রাতে বা পরদিন সকালেই তিনি বরিশাল মেডিকেল কলেজ অথবা সাতঘন্টার মাথায় ঢাকা শহরে চলে আসবেন ও দেশের সেরা চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করবেন কারণ এ ক্ষমতাটুকু, এ সুযোগটুকু তার আছে। আর ঐ বুড়োকে ঢাকায় এনে হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের বারান্দায় রেখে এলেও সে এর কানাকড়ি চিকিৎসাও পাবে না অন্য একজন চেনাজানা লোক পুরোটা বেলা তার সাথে থেকে এই রুম ঐ রুম করলে হয়তো একটা জরুরী ইসিজি হতে পারে অথবা ভর্তির তারিখ পড়তে পারে একমাস পর। এর নাম কি চিকিৎসা? বুকে ব্যাথাতো সবসময় নাও থাকতে পারে, ডাক্তার যখন তাকে দেখছেন তখন শ্বাসকষ্ট নাও থাকতে পারে। ঐ লোকের রোগ উপসর্গ অনুযায়ী তাকে আরও আগেই একটা হৃদরোগ হাসপাতালে ভর্তি করানো ও সার্বিক চিকিৎসা হবার কথা ছিল। কিছু পরামর্শ দেয়ার কথাছিল যা তার জীবনযাত্রাকে সহজ করতো। খাবার দাবারে একটু নিয়মনীতি পালন। একজন মানুষ হিসেবে তার রোগের কারণে এটা ছিল সমাজের কাছ থেকে তার পাওনা। খুব বেশি বড় পাওনা এটা না। কুড়িগ্রাম থেকে এখন আর ঢাকা যেতে হয় না। রংপুর পর্যন্ত গেলেই হৃদরোগের চিকিৎসা শুরু হয়ে যায় সেখানে

www.pathagar.com

কার্ডিওলজিস্ট আছে। প্রাইভেট চেম্বারে রোগী দেখতে চিকিৎসকরা যতোটা আগ্রহী সরকারী হাসপাতালে অতোটা আগ্রহী না, তারপরও কিছু এটা ব্যবস্থা হবেই। চিকিৎসা না হোক একটা ইসিজিতো হবে। রোগ নির্ণয় তো করবে। মূলতঃ এ লোকেরাও শহরমূখী নয়। তারা হাসপাতালের সেবা না পেতে পেতে, হাসপাতাল আউটডোরে প্রতারিত হতে হতে আর ওমুখী হতে চায় না। হাসপাতালে দালালদের দৌড়াত্ম অনেক বেশি।

এ বৃদ্ধর করুণ অবস্থাটা বাংলাদেশের সাধারণচিত্র। কুড়িগ্রামে খড়া ও শীত হয়তো বেশি, টাকা পয়সা ঐ এলাকায় কম, লোকজনও সহজ সরল তাই তাদের এহেন অবস্থাটা অবশ্যই খুব করুণ ও বেদনাদায়ক মনে হয়। ঐ বুড়োলোকের মতোই একজন এ শীতে কাপছে হবিগঞ্জে-নড়াইলে, আবার কেউ কষ্ট পাচ্ছে রাঙামাটির চাকমা পাড়ায়। বিরু কারবারী। এরা আমাদের সমাজের অংশ। এদের শীতবস্ত্র আর চিকিৎসার ব্যবস্থা আমাদেরকেই করতে হবে। তাইতো কথা ছিল। তবে হচ্ছে না কেন? ঐ যা বলছিলাম এদেরকে মানুষ হিসেবে বিবেচনায় রাখলে সম্ভব হত কিছু করা। সরকারের মন্ত্রী এম,পি'রাতো এদের খবর জানেন। সরকারী কর্মকর্তারা অনেক সময় জনগণের সাথে এতটা সম্পৃক্ত না বলে হয়তো অনেক কিছু জানেন না। এম,পি সাহেবদের কি কিছু করার থাকে না। তাদের কোন ব্যক্তিগত উদ্দ্যোগ কি এসব ক্ষেত্রে কাজ করতে পারে না। কেউ কেউ করেন একথা মানি। কি করেন? যে যাই করেন না কেন মাথায় থাকে ভোটের চিন্তা। তাই করাটা হয় অনেকাংশেই বিতর্কিত ও ত্রুটিযুক্ত। মানুষের প্রতি ভালবাসা ও কমিটমেন্ট থাকলে এদের পাশে দাঁড়ালে সমাধান অবশ্যই বেরিয়ে আসবে। দীর্ঘদিনের লুটপাটের কৃষ্টি বন্ধ হলে ঐ বুড়োর চিকিৎসা রংপুরে নয় কুড়িগ্রামেই হবে। ঐ লোকটার শীতের হাড় কাপুনি যখন আমার শরীরে প্রবেশ করবে, তার কষ্ট ও যাতনা যখন আমি আমার হৃদয়েও অনুভবে টের পাব সেদিন তার ঘর হবে, লেপ কম্বল হবে, হৃদরোগের চিকিৎসা হবে। ডায়াবেটিস আছে কি-না ধরা যাবে। তার কষ্টটা আমাকে বুঝতে হবে। এজন্য বুঝতে হবে কারণ আমার বাবার মতোই এ লোকটা।আমার বাবার মতই তারও পেটানো শরীর, মুখভর্তি দাঁড়ি। সে আমার রক্তের সম্পর্কের নয়- তাই বলেকি তার চিকিৎসা হবে না! চিকিৎসা হবার জন্য প্রয়োজন 'রোগ'। কার বাবা, কি করেন,শহর না গ্রামে থাকেন, বেকার না চাকরি করেন- এ প্রসঙ্গ তো আসাই উচিৎ না। আমাদের সমাজে আসে, খুবই খারাপ ভাবে আসে। এ জন্য বুঝতে হবে যে, সে আমারই দেশের নাগরিক। এ জন্য যে, সে আমার গোত্রের লোক। সেও মানুষ, আমিও মানুষ। তার এ কষ্টে আমিই পাশে দাঁড়াব। একটা পুরানা কম্বল উত্তরবঙ্গে পাঠিয়ে দিয়ে আবার নিশ্চিন্তে গালে হাত দিয়ে রিমোটে সাউণ্ড বাড়িয়ে হিন্দি মুভি দেখতে বসে গেলাম– এমনটা করলে হবে না। কম্বল পাঠানোতে তার শীত নিবারণ সম্ভব হবে। এ বছরটা কোনরকম পার করে দেবে-শীত সমাধান হল। তার সুস্থতার জন্য চিকিৎসা দেবে কে? এ মানুষটাকে সমাজে আর চারজন সুস্থ মানুষের

www.pathagar.com

কাছাকাছি দাঁড় করানো যায় কিভাবে সে চিন্তাটা করতে হবে। ঐ বৃদ্ধর কষ্টে আপনি যদি কষ্ট পেয়ে থাকেন তাহলে তাকে একটা কম্বল পাঠানোর পাশাপাশি আর একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নেন যে 'জ্ঞাতসারে আর কোন দিন অন্যায় করব না'। ঘুষ নেব না, দেশের খাতিরে কাজ করব। আমার বেতন আছে, চাকরি আছে। আছে সামাজিক স্বীকৃতি। আমি কেন ঘুষ খাব। কেউ না জানুক যারা ঘুষ দেয় তারাতো জানে, তারা অপরিচিত মানুষ হলেও তাদের কাছে কি কোন সম্মান মর্যাদা থাকল। এভাবে অফিসের অন্য লোকজন কি ধীরে ধীরে এ অপকর্মের কথা টের পেয়ে যায় না? ঘুষের মত হাজার অপরাধ আজ জনজীবনকে দুর্বিসহ করে তুলছে। যারা কোন প্রয়োজনে অফিস আদালতে যান এবং অনেক কলাকানুন দেখিয়ে, আইনের মারপ্যাচ দিয়ে কাজটা বিধিবহির্ভূত বলে একজন নীরিহ লোককে দিনের পর দিন কষ্ট দিয়ে ছেড়ে দেন। এবং পরিশেষে ঘুষের বিনিময়ে সেই বিধিবহির্ভূত কাজটাই আবার করে দেন তখন আপনার কি এতাটুকু লজ্জা লাগে না? ঘুষের মত অপরাধ আছে স্বজনপ্রীতি। যোগ্য লোককে- দক্ষ লোককে সঠিক স্থানে না বসিয়ে খাতিরের লোক, দলের লোক, এলাকার লোক, আত্মীয়দের মধ্য থেকে কাউকে বাছাই করা। অযোগ্য, অসৎ ও চরিত্রহীন লোককে জেনে শুনে নিয়োগ প্রদান কি কোন অন্যায় না? পেশায় গুনগত মান আসবে কিভাবে। যে সমস্ত যোগ্য লোক বাদ গেল, সৎ ও কর্মঠ লোক নিয়োগবঞ্চিত হল, চরিত্রবান লোকরা বদনাম নিয়ে গেল তাদের প্রতি যদি ভালবাসা থাকত, যদি আপনার মধ্যে ন্যায় বিচারের তাগিদ থাকত এ কাজ আপনি করতে পারতেন না। পশুদের পক্ষে এমনি ভাবে অন্ধ হয়ে যাওয়া সম্ভব। মানুষ পশু না। সুতরাং মানবীয় গুণাবলী সম্বলিত লোকরা কোন অবস্থাতেই এহেন কাজ করতে পারেন না। বর্ডার এলাকায় পতাকাবৈঠকে যেমন কোনদেশ প্রেমিক সেনাকর্মকর্তা দেশের স্বার্থবিরোধী কাজ করতে পারেন না, পররাষ্ট্র মন্ত্রী যেমন শ্রমশক্তি রপ্তানীর ক্ষেত্রে মানবীয় বিষয়গুলো বারবার খতিয়ে দেখেন-নির্যাতিত না হয় আমার দেশের লোক– আমার ভাই, ঠিক তেমনি দেশের আভ্যন্তরীন বিষয়গুলোতে যেখানে সাধারণ মানুষ জিম্মি হয়ে যায় বিভিন্ন অফিসে সেখানেও এদেশের স্বার্থের কথা মনে রাখতে হবে।

আমরা কি কখনো রাজপথের একজন রিক্সাওয়ালার কথা ভাবি। তার প্রতিদিনের আয় কত। ক'জন সদস্য তার টাকার উপর নির্ভরশীল। রিক্সাটা কি তার নিজের না ভারায় খাটে। এ রিক্সাওয়ালার বয়স কত। তেত্রিশ হবে। যুবক। তার বাসা কোথায়, ভাড়া কত। এ শীতের সকাল দশটার রোদ্রেও তার গরম লাগছে। খুবই টায়ারিং রিক্সা চালানো। দিনের শেষে খুবই ক্লান্ত লাগে। এ রিক্সাওয়ালা মেহেরপুরের। তার ঢাকার জীবন তিন বছরের। একদিন রিকশা না চালালে উপোস করতে হয়। চালের দাম চল্লিশ টাকা কেজি। ধানমণ্ডি হয়ে সাত মসজিদ ও মোহাম্মদপুর। আপনি আরোহী হিসেবে তার কথা ভাবেন, কতো কষ্টের এ জীবন। আমাকে দিলে আমি কি পারব রিক্সা চালাতে। অথচ ওরাতো চালাচ্ছে। বিপদে পড়লে সবাই পারে। গরমে তার

www.pathagar.com

শরীরে নোনা ঘাম দেখা যায়। এমন শ্রমিকদের ভালবাসতে হয়। জাতিগঠনে এদের শরীরের ঘাম, গার্মেন্টস এর মেয়েদের ঘাম আল্লাহ অবশ্যই কবুল করবেন। ঘামে ভিজে রিক্সাওয়ালার পিঠটা চপচপ করছে। যদি মাঝপথে ইচ্ছে করে একটু জিরিয়ে নেই। সে কথা কি বলা যাবে। কে আছে এমন দরদী যে বলবে হ্যাঁ ভাই একটু বিশ্রাম করে নাও। এই নাও দশ টাকা চা বিস্কুট খেয়ে নাও। এমনটা কি খুব দেখা যায়? কলেজ পড়ুয়া কোন ছাত্রের মধ্যে এমন মানবিক আচরন কখনো সখনো চোখে পড়লেও সামাজিক কারনেই পরবর্তীতে তার এ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে বরং রিকশার গতি না থাকলে খিচিয়ে গালি দিতে অথবা মারতে উদ্দত হবে এমন লোকদের সংখ্যাই বেশি। একটা ভাড়া করা বাঁশের মাচং এর উপর যার বাস, মাসের প্রথমেই যার দু হাজার টাকা বাসা ভাড়া বাবদ গুণতে হয় তার আর থাকে কি। বাকি টাকায় কি সংসার চালাবে সে। এ কেমন জীবন। রিক্সাওয়ালা দ্বিধাগ্রস্থ। মেহেরপুরের বাপের ভিটার জীবনটাই কি তার ঠিক ছিল। সাত পাঁচ কথা ভাবে সে। একজন রিক্সা চালকের ছেলেতো কিন্ডার গার্টেনে যায় না। বাংলা মিডিয়ামের কোন সরকারী অথবা কম খরচের গলির মুখের ভাল স্কুলে ভর্তি করানোটাই টার্গেট। রিক্সা চালকের ছেলেমেয়েদের সাথে এ স্কুলগুলোতে কেউ মিশতে চায় না। তাদেরকে আলাদা চলতে হয়। এটা কতো বেদনার, কত যন্ত্রণার। অথচ আমরা শিক্ষা নিয়েছি জীবনকে সুন্দর ও সাবলীল করার। সার্বিকভাবে সবকিছুই বিবেচনায় রাখতে হবে। স্কুলগুলোতে সবাই ছাত্র। বাবার পরিচয় মোটেই মুখ্য নয়। স্কুলের শিক্ষক ও ম্যানেজমেন্টের লোকরা নিশ্চিত করতে পারলে তার কষ্ট কমবে। সবচে বড় কষ্টটা মানসিক। স্কুলের ঘটনা ছেলের মুখে শুনে ঐ রিক্সাচালকের আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করে। হায়রে মানুষ!!

একজন দিনমজুর হয় সে ঠেলাগাড়িওয়ালা বা রাজমিস্ত্রী কিংবা বাসের হেল্পার। খুব নিখুঁতভাবে কি বিবেচনা করেছেন এদের জীবনটার কথা? অধিকাংশ লোকই গ্রাম থেকে এসেছে। কতো কষ্টে এসব অশিক্ষিত লোকজন বাবার ভিটেমাটি ছেড়েছে তা তারাই ভাল জানে। এতো মানসিক চাপ মানুষ কিভাবে হজম করে। শহুরে জীবনে প্রতিবন্ধকতার কোন শেষ নেই। নিছক দুটো ক্যাশ টাকা পাওয়া যায় বলে শহরমুখী হয়েছে এলোকগুলো। কেউ সদরঘাটে কুলিগিরি করে, কেউ চালায় নৌকা। শহরে পুরানা কারও হাত ধরে প্রবেশ করতে হয়, কাজ পেতে সময় লাগে। এখানে সবাই সমানতালে খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ হয়। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকে, ভেজাল খাবারে শরীর বেড়ে ওঠে, প্রতিদিনই বস্তি এলাকায় চিৎকার চেচামেচিতে এরা অনেকটাই অভ্যস্থ হয়ে উঠেছে। এ দিনমজুরদের পারিশ্রমিক একদম খারাপ না। এই পারিশ্রমিক পাবার জন্য কতো কষ্ট করতে হয়, কত ঘাম ঝড়াতে হয়। কোনদিন বিশ্রাম নেই। প্রতিদিনই কাজ। কাজ করলেই পয়সা। পয়সার কাছে শরীরের ব্যাথার কোন স্থান নেই। এরা সবাই যেভাবে পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করে তা আমাদের চিন্তা করতেও কষ্ট লাগে। মনে হয় ওদের বলি আর এভাবে শ্রম দেবে না। জবাবে বলবে 'ভরণ

www.pathagar.com

পোষণ দেন। সাধে কি এসব করছি'? হালাল খাই, এটাই সান্ত্বনা। উচু বিল্ডিং এর বাসীন্দারা হারাম উপার্জনে চলে, খায়। আর আমরা হালাল উপার্জনে চলি। ওদের এতো কষ্টের মধ্যেও হাসি দেখে ভালই লাগার কথা। এই কষ্টের শেয়ারিং কিভাবে হবে। সমাজের শিক্ষিত ও কর্তা ব্যক্তিরা দুর্নীতি না করে যদি সমাজ বিনির্মানে অংশ গ্রহণ করে তাহলে এ অবস্থার উন্নতি হবে। শারীরিক শ্রমে অনেক কষ্ট, অনেক যাতনা। মানুষের প্রতি মায়া থাকলে এই শ্রম চোখে পড়বে, তাদের কষ্টের কাহিনী বিবৃত হবে এবং একটা সুস্থ পর্যায়ে আমাদের চলে আসার সুযোগ হবে। এই পেশাজীবিরাই বা সমাজে কি দেবে। দুর্বল আর সবলদের ব্যবধান আরও কমিয়ে আনতে না পারলে ঐ শ্রমজীবি মানুষদের মত বাকীরাও কষ্টে দিনাতিপাত করবে। দিনমজুরদের কষ্ট হয়তো লাঘব হবে না, কথা হবে না জনে জনে। দিনমজুর শ্রমজীবি মানুষের কষ্ট তাদের শরীরের ঘামের নোনতা গন্ধেই টের পাওয়া যায়। তাদের পেটের চাহিদা আর অশিক্ষার কারণে স্বাভাবিকভাবেইমেজাজ ভাল থাকার কথা নয়। আমরা শিক্ষিত মহল তাদের সাথে প্রায়ই তর্কে লিপ্ত হই। তাদের প্রতি রুষ্ট হই ও গালমন্দ করি। দিনমজুরদের মজুরী নিয়েই বেশি লেগে যায়, তর্কাতর্কি হয়। দিনের মজুরীসহ· অন্যান্য কথাবার্তাগুলো আগেভাগে সেরে নিলেই হয়। চুক্তি করা যে এসব কাজের পূর্ব শর্ত তা আমরা ভুলে যাই অথবা আমাদের স্বার্থেই ভুলতে পছন্দ করি। এ আচরণ মোটেই শুদ্ধ নয়। সিএনজি চালক, ক্যাব চালক মিটার বন্ধ করে বলে মিটার নষ্ট। তারপর অযৌক্তিক ভাড়া দাবী করে অথবা বলবে ওদিকে যাব না। তাদের এ আচরণ অনেক সময়ই বিরক্তিকর, কখনো সখনো এদের সাথেও লেগে যায়। এগুলো সমাজ ব্যবস্থার সার্বিক ব্যর্থতার চিত্র। গ্যাসের দাম, সিএনজি লাইন, সিএনজি ভাড়া, দ্রব্যমূল্য এসবকিছু এ আচরণের পেছনের কারণ। আইন করে অযৌক্তিকভাবে কিছু করা যায় না। বর্তমান সময়ে বিডিআর শপের মাধ্যমে কমদামে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি গ্রাহকদের কাছে পৌঁছানো হচ্ছে। দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষার পর দুই কেজি চাল বাজার দরের চে ছয় টাকা কমে কেনা গেল বটে। চালের গুণগত মানও ছয় টাকা কম। বাজারে জিনিসের দাম বাড়লে তারাও বাড়ায়। বাইরের খোলা বাজার বিডিআর বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করছে, বিডিআর শপ খোলা বাজারের উর্ধ্বগতিকে থামাতে পারছে না। আগে যারা সরকার চালোতো তাদের লোকজন ব্যবসার সাথে জড়িত এরা সরকারের সুবিধাভোগী লোক। তারা ঐ পরাজিত সরকার আসুক তাই চাইবে কারণ দুর্নীতি অভিযানের টার্গেটে পরিণত হয়ে খুবই বিপদে আছে এসব ব্যবসায়ীরা। দেশের বাইরের কিছু লোকও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে মজা পাচ্ছে। তারা বাংলাদেশে একটা দুর্ভিক্ষ লাগুক এটা চায়, কালো কালো হেলিকপ্টারে করে সুদানের মত তখন বুভুক্ষ মানুষের জন্য খাবার সরবরাহ করবে, আরও একবার প্রমানিত হবে তারাই আমাদের বন্ধু।

ওয়ান ইলেভেনের আগের লোকজনের যেমন এদেশের মানুষের প্রতি ভালবাসার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে, গণতান্ত্রিক সরকারগুলোর মন্ত্রী এমপি ও দলীয় কর্মীদের

লুটপাট, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী ও স্বজনপ্রীতির কারণে মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। নির্বাচনকে কেন্দ্রকরে ২০০৬ এর শেষদিকের ঘটনাগুলো প্রমাণ করে জাতি হিসেবে আমরা কতোটা পিছিয়ে আছি। নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রা ভঙ্গ করার মতো ঘটনাও কেউ কেউ ঘটিয়েছেন। রাজনীতিবিদদের সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনার যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। তারা বিদেশী কূটনীতিবিদদের স্বরণাপন্ন হয়েছেন, ওরা ফর্মুলা দিয়েছে। এখন তাদের ফর্মুলায় দেশ চলছে। উপদেষ্টাদের বারবার পদত্যাগ মোটেই জাতির জন্য সুখবর বয়ে আনছে না। পর্যবেক্ষক মহলের সন্দেহ ইরাক, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের দিকেই বাংলাদেশকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে কি-না। আমরা আমাদেরকে অপছন্দ করি বলেই আজ এ অবস্থা। উপদেষ্টাদের এ পদত্যাগ সবাইকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে হবেটা কী। কি হবে তা নির্বাচন বানচালের সময়ই টের পাওয়া গেছে। চরিত্রের পরিবর্তন না হলে আরও টের পাওয়া যাবে। সরকারে থাকা লোকদের সীমাহীন দুর্নীতি ও প্রচণ্ড দাপট আর সরকারের বাইরে থাকা বিরোধীদের ২০০৬ সাল জুড়েই বিভিন্ন ধরণের উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ড বর্তমান সরকারকে দায়িত্ব নিতে বাধ্য করেছে। এর বাইরেও একটা কথা থেকে যায়। তা হচ্ছে শুধু কি জোট সরকার আর বিরোধী জোটের কারণেই আজ এ অবস্থা। অন্য কোন পক্ষের 'উইস' কি এখানে কাজ করেনি? তা না হলে অন্য তিনটা নির্বাচনের সময় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়নি কেন? আওয়ামী লীগ বলবে জোট সরকারের দুর্নীতি ও পাতানো নির্বাচন দায়ী আর জোট সরকারের লোকেরা বলবে নির্বাচনে জিতবে না জানতে পেরে আওয়ামী লীগ তার দোসরদের নিয়ে নির্বাচন বানচাল করেছে। পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসতে চেয়েছে। দরজা সামনের হোক আর পেছনের হোক উল্লেখ্য দু'টো দলই দেশ ও জাতির দিকে তাকায়নি। যে যার অবস্থান থেকে নিজস্ব ইগোকে প্রাধান্য দিয়েছে। দেশের মানুষকে ভালবাসলে তারা কি এমন কাজ করতে পারতো? আতকে ওঠার মত সব ঘটনার সূত্রপাত করেছেন এরা। দলের অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদরাও একটু ধৈর্যধারণ করতে পারলেন না। সবাই বেফাস কথা বলে বেড়ানো শুরু করলেন। বিরোধীদের অপছন্দের লোকদের চরিত্রহরণ শুরু করলেন দলবেধে সবাই। আমাদের রাজনীতিবিদদের চরিত্রে ধৈর্যর অভাব বারবার ফুটে উঠেছে। তারা মানুষকে ভালবাসেন, মানুষের জন্য রাজনীতি করেন মৌখিক এসব দাবী সমূহকে বাস্তবে প্রমাণ করতে প্রায়ই ব্যর্থ হয়েছেন। তাদের টার্গেট যদি থাকে 'জনগণ' তাহলে জনগণের ভোগান্তি বাড়ে এমন কর্মকাণ্ড তারা কেন করেন, এমন কর্মসূচীই বা কেন দেন। দল ক্ষমতায় গেলে জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন করবেন বলে তাদের ভাগ্যের রাতারাতি পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলেন তাতো জনগণ প্রত্যক্ষ করেছে বহুবার। কে বড় গলায় বলবে 'আমার দল সরকারে থাকাকালীন আমি স্বচ্ছ থেকেছি'? কারও কি সে মুখ আছে? ব্যক্তিগতভাবে কারও কারও সততা অন্যদের তুলনায় চোখে পড়ার মত ছিল সন্দেহ নেই। ঐ টার্গেট গ্রুপকে যে রাষ্ট্র ক্ষমতায় গিয়েই তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে হবে তাতো আর না। যে কোন সময় যে কোন কেউ তাদের দিন বদলের অভিপ্রায়ে যা

www.pathagar.com

করবেন তাই হবে মানবকল্যাণ, তাদের জন্য কাজ। যারা কাজ করেন তারা কি কোন কিছুর অপেক্ষা করেন? তাদের চরিত্রে থাকে কাজের বীজ, তারা ক্ষেত্র পেলেই তা বপন করে দেয়, তাদের মনটা টার্গেট গ্রুপ জনশক্তির জন্য আনচান করে তারা তাদের হৃদয়ের সব কপাট খুলে দেন ঐ মানুষদের জন্য। রাজনীতিবিদদের বিশাল কর্মীবাহিনী। ঐ টার্গেট গ্রুপদের জন্য কোন সামাজিক কিংবা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে কখনো? আমরা কি শুনেছি অমুক দলের কর্মীরা সারাদেশ ব্যাপী বিশ হাজার বয়স্ক নারী পুরুষদের থাকা খাওয়া ও চিকিৎসার জন্য এগিয়ে এসেছেন অথবা অমুক ছাত্র সংগঠনের ছাত্র-ছাত্রীরা ছুটিতে গ্রামের বাড়ি গেলে স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের স্পেশাল কোচিং করানো কিংবা বয়স্কদের বিকালে প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করেছে? কারা করবে এ কাজ? শুধু সরকারের মন্ত্রী ও সচিবরা? প্রাথমিকভাবে ধরা যাক এ দায়িত্ব তাদেরই। আমাদের কোন কিছু করার নেই? এমনভাবে সামাজিক কর্মকাণ্ড শুরু করলে সরকার হয়তো এ সংস্থাগুলোকে সহযোগিতা করবে। এনজিওগুলো কাজ করে যা গল্প করে তার কয়েকগুন। বিদেশী এনজিওদের নিয়ে সরকার অনেক সময় বিপদে থাকে কারণ পাশ্চাত্যের এমন এনজিওদের কর্মকাণ্ড দেশের স্বার্থবিরোধী হলেও দাতা দেশের সংস্থা চিন্তা করে সরকার নিরব থাকে। দেশীয় এনজিও যারা জনগণের জন্য কমিটেড তাদের জন্য সরকারী সাহায্য সহযোগীতা আরও বাড়ানো প্রয়োজন।

টার্গেট জনসমষ্টির জন্য সত্যিকার অর্থে কাজ করার লোক খুব কমই আছে। তাদের জন্য আমাদের কতটুকু কাজ করা প্রয়োজন? শুধু কম্বল ও প্রাথমিক চিকিৎসা? তাকে মানুষের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা। এ বলতে যা বুঝায়। আমার মতই তার সামাজিক মর্যাদা থাকবে। তাকে রাস্তায় আমি ভুলেও তুমি বা তুই বলব না। এই তুমি তুই শব্দ ব্যবহার তার সামাজিক অবস্থানের কারণেই। আমরা বন্ধুদের সাথে যে তুই ব্যবহার করি বা ছোটদেরকে তুমি বলি এ সম্বোধন তার কোনটাই না। বাংলা ব্যকরণের ভাষায় এ 'তুই তুমি' তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয়। মানুষকে তার স্থানে যদি আমরা আসীন করতে পারি তাহলে তার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে আর সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনতো হবেই। আমার বিবেচনায় আমরা যদি 'আমাকে' ভালবাসি তাহলেই মানুষকে ভালবাসতে পারব। এটা যেন রোগী সেবায় হাসপাতালে রাত জাগার মত। আমি যদি চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশনের ঔষধগুলো সন্ধ্যারাতে এনে সিস্টারের হাতে দেই আর সিস্টার সময়মত রোগীকে দেন তাহলে রোগীও আইসিইউতে ঘুমহীন অস্থির থাকবে না, চিৎকার করবে না আর আমাকেও বিচলিত রাখবে না। ঘুমানোর সুযোগ দেবে। অতএব সামাজিক এ দায়বদ্ধতা আমরা পালন করলে সমাজের সাধারন মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটলে আমরাও সুখে থাকব, হালকা থাকবে আমাদের মন। কোন পাথর চাপা কষ্ট আমরা অনুভব করব না। ধনী গরীবদের ব্যবধান কমে আসবে। শিক্ষিত অশিক্ষিতদের আচার আচরণে মানবিক দিকটাই বেশি প্রাধান্য পাবে, সমাজে

www.pathagar.com

সন্ত্রাস কমে যাবে, সামাজিক অস্থিরতা হ্রাস পাবে। সমাজে সুখ নেমে আসবে, শান্তি বিরাজ করবে। এ কথাগুলো না বুঝার কোন কারণ নেই। শিক্ষিত লোকদের চাহিদার যে স্তরবিন্যাস মনের মধ্যে আছে সেখানে তার মৌলিক চাহিদাই পূরণ হয়নি। সে এটা নিয়েই ব্যস্ত। সমাজের অন্যলোকদের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গের এবং তৃপ্তি নেয়ার যে চাহিদা এটা তাকে এখনও আকৃষ্ট করেনি। শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটির কারণেই এটা হয়েছে। মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে পাঠ্যপুস্তকের পাতায় পাতায় এ জিনিসটা থাকতে হবে। রাজনৈতিক বিতর্ক এড়ানোর জন্য জীবিত লেখকদের লেখা দেয়া যাবে না এমনটা হওয়া উচিৎ নয়। বর্তমান সময়ে গল্প কবিতা উপন্যাস অথবা প্রবন্ধ লিখছেন যাদের লেখায় মানবিক দিকটা খুবই আকর্ষণীয়ভাবে ফুটে উঠেছে তাদের লেখা নেয়া উচিৎ সে যেই হোক না কেন। দু'শ বছরের আগের লেখকের অহেতুক অযৌক্তিক গালগপ্প দিয়ে লেখা গল্প কবিতা প্রবন্ধ পরীক্ষার নম্বর পাওয়ার জন্য ছেলেমেয়েরা পড়ে কিন্তু ওখানে শেখার মত কিছু নেই। এ লেখাগুলো হচ্ছে এক ধরণের মটিভেশন, স্টিমুলেশন যা আমার ঘুমন্ত সত্তাকে জাগিয়ে তুলবে, আমার মানবিক তরল অথবা বায়বীয় বোধটাকে কঠিন মানবিক মূল্যবোধে রূপান্তরিত করবে। সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি এসব ক্ষেত্রে বিশাল ভূমিকা রাখতে পারে। সরকার যদি মানবদরদী হন, সুস্থ্য ও জবাবদিহিতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন, সরকার যদি বিতর্কের উর্ধ্বে থেকে দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে বড় মন নিয়ে কাজ করতে পারেন, সরকার যদি জনগণকে নিরাপত্তা দিতে পারেন, যদি সরকার মানুষের আস্থা অর্জন করতে পারেন তাহলে শুধু মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত ও গরীব অভাবী জনগণই না সমাজের ধনীক শ্রেণীও এগিয়ে আসবে সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য। ধনীরাইতো সবচে ভীত থাকে, সমাজ বিনির্মানের কথা শুনলে তারা ভাবেন তাদের অর্থে গরীবরা ভাগ বসাবে। তা কেন? আপনার কষ্টার্জিত, ইনকাম ট্যাক্স দেয়া, যাকাত দেয়া হালাল অর্থ আপনারই। আমরা অন্য ব্যবসায়ীদেরকেও আপনার পথ অনুসরণ করতে বলব। আপনি ভীত হবেন না এহেন আলাপ চারিতায় আপনার খুশি হওয়া উচিৎ। আপনি শ্রমিকদের বেতন দেন, বোনাস দেন, সাপ্তাহিক ছুটি ভোগ করে আপনার অফিসের ছেলেমেয়েরা। আপনার প্রতিষ্ঠানে কোন অবিচার, নির্যাতন হয় না, আপনি ফ্যাক্টরীগুলোর শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসক নিয়োগ দিয়েছেন। জরুরী প্রয়োজনে তাদের হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা রেখেছেন। চব্বিশ ঘন্টা এ্যাম্বুলেন্স দাঁড় করিয়ে রাখছেন গেটের সামনেই। এটা কর্মচারীদের মানসিক শক্তি যোগায়। আপনি উচ্চ শিক্ষিত নন কিন্তু আপনার এসব মানবিক গুনাবলীর কারণে শ্রমিকরা আপনার উপর সন্তুষ্ট। অন্য ব্যবসায়ীরাও আপনাকে অনুসরণ করে শ্রমিকদের আস্থা অর্জন করতে পারে। আস্থা অর্জন খুব জরুরী। আপনি যেমন আপনার শ্রমিকদের আস্থা অর্জন করেছেন তাদেরকে ভালবাসা দিয়ে, তাদেরকে মানুষের মত মর্যাদা দিয়ে- সরকারও যদি জনগণের আস্থা অর্জনে সক্ষম হন তাহলে তার পক্ষে সকল জনশক্তিকে আহ্বান করা সহজ হবে। কোন শ্রেণী বাঁকা চোখে তাকাবে না, সন্দেহ করবে না। সরকার মানবিক মূল্যবোধের দিকটা সব

www.pathagar.com

এজেন্ডার সামনে নিয়ে এলে সম্ভবতঃ অনেক কষ্ট কমে যাবে। অনেকগুলো সমস্যার খুব দ্রুত সমাধান হয়ে যাবে। সরকার যেহেতু লোকদের সমন্বয়ে গঠিত। ঐ লোক যারা ভীত, শংকিত তার চেয়ারের জন্য। চেয়ারে টান পড়ার ভয়ে সবাই আতংকিত। জ্ঞানের অভাবই তাদের ভীত করেছে। তার যদি জ্ঞান থাকতো তাহলে তাকে আর ভীত সন্ত্রস্র হতে হত না। তার জ্ঞানইতো তাকে গাইড করবে কখন কি করতে হবে। সকল কৌশল শেখাবে। কখনো সখনো আপেক্ষিক পরাজয়কে জ্ঞান জয় বলে বিবেচনা করে। কোন ব্যক্তি তার সারাজীবনের অর্থ জ্ঞান মানবমুক্তির জন্য উৎসর্গ করার পর যদি সমাজের কোন একটা বিশেষ দিকেরও মুক্তি মেলে সে নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করে। অর্থ ব্যয়, সময় ব্যয় ও কঠোর পরিশ্রমকে তিনি সঠিক পথে বিনিয়োগ করেছেন বলে গর্ববোধ করেন। তার চেহারায় বিজয়ের জৌলুস অথচ তার পরিপার্শ্বের অনেকেই বাড়ি গাড়ি না থাকার কারণে তার সমালোচনা করবেন এবং তাকে ব্যর্থ ও পরাজিত একজন লোক বলে বিবেচনা করবেন। আমরা তা করি না, করব না। ঐ ব্যাক্তি মহৎ, তিনি মানব সমাজের গৌরব। তাকে নিয়ে আমরা অহংকার করি। আমরা তার মত মহৎ মানুষের খোঁজে আছি। এ সকল মানুষের জন্যই পৃথিবীতে আজও অক্সিজেন আছে। পৃথিবীতে কিছুলোক সব সময়ই ধ্বংসের গীত গায়, তাদের মগজে চিন্তা চেতনায় সর্বদা ভাঙ্গার গান, তাদের কর্মসূচী শুধুই সমাজকে তছনছ করে দেয়া। তারা মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অসুস্থ্য। এই অসুস্থ্য লোকগুলো সমাজে রোগ ছড়ায়। সরকার সবল হলে রোগ বিস্তার খুব সহজে সম্ভব নয়। তবে গোপনে গোপনে তারা কাজ চালায়। সরকার দুর্বল হলে মহামারীর আকারে রোগটা ছড়িয়ে পড়ে, সমাজের ভীত নষ্ট করে দেয় এ চক্র। এক সময় একটা নষ্ট সমাজে রূপান্তরিত হয় সেই ভাল সমাজটা। এই নষ্ট ও কুচক্রিবাহিনী তাদের প্রতিনিধি পাঠায় রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য। সরকারে তাদের লোক থাকে। সুতরাং তাদের উৎখাত করা অনেক কষ্টের হয়ে দাঁড়ায়। ঘুরে ফিরে তাদেরই বংশধররা এসব দেশের সরকারগুলোতে থাকে। কেউ তাদের বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি বলে তারা তাদের ইচ্ছা মাফিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সুতরাং মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নামলেই কি সার্থক হওয়া যাবে? বিজয়ী হওয়া যাবে? আপনি যখনই নিয়ত করলেন এটা আমার জন্য জরুরী কাজ, মানুষকে তার মর্যাদা ফিরিয়ে দেয়া, তার মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা ঠিক তখনই আপনি জিতে গেলেন। কর্মসূচী নিয়ে আরও যতো এগোবেন ততো আপনার বুকে বল হবে, সাহস বাড়বে। দেখবেন আপনি একা না, সাথে প্রচুর লোক আছে। এরাও চায় সমাজের শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি হোক। এ কাজে যারা অংশ গ্রহণ করছেন তাঁরা দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান।

আমরা যখন একটা বই পড়ি তখন সে বইয়ের প্রধান চরিত্রটাকে ভালবাসতে শুরু করি। পড়া যতো এগোয় ঐ চরিত্রটা আমাকে ততোই আকর্ষন করতে থাকে। এমন হয় যে তার কর্ম সব যেন আমি দেখতে পাই এবং মনে হয় চরিত্রটি আমার কত

www.pathagar.com

দিনের পরিচিত। এরপর এক সময় তার কষ্টে আমরা পাঠকরা কষ্ট অনুভব করি। সে বিজয়ী হলে আমরা খুশি হই। অনেক সময় নিজের অজান্তেই গাল গড়িয়ে চোখের পানি বয়। একটা উপন্যাস পড়তে গেলে এ অবস্থা যেমন হয় তদ্রুপ নাটক সিনেমায় একই অবস্থা দেখা যায়। সিনেমার মূল চরিত্র আমাকে এমনভাবেই আকৃষ্ট করে যে আমরা দর্শকরা তারমতো কথাবার্তা বলার ধরণ আত্মস্থ করে ফেলি। তার পোষাক ও হেয়ার স্টাইলকে পর্যন্ত হুবহু নকল করি। উপন্যাস, নাটক, সিনেমার এ চরিত্রগুলো এতোটাই প্রভাবশালী থাকে যে পরিবারের সদস্যদের কোন বাধা নিষেধ এক্ষেত্রে ম্লান হয়, বিফল হয়। এটাকে 'ইমিটেট' করা বলে। টিনএজ তরুন তরুনীদের মধ্যে এ আচরণটা অপেক্ষাকৃত বেশি। মানুষ ব্যক্তিগতভাবে যেমনই হোক স্টিমুলেশনে তার মানবসত্তা যে জাগ্রত হয় এসব তারই প্রমান। হয়তো সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে অথবা থিয়েটার হল থেকে ফিরে এসে সিনেমার/থিয়েটারের নায়কের মত সাহসী, ত্যাগী ও সৎ জীবনের চ্যালেঞ্জ সে নিতে পারেনি কিন্তু এমন একটা চরিত্র যে আমাদের সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং তা আমাদের এ জাতীয় দুর্যোগেই সবচে বেশি প্রয়োজন সে স্বীকৃতিটুকু তার কাছে থেকে আমরা পেয়েছি। এ স্বীকৃতির খুব প্রয়োজন ছিল। ইমিটেশনের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ মানুষ অপেক্ষাকৃত সহজ কাজটা ইমিটেট করে, কঠিনটা বর্জন করে। সিনেমার নায়ক নায়িকাদের হেয়ার স্টাইল ও পরিচ্ছদ অনুকরণ করা সহজ বলে এটাই অধিকাংশরা করে। তাদের সাহসী, ত্যাগী ও স্বার্থহীন পদক্ষেপগুলো কেউ অনুকরণ করেন না। ব্যতিক্রম তারা যারা ঐ সিনেমার চরিত্র অনুকরণ করে নিজকে পরিশুদ্ধ করবে, সমাজ সংস্কারের কাজে অংশগ্রহণ করবে তারা বাস্তবজীবনে সত্যিকারই 'নায়ক'। তারা তাদের সার্থকতা অর্জন করলেন কাজের বিনিময়ে। নব্বইর সময় বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ এবং পরবর্তী কালে আরও কিছু লোককে এমন চরিত্রে আমরা দেখতে পাই। জাতীয় বিপর্যয়ে এভাবে 'নায়ক' তৈরী হয়। আমরা জতীয় নেতাদের হারিয়েছি, তাদের মূল্যায়নে ব্যর্থ হয়েছি। আজ জাতি নেতাশূণ্য। যারা নেতা দাবী করেন তাদের মধ্যে জাতির জন্য কোন কমিটমেন্ট নেই, তারা সকলের জন্য নেতা নন। পার্টির নেতা আর জাতির নেতা এক কথা নয়। জাতির নেতৃত্ব দানের নেতাকে অনেক বুদ্ধিমান ও আকাশের মত উদার আর হিমালয়ের মত দৃঢ় ও ধৈর্য্যশীল হতে হয়। আমাদের নেতাদের মুখে না আছে সুন্দর, অর্থপূর্ণ বাক্য আর বুকে না আছে মমতা, দরদ ও ভালবাসা। যে যে রাজনীতিই করুক মানুষের প্রতি ভালবাসা না থাকলে জানাজানি হয়ে যায়, মানুষ আস্থা হারায়। যারা সামাজিক ভাবে তাদের মহৎ কাজের জন্য স্বীকৃতি পেয়েছেন তাদের জীবনী বিশ্লেষণে এ জিনিসটাই ফুটে উঠেছে মানব সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের ভালবাসা অপরিসীম। এই ভালবাসার টানটা প্রচণ্ড থাকলে ব্যক্তি স্বার্থপরতাও ম্লান হয়ে যায়। একজন স্বার্থপর ব্যক্তি যদি মানুষকে মানুষ বলে দাম দেন, যদি মানুষের প্রতি তার অগাধ ভালবাসা থাকে তাহলে তার স্বার্থপরতার স্তর ক্রমশঃ নিচে নেমে আসবে। ব্যক্তি জীবনের এই উপাদানগুলোর যেটাকে বেশি চর্চা করা হবে তার জয় হবে। ব্যবহারিক এ দিকটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

www.pathagar.com

সমাজের নেতৃত্ব দানের যোগ্যতা যেমন সকলের থাকে না, সবাই নেতৃত্ব দেয়ও না। নেতৃত্ব দানের গুনাবলী যাদের আছে তারা যদি সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব নেন তাহলে তাদের জন্য সমাজ বিনির্মান যত সহজ হবে একজন নেতৃত্বের গুনাবলী নেই এমন লোকের পক্ষে একাজটা করা মোটেই সহজ হবে না। স্বার্থপর ব্যক্তিরা নিজ স্বার্থ নিয়েই পড়ে থাকবে। না করতে পারবে মানুষের জন্য ত্যাগ আর না থাকবে সমাজের প্রতি তার কোন দায় বদ্ধতা। সমাজ গড়ার কাজ এই সকল নেতাদের জন্য কঠিন। তদ্রুপ যাদের হৃদয়ে ভালবাসা আছে, যারা মানব প্রেমকে সবার উপর স্থান দেন যত সহজে তাদের পক্ষে মানুষের দুর্দিনে পাশে গিয়ে দাঁড়ানো সম্ভব হবে অন্যজনের পক্ষে তা অসম্ভব মনে হবে। কোন কাজকে কারও জন্য কঠিন ও বোঝা স্বরূপ মনে হলে সে প্রথমেই একাজের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে এবং মনে করবে একাজটা আমার জন্য না। ভালবাসতে যারা শেখেনি, যারা মানুষকে তার যথাযথ স্থানে আসীন করার জন্য চিন্তাভাবনা করেনি সে কিভাবে ভালবাসার স্বাদ পাবে। স্বাদতো অবশ্যই আছে নইলে একশ্রেণীর মানুষ পাগলের মতো কেন জীবন বিলিয়ে দেয় অন্য মানুষের জন্য। 'আমার এবং তোমার' মধ্যে যে কোন ব্যবধান করতে শেখেনি তার হৃদয়ে ভালবাসার যে বীজ বপিত হয়ে আজ বিশাল বৃক্ষের আকার ধারণ করেছে তার কাছাকাছি ভালবাসাহীন স্বার্থপর মন কি স্থান পাবে? নেতৃত্বের গুনাবলী অর্জন করে অধিকাংশ লোকই সমাজ পরিচালনা করে। তেমনই ভালবাসার বীজকে নার্সিং করে একে বড় করা সম্ভব। এটা চর্চার ব্যাপার এবং সুনিয়তের ব্যাপার। কারো মধ্যে যদি পরোপকার করার ইচ্ছা থাকে তাহলে সে এজন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হবে। যখন একাজটা করতে গিয়ে সে ক্ষতির মুখোমুখি হবে, হুমকির মধ্যে পড়ে যাবে তখন তাকে যে শক্তি পাশে এসে দাঁড়িয়ে সাহায্য করবে সে হচ্ছে এ ভালবাসার শক্তি। তাকে এ শক্তি এতো সাহস যোগাবে যে সে কোন ছোটখাটো বাধাকে তোয়াক্কা করবে না। আর বড় বাধাকে অতিক্রম করার জন্যও তার মতো মানব প্রেমীদেরকে আহ্বান জানাবে। এ কাজে তার সাথে সহযোগিতা করার জন্য সমাজে একশ্রেণীর লোক সব সময়ে তৈরী থাকে যারা ভাল কাজটা কি তা বুঝে কিন্তু সাহস করে উদ্দোগ নিতে পারেন না। এই শ্রেণীর লোকরা তার কাজে সহযোগিতা করবে।

ভালবাসা সবপ্রাণেই অল্পবিস্তার থাকে। আর তা সময়ে সুযোগে বৃদ্ধি পায়, বিরূপ পরিস্থিতিতে কমে যায়। আমরা যখন একটা হৃদয়বিদারক ঘটনার বর্ণনা দিয়ে কাউকে সাহায্যের কথা বলি তখন যথেষ্ট সাড়া মেলে। মটিভেশনে চেতন ফিরে আসে, নিস্প্রান প্রান ফিরে পায়। দূর্বল সবল হয়। পেছনে পড়ে থাকা জন অগ্রগামী হয়ে যায় মটিভেশনে। এখানেই মানুষের ও অন্য প্রাণীর ভীষণ ফারাক। অন্যান্য প্রাণীকে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একঘেয়েমি কিছু শারীরিক কাজ করানো সম্ভব কিন্তু তাদেরকে দিয়ে ব্রেনওয়ার্ক করানো সম্ভব হয় না। আর মটিভেশনতো খুবই কম নেয়, অনেক সময় একদমই নেয় না। মানুষের মধ্যে এটা খুবই ভাল কাজ করে। সঠিক

সময়ে যথাযথভাবে মটিভেশন চালালে মানুষের মাধ্যমে অনেক কিছুই করানো সম্ভব। এটা বিজ্ঞানের একটা আধুনিক শাখা যেখানে আইনস্টাইন বা নিউটনের থিওরী কাজ করে না অথবা কোন রাসায়নিক ক্রিয়ায় সরাসরি ফল ও এটা না। তবে মটিভেশনের সাথে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কিছু দূরতম সম্পর্ক আছে। যেমন একজন রাগান্বিত, উত্তেজিত লোকের হরমোন অথবা বিভিন্ন জৈবরসের যে আধিক্য থাকে তাকে মটিভেশনের আওতায় আনলে জৈবরসের সে আধিক্য আর থাকে না। এজন্যই দূরতম সম্পর্কের কথা বলা হল। যেখানে ভালবাসার অভাবে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ বাড়ে, হানাহানি বাড়ে, ধ্বংস আর পীড়ন প্রতিদিনের সঙ্গী হয় সেখানে ভালবাসার পাওয়ার হাউসে আঘাত করা ছাড়া উপায় কি? এই পাওয়ার হাউজটা হচ্ছে মানব মন। এখানেই ভালবাসা তৈরী হয়, এখানেই জমা থাকে। এমন কোন হৃদয় কি আছে যেখানে কোন ভালবাসা নেই। না, নেই। যে মানুষ খুন করে তার হৃদয়েও ভালবাসা আছে, সেও কবিতা লেখে, নাতিদের পিঠে নিয়ে সবুজ ঘাসে চক্কর খায়। কতোগুলো ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক বিষয় এমন থাকে যা ঐ মানুষটিকে কোন নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট বিষয়ে অমানুষের পর্যায় নিয়ে যায় এবং তখন সে ঐ অপকর্মটি করে ফেলে, তার লোভাতুর মন-স্বার্থপর মন অন্ধ হয়ে যায়, হিতাহিত জ্ঞান রাখে না সে। মানুষের স্তর থেকে অমানুষের স্তরে না নেমে এলে, কোন পাশবিক আকার ধারণ না করলে তাকে দিয়েতো অসামাজিক ও অমানবিক- ধ্বংসাত্মক কাজ করা সম্ভব না। কোন না কোনভাবে তার হৃদয়ের ভালবাসার স্তর কমে গিয়ে নিঃশেষ হয়ে যায় অথবা ঐ হৃদয়গুদামের কপাট বন্ধ হয়ে যায়। কোনভাবেই সুস্থ মস্তিস্কে ধ্বংসযজ্ঞ খুনখারাবি চালানো সম্ভব নয় একজন মানবপ্রেমী মানুষের পক্ষে। যারা ছোটখাটো ব্যক্তিপর্যায়ে বা বড়সড় রাষ্ট্রীয় কিংবা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যুদ্ধ বিগ্রহের সূচনা করেন, নেতৃত্ব দেন তাদের মানুষের প্রতি ভালবাসার পরিমান কতটুকু তা মাপা আমাদের পক্ষে মোটেই কষ্টের না। নানান অজুহাতে নিজেদের স্বার্থরক্ষায় আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে যারা বিশ্বজুড়ে তাণ্ডব করেন তা তথাকথিত গণতন্ত্র সম্প্রসারণের নামে হোক কিংবা ধর্মের নামে হোক কোনটাই গ্রহণযোগ্য নয়। এ বিষয়গুলোকে খুব ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনায় আনতে হবে। ধর্মের নামে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালানো, বোমাবাজি করে নিরীহ মানুষকে খুন করা যেমন কোন ভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না তদ্রুপ বায়োলজিক্যাল উইপনের নামে ইল্লজিক্যাল তথ্যসম্প্রচার করে একটার পর একটা দেশে যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়া কোন ধরণের মানবিক ব্যাপার, কোন ধরণের গণতান্ত্রিক চর্চা জাগ্রত বিবেকই বলে দিতে পারবে। আব্রাহম লিংকন এহেন গণতন্ত্রের অবস্থা দেখলে কি বলতেন কে জানে! খুব খুশী হতে পারতেন বলে মনে হয় না। সুতরাং যে প্রানে ভালবাসা আছে সেই প্রান আরেক প্রান হরণ করতে পারে না। হয় এ প্রাণের ভালবাসার স্তর খুব দ্রুতই কমে গেছে বলে মনে করতে হবে নয়তো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড তাকে এতদূরই উৎসাহিত ও অনুপ্রানিত করেছে যে মানবিক সব দিকটুকু সে হারিয়ে ফেলেছে। অনেকেই নির্যাতিত হয়ে প্রতিশোধ মুখর হয়ে ওঠে, তখন তাদেরকে অসহায় অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার

www.pathagar.com

জন্য আইনবিরোধী কাজে অংশ নিতে দেখা যায়। এখানেও কথা থাকে। সব কিছুরই বৈধ পথ আছে। কোন জনবসতিতে লোকজন নির্যাতনের শিকার হলে তারা যদি গঠন মূলক প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও আন্দোলনের আশ্রয় নেয় এবং তাদের বক্তব্য সবার সামনে যৌক্তিকভাবে তুলে ধরতে পারে তবে আশা করা যায় সে আন্দোলনের সুফল তারা পাবেই। প্রয়োজন শুধু এটুকু বুঝার যে, যে মানুষের মুক্তির জন্য আমার এ আন্দোলন সে আন্দোলন কি-না আবার অন্য মানুষের ব্যাপক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মানুষকে প্রধান বিবেচনায় আনলে এবং নিরপেক্ষ পর্যালোচনা করলে অবশ্য এই অন্ধকার পথটা থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব। বাস্তব অর্থে এমনটা কি কখনো করা হয়? সাম্প্রদায়িক, স্বার্থবাদী, একপেশে, একগুয়ে দর্শন, চিন্তাচেতনা কি আমাদের এসব ক্ষেত্রে আচ্ছন্ন করে রাখে না? সব দর্শনের লোকদেরই দেখলাম একটা স্তরের পর তারা আর উদার হতে পারেন না, আর মহৎ হতে চান না তারা। অথচ চাহিদা কত বড় ধরনের। আমাদের এ পশ্চাদপদ সমাজকে ঝাঁকুনি দিয়ে মুহূর্তেই সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। প্রয়োজন হবে অনেক মানুষের, অনেক দিনের পরিকল্পিত শ্রম। সমাজের সকল স্তরের মানুষ ভেদাভেদ ভুলে সুনির্দিষ্ট দু'একটা টার্গেটে কাজ করলে ফললাভ অবশ্যই সম্ভব। উদারতা, মহানুভবতা, সহিষ্ণুতা আর ধৈর্য্যের কোন বিকল্প নেই। এসবকিছুই মূলতঃ ভালবাসার মতো গুনাবলী থেকে উৎসারিত, সন্দেহ নাই। মানুষের প্রতি ভালবাসার অভাব থাকলে তাদের কাছ থেকে ঐসব উদারতা, মহানুভবতা, দয়ামায়া ও সহিষ্ণুতা আশা করা যায় না। কার জন্য এ বিশ্লেষণ? মানুষের জন্যই তো মানুষ? সেই মানুষকেই যে বিবেচনায় আনতে ব্যর্থ হল, সেই মানুষকেই যে তুচ্ছজ্ঞান করলো, ভালবাসতে অস্বীকার করলো তার কাছ থেকে কি আশা করা যায়। সমাজের মূল অঘটনটা তারাই ঘটায় যারা অবিবেচক, যারা স্বার্থপর ও প্রতিশোধপরায়ণ। ক্ষমার দুয়ার যাদের কখনো খোলা হয় না তারাই প্রতিশোধ পরায়ন হয়। আর এই শ্রেণীর মানুষরা সমাজের ক্ষতি করেই চলছে। তাদের অনেক গুণাবলী থাকে বটে, তারা সমাজ বিনির্মানে অংশ নিয়ে সুনামও কুড়ায় প্রচুর। কিন্তু তার এ সকল কার্যাবলীর উদ্দেশ্য থাকে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা, তাই অন্যদের সাথে কোন এক সময় সংঘর্ষ লেগে যায়। তার ইগো সর্বাগ্রে প্রাধান্য পায় বলে সে আর কারও মত সহ্য করতে পারে না। প্রয়োজনে সকল আয়োজন ভন্ডুল- নিস্ফল হোক, সকল মানবতা পদদলিত হোক তবুও তার ইগো জায়গাতেই আছে, থাকবে। মানবতার কতটুকু সর্বনাশ হল তা দেখার দায়িত্ব তার না, তার দেখার বিষয় হচ্ছে তার পদমর্যাদা বাড়ল না কমল, তার দেয়া ফর্মুলায়ই সমাজের উন্নতি হয়েছে কি-না ইত্যাদি।

মানুষের সমাজে মানুষই শান্তি আনবে, আনতে পারে। এজন্য প্রয়োজন সমাজের অন্যসব মানুষের মানবীয় বিষয়গুলোর পূর্ণ বিকাশ। এ বিকাশে মূল ভূমিকা পালন করছে রাষ্ট্র বা সরকার আর সহযোগির ভূমিকা পালন করবে জনগণ, বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা। কোন সমাজে হঠাৎ করেই মানবিক ব্যাপারগুলোর যথেষ্ট উন্মেষ

www.pathagar.com

ঘটে না অথবা হঠাৎ করেই ভালবাসার সয়লাবে পুরো জনগোষ্ঠি জেগে ওঠে না। সবকিছুর চর্চার মতো এরও চর্চার প্রয়োজন। কোন সমাজে ভালবাসার চর্চা চলতে থাকলে সেটা জাতিগত ও কৃষ্টিগত একটা ঐতিহ্যে পরিণত হবে এবং পরবর্তী বংশধররা তা সংরক্ষণে যথেষ্ট আন্তরিক হবে। কারণ যখন কেউ পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া কোনকিছুর মাধ্যমে উপকৃত হয় সে তা উপভোগ করে এবং তার মধ্যে এক ধরণের দায়বদ্ধতার সৃষ্টি হয় ঐ জিনিসকে পরবর্তী বংশধরদের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যাপারে। এভাবেই ভালবাসার রসে যে প্রাণ সিক্ত হবে, পাবে এক উন্নত জীবন সে তার পরবর্তী বংশধরদের জন্য রেখে যাবে আরও বিশাল ভালবাসার ভান্ডার। এভাবে কৃষ্টিগত ভাবেই ভালবাসা জনে জনে ছড়াতে থাকবে। সমাজে এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না যে কোন না কোনভাবে ভালবাসার বহিঃ প্রকাশ না ঘটাচ্ছে। ঈদের সময় আমরা একজন ভিক্ষুককেও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি অন্যকে সাহায্য করার জন্য, ভিক্ষা দেয়ার জন্য। যার হৃদয়ে ভালবাসা আছে, মানুষের কষ্টে যে আপ্লুত হয় তার নিজের যতো বেদনাই থাকুক না কেন সে অন্যের বিপদকে প্রাধান্য দেয়, অন্যের স্বার্থ সংরক্ষণে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সুতরাং দায়িত্বটা এসে পড়ছে আমাদের উপর যারা জীবিত আছি। যারা মরে গেছেন তাদের সমালোচনা করতে আমরা যতোটা পারঙ্গম, যারা অনুপস্থিত তাদের বেলায় আমরা যতোটা আন্তরিকভাবে গীবত করি নিজেদের দিকে ততোটা তাকাই না। আমাদের এখন উচিৎ নিজেদের সমালোচনায় মেতে ওঠা। আমার নিজ হৃদয়ে ভালবাসার ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করা। পাশের লোকটিকে এমনভাবে ভালবাসার মায়ায় আবদ্ধ করব যাতে একটা উদাহরণ হিসেবে সমাজ গ্রহণ করে। সমাজের আর দশজন যেন এটাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করে, নিজেরাও মানুষকে ভালবাসতে শুরু করে। মানুষের বিপদে আপদে দুঃখ কষ্টে নিজের সকল পুঁজিসহ এগিয়ে আসা সামাজিক দায়িত্ব, সবচে বড় ইবাদত। এ বুঝটুকু মানুষের মধ্যে চলে আসলে আমরা আর পিছিয়ে থাকব না। যারা সমাজকে ধ্বংস করার কাজে ব্যস্ত তারাও এক সময় ভালবাসার এ নব তরঙ্গে দুলতে থাকবে। মনে হবে মানুষকে ভালবাসি, ভালবাসায়ই মানবপ্রেম নিহিত। আর মানবপ্রেমই সবচে বড় অর্জন।

সরকারী বেসরকারী পর্যায়ের নীতি নির্ধারকরা যারা পরিবেশের শিকার হয়ে দুর্নীতিতে পা বাড়িয়েছিলেন তাদের একটা সুযোগ হবে সে পথ থেকে ফিরে আসার। যারা কখনোই চাননি সাধারণ মানুষের হক নষ্ট করতে। সরকারী পর্যায়ের দুর্নীতি যে সমাজে কি অরাজগতার সৃষ্টি করতে পারে তা আমরা সচক্ষেই দেখলাম। গণতন্ত্রের পতাকার নিচেই এসব কর্মকাণ্ড হয়েছে। মানুষ সবই টের পেয়েছে, বুঝেছে। একবার ভোট দিয়ে নেতা নির্বাচন করার ছ'মাস পর নেতার দুষ্ট চরিত্র টের পেলেও ভোটদাতার কিছু করার থাকে না। তাকে অপেক্ষা করতে হয় আরও সাড়ে চার বছর। তাই ভোটদাতাকে অবশ্যই সঠিকপাত্রে ভোটটা দিতে হবে। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এরচে বড় কিছু নেই। সকল ভয় ডরের ও ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে জাতীয় স্বার্থে

www.pathagar.com

সঠিক ব্যক্তিকে ভোট দেয়া প্রয়োজন, কোন আলসেমী এখানে গ্রহণযোগ্য নয়। সকল ধরণের লোভ ক্ষোভের উর্ধ্বে উঠে একটা সুন্দর সমাজ গড়ার প্রত্যাশায় যেখানে মানুষই হবে প্রধান বিবেচ্য এবং মানুষকে তার জীবন ফিরিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি থাকবে সেখানেই ভোটটা দিতে হবে। যাদের হৃদয়ে ভালবাসা নেই, যারা প্রতারক, যারা ধর্ম, গণতন্ত্র, মানবতার দোহাই দিয়ে মানুষকে ফাঁকি দেয়, শুধুই নিজের ও নিজস্ব বলয়ের স্বার্থ দেখে তাদের চিহ্নিত করা একজন ভোটারের মৌলিক দায়িত্ব। যদি আপনার পছন্দসই প্রার্থী না পান প্রয়োজনে ভোটদানে বিরত থাকুন। প্রকাশ করুন কেন ভোট দিতে যাননি। আপনার মতোই অধিকাংশ ভোটার মনে করেন যে, আমার নির্বাচনী এলাকার প্রার্থীরা সাংসদ হবার অযোগ্য তাদের প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষাতো নেই-ই সামাজিক দায়বদ্ধতা নেই, মানবিক মূল্যবোধ শূন্যের কোঠায়। তাদের কেউ সংসদে গেলে সংসদই কলুষিত হবে, সন্ত্রাস রাষ্ট্রীয় রূপ নেবে। অতএব প্রয়োজনে ভোটদানেই বিরত থাকুন। ভালবাসার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করুন। কিছু ভাল মানুষ মনে করেন তাদের সাপোর্টার নেই, নির্বাচনে গেলে ভরাডুবি হবে, জামানত বাযেয়াপ্ত হবে। কথাটা ঠিক না। ঐসব উত্তীর্ণ লোকদের সাথে অনেকেই থাকবে। তারা জানেন না তাদেরকেই জনগণ চান। সাহস করে নিজেকে সামনের কাতারে নিয়ে আসতে হবে। জনপ্রতিনিধি হলে আপনি আপনার ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ আরও সুন্দরভাবে ঘটাতে পারবেন।

মানবিক মূল্যবোধের অভাব যেমন সমাজে রয়েছে তেমনি এর অবক্ষয়ও আমাদেরকে পীড়া দিচ্ছে। আজ ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন কোন রকম চালিয়ে নিলেও সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন যেন কোন ভাবেই চালানো যাচ্ছে না। রাস্তাঘাটে, বাসে-ষ্টেশনে, হাটবাজারে, অফিস আদালত, স্কুল কলেজ মাদ্রাসায় অমানবিক বিষয়ের আধিক্য ও পাশবিক দিকগুলো অহরহ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। দুর্নীতি ও অমানবিকতাকে প্রশ্রয় দিতে দিতে এখন এটা মহীরূহের আকার ধারণ করেছে। সবাইকে অক্টোপাসের মতো আগলে ফেলেছে। অসাধারণ শক্তিশালী এ মানবিক মূল্যবোধহীন প্রগতি। সমাজপতিরা বেখেয়াল, হুশহীন। গৃহপরিচারিকার সাথে খুব সকালে গৃহকর্তীর নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ দিয়ে আপনার যে সকালের শুরু হয় সেটা শেষ হয় আপনার ছেলের দেরীতে বাড়ি ফেরাকে কেন্দ্র করে নিচের দাড়োয়ানের সাথে দুর্ব্যবহার ও গালাগাল শোনার মাধ্যমে। এর সাথে আপনি হাজারো অমানবিক দৃশ্য দেখেন। নিমাই স্যারের প্রেম প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে ইংরেজীতে ফেলের পর সঈদার আত্মহত্যার দৃশ্য দেখেন, চাঁদা না দেয়াতে ব্যবসায়ীর জবাই করা মৃতদেহ দেখেন, নিরীহ পথচারীর উপর পুলিশের লাঠিচার্জ দেখেন, মসজিদের সামনে ভিক্ষুককে ধাক্কা দিয়ে ড্রেনে ফেলে দিতে দেখেন, মসজিদের ভেতরে বেখেয়ালে মোবইল বেজে ওঠার জন্য গালি দিতে দেখেন একজন পরহেজগার মুসুল্লীকে, সিট ভাড়া পুরোটা না দিতে পারায় হোটেল ব্যবসায়ীকে জনৈক তজিমুদ্দিনের দামী মোবাইল

সেটটা রেখে দিতে দেখেন, আবার ভোররাতে পুলিশ ভাইদেরকে বিশেষ কোন হোটেলে হামলা করতে দেখা যায় অসামাজিক কার্যকলাপের জন্য, তাদের হোটেল মালিকের কাছ থেকে বিশাল অংকের টাকা নেয়ার দৃশ্যও আপনাকে দেখতে হয়। এরপরই সাংবাদিক ভাইরা পুলিশের ঘুষ খাবার সচিত্র প্রতিবেদন পত্রিকায় ছাপানোর হুমকি দিয়ে একটা অংশ নিয়ে নেন। এর কোন অংশটুকু আপনার কাছে নৈতিক বা মানবিক? এ দৃশ্যগুলো আপনাকে প্রায়ই দেখতে হয় ও হজম করতে হয়। স্ত্রী পুত্র রেখে বছরের পর বছর বিদেশে টাকা কামাইর নামে যে প্রবাসী ফুর্তিতে মেতেছে তার স্ত্রী সন্তানের টিউটরের সাথে রং তামাসায় মত্ত। ছেলের চোখের সামনে এমন দৃশ্য তাকে আহত করে করে এখন বিপথগামী করতে শুরু করেছে। ঐ হাউজ টিউটরের বড় মেয়ে ভালছাত্রী, প্রেমছলনায় ছেলেদের নাচাতে গিয়ে এসিড ভিকটিম হয়েছে, ঝলসে দিয়েছে বখাটেরা সুন্দরমুখটি। এসব অসামাজিক ও মানবতাবিবর্জিত কাহিনী যেমন আপনার একই দিনে শুনতে হয় আর বিভৎস দৃশ্যগুলোও আপনাকে দেখতে হয়। অফিসে একই অবস্থা। বসদের নির্যাতন চরমে পৌঁছে গেছে। যারা তোষামোদী করে তাদের প্রশংসা, তাদের সাথে ভাল ব্যবহার ও বসিয়ে চা খাওয়ানো আর যারা কাজ করে করে ক্লান্ত তাদের সাথে রূঢ় আচরণ, দায়িত্বহীনতার সোকজ ইত্যাদি। মুখের উপর ফাইল ছুড়ে মারা 'সামান্য কাজটা করতে এতোদিন লাগে'? অথচ ফাইলে প্রয়োজনীয় কোন দলীল দস্তাবেজই নেই। ঘুষের জোরে পার করে দিতে হবে। সরকারী অফিস আদালতে এমন সব মানসিক নির্যাতন শুধু বসরাই জুনিয়র অফিসার বা কর্মচারীদের সাথে করেন না- কর্মকর্তা কর্মচারীরা সবাই মিলে দর্শনার্থীদের সাথে করেন। যে কাজগুলো সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছে সেগুলোর প্রতি যথাযথ গুরুত্বারোপ না করে ঐ ফাইলগুলোর যারা মালিক তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করেন। আর মন্ত্রণালয়ের এসব সিদ্ধান্তের উপর রাষ্ট্রের লাভ ক্ষতি অনেক কিছু নির্ভরশীল। কাজেই কোন সিদ্ধান্ত দিতে যদি ব্যক্তিগত স্বার্থ কাজ করে অথবা দীর্ঘসূত্রিতার খপ্পরে পড়ে যায় ফাইল তাহলে শুধু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিই ক্ষতিগ্রস্থ হয় না, ক্ষতিগ্রস্থ হন রাষ্ট্র এবং জনগণ। এসব অমানবিক বিষয়াদি দিনভর আপনাকে দেখতে হয়। জাতির সর্বশেষ বিদ্যাপিঠে যখন ফলাফলটা নির্ভর করে বিভাগের চেয়ারম্যানের রাজনৈতিক দর্শনের সাথে ছাত্রছাত্রীদের রাজনৈতিক দর্শনের মিলের উঁপর, মেধার উপর আদৌ নয় তখন এরচে আমানবিক দিক আর কি হতে পারে! বিডিআর শপে লাইন ভাঙ্গার দায়ে বৃদ্ধকে ধাক্কা মারলো যে জোয়ান তার বাবা কি বেঁচে নেই? লেফট রাইট কি বিগত তিন বছরেই তাকে এ পর্যায়ে নিয়ে এসেছে? আপনার দিনভর এসব দৃশ্য দেখে ও রাতে ঘরে ফিরলে কি দেখতে হবে সে আতংকে আর ঘরে ফিরতে ইচ্ছে করে না। এক প্রকার বিষন্নতা এজন্য আপনার মধ্যে কাজ করছে। আপনার পর্যালোচনায় আরও ধরা পড়েছে এই যে, এ অমানবিক কাজগুলোর সাথে শিক্ষিত লোকরাই বেশি জড়িত। অশিক্ষিতরা ধাক্কা খাচ্ছে, বকা খাচ্ছে আর নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। অপেক্ষাকৃত শিক্ষিতরা আঘাত করছে, গালমন্দ করছে ও নির্যাতন চালাচ্ছে। কোন দয়ামায়া ভালবাসা মানুষ নামক

www.pathagar.com

প্রাণীর জন্য এদের নেই। নিজের জাত পরিচয় সবটুকুই এরা ভুলে গেছে। জ্ঞাতি, গোষ্ঠি, বংশ সম্প্রদায় তাদের কাছে কিছু না। তারা শুধুই অর্থের অন্ধ প্রতিযোগিতায় মেতে আছে। 'টাকা দ্বিতীয় ভগবান' এ বাণী তাদের মাথা খারাপ করে দিয়েছে। তাই যেভাবেই হোক প্রচুর টাকার মালিক হওয়া চাই-ই চাই। রাষ্ট্রের উপরের পর্যায়ের লোকরাও এ ব্যাপারে নীরব কারণ তাদেরও অনেকে তো ভালবাসা দয়ামায়াহীন মানুষ। প্রমাণ দেয়ার কি দরকার আছে? মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের নামে বেনামে অঢেল সম্পদের বিবরণই কি এজন্য যথেষ্ট না উদাহরণ হিসেবে? নানান জাতের কষ্ট জ্বালা যন্ত্রনা নির্যাতন নিষ্পেষণের মধ্য দিয়ে চলে যাচ্ছে আমাদের জীবন। জীব বলেই আমাদের একটা জীবন আছে। বাস্তবিক অর্থেই কতটুকু উপভোগ করি আমরা জীবনকে তা জনে জনে জিজ্ঞাস্য। সীমাহীন দুঃখ দুর্দশাকে সঙ্গী করে আমাদের বেঁচে থাকা, পরিত্রানের কোন উপায় নেই, নেই কোন আশু সমাধান। জন্মের পর থেকে যে অবর্ননীয়, অসহনীয় কষ্টক্লেশ শুরু হয়েছে তার শেষ কোথায় কেউ জানে না। কেবল অর্থনৈতিক কষ্টই না, শুধুমাত্র ক্ষুধার যাতনাই না, রোগ ভোগে চিকিৎসা না পাবার বেদনাই না, বহু জাতের কষ্ট প্রতিনিয়ত আমাদের চারপাশে ভীড় করে। পরিবেশ ভীষণভাবে দূষিত। সামাজিক এ পরিবেশ দূষণ নিয়ে কারও মাথা ব্যাথা নেই। ধনী গরীব নির্বিশেষে সকলেই এ অভিশাপের শিকার। শিক্ষিত অশিক্ষিত কে আছে যার কষ্ট নেই, কে আছে যে বিনিদ্র রজনী কাটায় না? চাকরিজীবী- বেকার কে এমন আছে যে তার শিক্ষাদীক্ষা সামাজিক স্বীকৃতিতে সন্তুষ্ট? বাবা-মা, ভাই-বোন ও আত্মীস্বজনদের কে এমন আছে যে অন্যের উপর তার আচরণ, দায় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সার্থক বলে দাবী করতে পারেন? সমাজের কোন পেশার লোকরা দাবী করতে পারবেন তাদের সার্ভিস দেশবাসীর জন্য একশভাগ কল্যাণকর, খাদহীন। তারা সকল মানুষের জন্য সবকিছুর ঊর্ধ্বে উঠেই সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। সাংবাদিক, পুলিশ, চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ, আইনজীবীসহ অন্যান্য সরকারী বেসকারী বিভিন্নপদের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ কি এ দাবীটুকু করতে পারেন যে তিনি কখনো কাউকে কষ্ট দেননি, তার কাছে আগত গ্রাহকরা সকলে সম্মানের সাথে সেবা পেয়েছেন। নিজের অপারগতার কারণে কি দুঃখ প্রকাশের চর্চা গড়ে উঠেছে আমাদের সমাজে? আমরা কি নিজের কষ্টটা নিজেই বাড়াচ্ছি না এ প্রশ্নটা কি একজন শিক্ষিত মানুষ হিসেবে আমাকে আমি করেছি কখনো? করিনি। আমি যে মুহুর্তে কোন মানুষের কষ্টের কারণ হই, যে মুহুর্তে আমার মাধ্যমে কেউ ক্ষতিগ্রস্থ হয় অথবা আমার সিদ্ধান্ত যখন সমাজ বা দেশের ব্যাপক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় সে মুহুর্তেই আমি আমার নিজের কষ্ট, দুঃখ, দুদর্শা, যন্ত্রণা হতাশা আর ধ্বংস ডেকে আনি। কষ্ট ও যাতনা বালিশ খেলার মত জিনিস যা কেউ ধরে রাখতে চায় না, সব সময়ই 'থ্রো' করার চেষ্টা করে। যে মুহুর্তে আমার হাতের বালিশ অন্যের হাতে 'থ্রো' করলাম বুঝতেই হবে ও বালিশ আমার কাছে দ্রুত ফেরৎ আসবেই এবং তাই হয়। আর আমি যখন কোন ব্যক্তির মনোকষ্টের, দুঃখ যন্ত্রণার কারণ হই, আমি যখন সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে সামাজিক শান্তি নষ্ট করি এবং মানুষের ঘুম কেড়ে

www.pathagar.com

নেই তখন আমার জন্যও এমন একটা কঠিন পরিস্থিতি আগমনের অপেক্ষা করে। এটা ইতিহাসের শিক্ষা। ইতিহাস থেকে এ শিক্ষাটা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। আমার সৃষ্ট সকল অপকর্মের দায়ভার আমাকে নিতে হবে এবং নিতে হয়। সুতরাং জ্ঞানী ব্যক্তিরা কখনো মোহাবিষ্ট হয়ে যান না, সবকিছুর লোভে অন্ধ হয়ে পথ হারান না। তাদের একটা হিসাব থাকে। তারা সাধ্যের বাইরে পরিকল্পনা করেন না, টার্গেট নির্ধারণ করেন না। তারা সংযমী হন, অন্যকে শ্রদ্ধা করেন, অন্যকে প্রাধান্য দেন। নিজের কষ্টার্জিত অর্থ অন্যকে দেন যদিও তার সংসারে থাকে অভাব। এদের কোন মনপীড়া থাকে না। সীমাহীন মনোবল নিয়ে তারা সমাজে চলাফেরা করেন। সততাই তাদের নৈতিক ভিত্তি। সমাজের সকল মানুষকে তারা ভালবাসেন ও শ্রদ্ধা করেন। 'মানুষ' নামক জীবের কোন অসম্মান নয়, কোনকিছুতে তার শোকভোগ বাড়ুক তা তিনি বরদাশত করতে পারেন না। তাই নিজেকে সমাজের সামনে একজন মানবপ্রেমী হিসেবে তিনি উপস্থাপন করেন। তার সবকিছুর পেছনে একটা মটিভ কাজ করে, আর তা হচ্ছে 'মানবকল্যাণ'। মানবকল্যানের জন্য এই মানবপ্রেমীরা এতো বেশিকিছুই করতে পারেন যা অবিশ্বাস্য। আমি পারি না বলে অন্যকেও সন্দেহ করি যে 'নিজেরটা কেন অন্যকে দেবে মানুষ'? দেবে এজন্য যে, আমরা সকলে একই স্রষ্টার সৃষ্টি। আমার সম্পদ আল্লাহর পক্ষ হতে আমার কাছে আমানত। মানুষের প্রয়োজনে অর্থাৎ মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তির জন্য কতোটা ব্যয় হল এ সম্পদ তা দেখাই আল্লাহর উদ্দেশ্য। মানুষকে ভালবাসার জন্য আল্লাহ মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন। সমাজে ঝগড়া ফ্যাসাদ ও অনাচার সৃষ্টি থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। সমাজে শান্তি, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও তা বজায় রাখার জন্য সার্বিকভাবে চেষ্টার নির্দেশ দিয়েছেন। মানুষের প্রয়োজনে, মানুষকে ভালবেসে তাদের মুক্তির জন্য নিজের অর্থ সম্পদ বিলিয়ে দিতে, সন্তান সন্ততির মায়া ভুলতে এমনকি নিজের জীবনকে উৎসর্গকরে দিতে ও উৎসাহিত করেছেন। কখনও নির্দেশও দিয়েছেন।

সকল ধর্ম গ্রন্থেই শান্তি আর ভালবাসার কথা আছে। মানুষকে মানবপ্রেমী হতে শেখায় সকল ধর্ম গ্রন্থ। আমরা যারা ধর্মে অনুসারী তারা কখনো অপব্যাখ্যা করি, নিজের মনগড়া বিশ্লেষণ করি। অনেক সময় অতি উৎসাহ প্রকাশ করি বলে ধর্মকে আজ অনেকেই সেকেলে ব্যাপার স্যাপার বলে বিবেচনা করছেন। যে যে ভাবেই দেখুক না কেন আমাদের মানুষের কল্যাণে ধর্মগ্রন্থ হোক আর মানুষের লেখা কোন পুস্তকই হোক যখন যেটার প্রয়োজন হবে আমরা সেটাই গ্রহণ করব। এ ব্যাপারে কোন রকমের সংকীর্নতা প্রদর্শণ করব না। জ্ঞান যেখানেই থাকুক, মানব কল্যাণে যার ভাষণই হোক গ্রহণ করতে আমরা বাহানা খুঁজবো না। আমাদের টার্গেট হচ্ছে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ কমানো। মানুষের উপর থেকে মানুষের প্রভুর মতো আচরণের মূল্যোৎপাটন। একাজটা না করতে পারলে এক শ্রেণীর লোকদের দাস হিসেবে রেখে মুখে মুখে শুধু সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের কথা বললে সে সমাজে কোনদিনই সুখশান্তি বিরাজ করবে না।

আমরা যদি মানুষকেই শ্রেষ্ঠজ্ঞান করি এবং মানুষের কল্যাণের কথাই সর্বদা বিবেচনায় রাখি তাহলে খুব দ্রুতই তাদের প্রতি ভালবাসা ও দয়ামায়ার প্রসঙ্গটা চলে আসে। আরও আসে মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতি, আসে তাদের পেশার নানান দিক। আমাদের আশেপাশের জনবসতিতে আমরা অধিকাংশ মানুষকেই মানবেতর জীবনযাপন করতে দেখি। তাদের সে অবস্থাটা কোন মানদণ্ডেই সুস্থ না, স্বাস্থ্যকর না।

আমরা যারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পেয়ে শিক্ষিত হয়েছি, উচ্চ শিক্ষাও গ্রহণ করেছি, নানান প্রক্রিয়ায় টাকা পয়সা উপার্জন করে ধণিক শ্রেণীর সদস্য হয়েছি, যাদের বাথরুমে লালটেপ খুললে শীতে গরম পানি বেরোয় আর সেই পানিতে অজু করে আমরা যারা নামাজ পড়ি তারা কখনোই খোলা আকাশের নিচে শুয়ে থাকা মিনতি টানা কিশোর অথবা রায়ের বাজারে অগ্নিভস্ম বস্তিবাসীর কথাটা বুঝব না। যতোটুকু বুঝি সেটা তার অবস্থাকে উপলব্দির জন্য যথেষ্ট নয়। শহরের এই ভাসমান লোকদের যেমন কষ্ট আছে তেমন আছে গ্রামের কৃষক, জেলে ও অন্যলোকদের কষ্ট। মুখ আছে, পেট আছে, কাজ নেই-ভাত নেই। চলমান সময়ে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়াতে মধ্যবিত্ত ও ধনী পরিবারগুলোই হিমশিম খাচ্ছে। গরীবরা করছে কি, খাচ্ছে কি-ভাবতে আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসে, কাঁন্না পায়, শরীর অবস অবস লাগে এবং ক্লান্ত হয়ে একসময় ঘুমিয়ে পড়ি। আহ্! একি জীবন মানুষের। এ কেমন পেশা!

রিক্সাওয়ালা। তারই মত অন্য মানুষদের রিক্সায় বসিয়ে টেনে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। ক্লান্ত শরীর-তাকে প্যাডেল মারতেই হবে, গন্তব্যে তাকে পৌঁছতেই হবে। রাস্তার পাশের খিচুরী খাওয়াতে পেট মোচর দিয়ে টয়লেট পাচ্ছে, ডিসেনট্রি হয়েছে। টয়লেট করতে হবে। বলার উপায় আছে? ভাড়ার পয়সাতো মিলবেই না বরং দু'চারটা চর থাপ্পর খাবার সম্ভাবনা আছে। তার এ পেশার কারণে সে আমাকে সম্বোধন করবে 'স্যার ও আপনি' বলে আর আমি তাকে 'তুই' বা 'তুমি' বলে সম্বোধন করব। আপনি যারা বলেন তারা রিক্সাওয়ালার প্রতি কেউ করুনা করেন, খুব কম লোকই ভদ্রতার কারণে আপনি বলেন। এখানে বয়স একটা ফ্যাক্টর। বয়স্ক রিক্সাওয়ালাদের 'তুমি' 'তুই' বলতে দেখলে খুবই কানে আটকায়। এই 'তুমি' 'তুই' শব্দ প্রয়োগ তুচ্ছার্থে ও অশ্রদ্ধার কারণে হয়। এই রিক্সাওয়ালাকে আপনি বললে আমার কি অসুবিধা হতে পারে? কিছুই না। প্রথমদিকে রিক্সাওয়ালারা অবাক হতে পারে এ কারণে যে সব আরোহী কি পাগল হয়ে গেল। নইলে হঠাৎ করে তারা আমাদেরকে আপনি সম্বোধন শুরু করলো কেন। আসলে সম্বোধনটা হচ্ছে শুরু, তাই এর গুরুত্ব। সেটা যে কোন লোকের সাথেই হতে পারে। ঘাটকুলি, শ্রমিক, নৌকার মাঝি যে কোন লোককেই আপনি বলাতে তার মানসিক অবস্থা আর 'তুমি', 'তুই' বলাতে তার মানসিক অবস্থাটা একই পর্যায়ে থাকে না। পরবর্তীতে তার পেমেন্ট নিয়ে আপনার সাথে মনমালিন্য হবে কিনা জানি না তবে 'আপনি' সম্বোধনে আপনি তার কাছে একজন ভদ্র ও সালীন মানুষ বিবেচিত হলেন এতে সন্দেহ নেই। আমরা চেয়ারের কারণে পদের কারণে আমাদেরচে

বয়সে অনেক ছোট এমন লোকদের অহরহ আপনি বলে সম্বোধন করছি, তাদের চোখে চোখ পড়লেই অহেতুক হাসি বিনিময়ের চেষ্টা করছি এমনকি তোষামদি করার জন্য ভাড়াটে লোক পর্যন্ত রাখাছি। কাজেই বয়স এখানে ফ্যাক্টর না, ফ্যাক্টর এটিচুড বা দৃষ্টিভঙ্গির। আমরা তাদেরকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখি বলেই, 'এরচে আর বেশি কি পাবার আছে এই শ্রেণীর লোকদের' এমনটা ভাবার কারণেই সম্বোধনটা আপনি দিয়ে হয় না। আপনি বলাটাকে অনেকেই বাড়াবাড়ি মনে করবেন। আমরা যদি আমাদের অভাবের এদেশটাতে এই গরীব ও অসহায় সম্প্রদায়ের লোকদেরকে যাদের 'তুমি' বা 'তুই' সম্বোধন করে আসছি সবাই আপনি বলে সম্বোধন করি তাহলে কি এটাকে অর্জন বলা যাবে না? অবশ্যই যাবে। এভাবে ভাগ্যাহত মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য সৌভাগ্যবান মানুষেরও প্রচুর কাজ করার আছে। সমাজের ধনীক শ্রেণীরই কেউ কেউ যদি এই নেতৃত্ব দানে এগিয়ে আসেন তাহলে কাজটা সহজ হবে। যখন মানুষের মনের দুয়ার খুলে যায়, যখন মানুষ উদার হতে শেখে তখন আর কোনকিছুতেই কিছু যায় আসে না। মানবিক দুর্বলতাই কেবল না, পাশবিক দিকগুলোরও পরিসমাপ্তি ঘটে। দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন হলে তাকে ঠেকাবে কে! আমাদের দেশে এই ভালকাজের প্রতিযোগিতা নেই। একটা সামাজিক বিপ্লব না হলে সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা পাবে না। চাইতে হবে, অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্রতিবাদের ভাষার ভিন্নতা থাকলেও প্রতিবাদতো করতেই হবে। যার জন্য আপনি প্রতিবাদ, প্রতিরোধ করছেন, অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করছেন তাকে জানতে হবে কি হচ্ছে-কেন হচ্ছে। বেতন বোনাস বন্ধ হয়ে গেলে কাজ করা যায় কিনা। আবেগের বদলে যুক্তি দিয়ে পথ চলার জন্য উৎসাহিত করতে হবে গরীব ও ধনী দুই শ্রেণীর লোকদেরকেই। তাই এ লক্ষ্যে যারা কাজ করছেন চিন্তাভাবনা করছেন তাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। পরিকল্পনা করতে হবে কাজের। একজন রিকশা চালক হোক বা একজন কৃষক হোক মৌলিক কিছু চাহিদা মানুষ হিসেবে সকলেরই থাকে। এমনকি আরও দুর্বল ও অক্ষম মানুষ, একজন পঙ্গু ভিক্ষুক। যার কোন কিছুরই কোন নিশ্চয়তা নেই তারও কিছু মৌলিক প্রয়োজন রয়েছে। এ প্রয়োজন যখন কোন সমাজ সুবিবেচনায় রাখে, ভাগ্যাহত এসব লোকদের মৌলিক অধিকারকে নিশ্চিত করতে যে সমাজ অগ্রাধিকার দেয় সে সমাজের লোকজন অবশ্যই আলোর মুখ দেখে। খাওয়া পড়ার নিশ্চয়তা তাদের জীবনে মেলে আর ঐসব সমাজকে আমরা উন্নত সমাজ বলি। আমাদের সবার আগ্রহ একটা সুন্দর সমাজ গড়ি। এমন একটা স্বপ্ন প্রতিটা নাগরিকের মধ্যেই থাকার কথা। অধিকাংশের মনের মধ্যে আছেও তাই। কিন্তু তারপরও কি সেই উন্নত সমাজ আমরা পাচ্ছি। ঐ কাঙ্খিত সমাজ পাবার প্রত্যয়ে নাগরিক হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে যতটুকু ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন আমরা ততোটুকু ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত নই। সামাজিক ভাবে আমরা অতোটা উৎসর্গীকৃত মন নিয়ে সবকিছু যাচাই বাছাই করি না- যতোটা করা উচিৎ। সামাজিক দায়বদ্ধতা ও নীতিজ্ঞানকে আমরা একদমই পাত্তা দেই না। রাষ্ট্রীয়ভাবে আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব আমরা পালন করি না, অথচ আমরা সুন্দর

www.pathagar.com

বাংলাদেশ কামনা করি। কি করলে বাংলাদেশ সুন্দর হবে তা যাদের জানা তারাও সে কাজটা করেন না। যারা ফর্মূলা বোঝেন না তাদের কথা না হয় বাদই দিলাম। যারা ফর্মূলা বোঝেন তারাওতো সমাজ সংস্কারের কাজ না করে সমাজ বিধ্বংসী কাজ করছেন। এভাবে চলতে থাকলে সে সমাজের ভবিষ্যৎ কি হতে পারে তা সকলেরই জানা। আমাদের সমাজে বর্তমানে সবচে বড় সমস্যাটা হচ্ছে ঐক্যের সমস্যা। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ন্যূনতম ঐক্য নেই। কেউ ডানে চললে অন্যদের বামেই চলতে হবে। এমন একটা রাজনৈতিক কৃষ্টির সূচনা দেশে হয়েছে। আর এ বদকৃষ্টি সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। কেউ কারও মুখ দেখতে চায় না। কুৎসা রটনার মাধ্যমে রাজনৈতিক বক্তব্য শুরু হয়। অন্য দলকে এবং দলের নেতাদের গালমন্দ করাটাই যেন তাদের রাজনৈতিক মেনুফেস্ট আর সাধারণ মানুষ এ অবস্থাটাই ছত্রিশ বছর ধরে দেখে এসেছে। যখন কারও পজেটিভ কিছু বলার থাকে না তখন নেগেটিভ বলা ছাড়া আর উপায় কি? জমিতে ফসল না বুনলে আগাছাতো ফলবেই। জনগণকে ধোকা দেয়ার অনেক কৌশল রাজনীতিবিদরা শিখে ফেলেছে। তারা তাদের টার্গেটে পৌঁছার জন্য জনগণকে ধোকা দেয়। ধোকা দিতে না চাইলেও একাজটা করতে হয়। 'ব্যাড কালচার'। আমরা সকলে ব্যাড কালচারে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছি। চিকিৎসকরা ব্যাড কালচারকে পুঁজি করে ইনভেসটিগেশন সেন্টার থেকে পারসেন্টেজ খান, সাংবাদিকরা সংবাদ পরিবেশনের জন্য খাম নেন, শিক্ষকরা প্রশ্নপত্র ফাঁস করার সাথে জড়িত থাকেন, প্রকৌশলীরা ঠিকাদাররা ব্রিজ বা সড়ক নির্মান অথবা বিদ্যুৎ প্লান্ট বসানোর সময় রাজনীতিবিদদের ভাগের অংক বাসায় পৌঁছেদেন ব্যাড কালচারের খপ্পরে পড়ে। হয়তো কেউ একক ভাবে একশ ভাগ দায়ী না, কিন্তু সামষ্টিক ভাবেতো আমরা সকলেই দায়ী। আজ আমাদের ঝানু রাজনীতিবিদদের বুঝতে কষ্ট হচ্ছে কেন যে, জাতীয় ইস্যুতে সকল দলের ঐক্যের কোন বিকল্প নেই। মজার ব্যাপার হচ্ছে অনেক রাজনৈতিক নেতা, ছাত্রনেতা এ জাতীয় ঐক্য ইস্যুটা খুব ভাল বুঝতে পারেন কিন্তু তারাও কোন এক অদৃশ শক্তির ভয়ে মুখ খুলেন না। সত্যের রূপতো একটাই, সত্য। মুখতো খুলতেই হবে। সত্য বললে ফলাফল শত্রুর ঘরে যেতে পারে বলে আতংকে সত্য বলা বন্ধ করে দিয়েছেন আমাদের নেতৃবৃন্দ। সত্য বলার এবং সত্য মানার কৃষ্টি তৈরী করতে হবে জাতীয় পর্যায়ে। এ কৃষ্টির অভাবে আমাদের জাতীয় আত্মাই শুকিয়ে যাচ্ছে। যে ব্যাড কালচার আমরা প্রত্যেকে লালন করে যাচ্ছি তার ফলাফল ইতিমধ্যেই আমরা পেতে শুরু করেছি, আরও পাব। জাতি এখন খুড়িয়ে হাঁটছে। আগে ছিল হাঁটুতে সামান্য ব্যাথা। এরপর কাধে ভর করে হাঁটবে এবং একসময় আর হাঁটতেই পারবে না। পঙ্গুত্ব বরণ করবে আমার জাতি। আমরা কি আমাদের দেশের জন্য এমন একটা অবস্থা আশা করতে পারি? নিশ্চয়ই আমরা চাইব না বাংলাদেশ পঙ্গুত্ব বরণ করুক। এ জন্য আমাদের করনীয় কাজটুকুও আবার করতে চাই না, কৃপনতা করি। ইনকাম ট্যাক্স দেব না, ভ্যাটদেব না, যাকাতের কথা এলেই ইমাম সাবের কাছে ফতুয়া জিজ্ঞেস করব, সরকারী জায়গায় দোকানপাট করে ভাড়া

দেব, আইন তৈরী করে নিজেরাই অমান্য করব, আর আইনী শাসন সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যাক আশা করব তা কি হয়? অবিবেচকের মতো কথা বললে বোকারাও হাসবে। আমাদের জাতীয় সমস্যার যে প্রথম পয়েন্টটা উল্লেখ করলাম 'জাতীয় ঐক্যের' অভাব, তা বোধ করি সবাই ঠাহর ও করতে পারছেন না। নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রা ভঙ্গ করার মতো ঘটনাও রাজনীতিবিদরা ঘটিয়েছেন। আগের সুরটাকেই আবার বাজাতে চাই। মানুষকে ভালবাসলে এসব ঘটনা তুচ্ছ হিসেবে বিবেচিত হত। মানুষের প্রতি টান থাকলে তারা আত্মোৎসর্গী হয়ে সমাজ বিনির্মানে অংশগ্রহণ করত। কে মানুষের জন্য জীবন উৎসর্গ করবে? যে মানুষকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে, যার অনুভূতিতে-বোধে অন্য মানুষ তার নিজের মতোই প্রিয়। যে নিজেকে কখনোই সমাজের আর দশজন থেকে ব্যতিক্রম ভাবে না। যদি ভাবে তবে এভাবেই ভাবে যে আমার চে সামাজিকভাবে নিগৃহীত ও অর্থনৈতিকভাবে দুরাবস্থার মধ্যে কতো লোক নিপতিত, আমিতো যথেষ্ট ভাল আছি। দুর্নীতি করা কি আমার সাজে। সে ব্যতিক্রম হবে এই ভেবে যে আমরা দেশ গড়বো, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ভোগ করবে। বলবে না একথা 'আমাদের পূর্ব পুরুষরা কি করেছে আমাদের জন্য'? একজন সৎ মানুষের গুনাবলী অর্জন করবে। আর এ সততা, মহানুভবতার গুনেই অন্য মানুষকে ভালবাসবে। তাদের ব্যাথা ও কষ্টে ব্যথিত হবে। এই মহাপ্রাণগুলো পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেই অন্য মানুষকে ভালবাসার জন্য। তাদের এটাই পেশা এবং এটাই একসময় নেশার মত হয়ে যায়। ছেলে মেয়ে স্ত্রী সমন্বয়ে গড়া তার পরিবারের গণ্ডির বাইরে সে সমাজের বৃহত্তর পরিবারের জনগণের সুখ-দুঃখ হাসি কাঁন্নাকে প্রাধান্য দেয়। তার বিবেচনায় অধিকতর ক্ষুধার্থ মানুষ প্রাধান্য পায়, অধিকতর জুলুমের শিকার ব্যক্তিটাকে, সে সাহায্যের জন্য এগিয়ে যায়, মুমূর্ষ রোগীরা অন্য রোগীদের চে প্রাধান্য পায়। মনের গহীনে যদি মানবপ্রেম শক্তমত বাসা না বাধে তাহলে মানুষের জন্য সময়, শ্রম-ঘাম ও অর্থ সম্পদ কিছুই দেয়া যাবে না। দিতে গেলে কষ্ট হবে। দেয়ার আগেই হিসেব শুরু হবে আমার ইনভেস্টমেন্টটা কোন কোন পদ্ধতিতে কতোদিনে তোলা যাবে। এই ইনভেস্টররা তাদের গ্রহকদের লোকদের যতোই বোকা ভাবুক তারাতো তার উদ্দেশ্যটা টের পেয়ে যায়। কোনই কাজ হয় না তার ইনভেস্টমেন্টের। তার বিনিয়োগ ও ফেরৎ আসে না আর জনগণও তাকে প্রত্যাখ্যান করে। এখন আমাদের উচিৎ সুন্দর সমাজ বিনির্মানে, সাম্যের সমাজ গড়ার প্রত্যাশায় যাদের মধ্যে মানবীয় গুনাবলী বেশি, যারা সত্যিকার অর্থেই মানুষকে ভালবাসেন, যাদের কাছে মানুষই প্রধান, মানুষের তরে যারা জীবন দিতেও প্রস্তুত এসব লোকদেরকে উৎসাহিত ও অনুপ্রানিত করা এবং সার্বক্ষনিক তাদের সঙ্গী হয়ে যাওয়া। এখানে অন্যকোন সংকীর্ণ চিন্তা করার সুযোগ নেই। সবাইকেই ত্যাগ করতে হবে সমাজ সংস্কার ও নতুন সমাজ গড়ার জন্য। এতটুকু ধৈর্য না ধরলে কোন অবস্থায়ই আমাদের কাঙ্খিত সমাজটা আমরা পাব না। ব্যক্তি ও সামষ্টিক প্রচেষ্টা চালিয়েই যেতে হবে। ক্লান্ত হবার সুযোগ নেই। আমার ব্যাথায় আমাকেই যেতে হবে চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসার জন্য। কে আছে এমন দরদী যে আমাকে আলোর পথ

www.pathagar.com

দেখাবে। সে অপেক্ষা কেন করব আমি? অতি দ্রুতই ফুরিয়ে যাচ্ছে সময়। দিন মাস বছর ও যুগ চলে যাচ্ছে। আর দুর্নীতি, অভাব, ক্ষুধা, বেকারত্ব ও সন্ত্রাসের স্বাক্ষী হয়ে থাকছে আমার এ সময়। ঘুরে দাঁড়াতে আমরা ব্যর্থ হচ্ছি।

যুব সমাজ মাদক সেবনে ব্যস্ত। তারা ঘোরের মধ্যে আছে। জীবনের সংজ্ঞা তাদের কাছে অন্যরকম। কারা এরা, যারা ওদের সামনে পাশবিক জীবন উপহার দিয়ে বলে দিচ্ছে এটাই জীবন, ভোগ কর। আমরা কেমন অভিভাবক, বাবা-মা? আমাদের স্নেহের সন্তানগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাদের ভবিষ্যত বলতে আর কিছুই থাকছে না। আমরা তাদের জন্য কিছুই করতে পারছি না। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকা ছাড়া আমাদের কোন দায়িত্ব নেই। আমরা কি ওদের কোলে পিঠে করে মানুষ করিনি? আমরা কি ওদের দীর্ঘদিন পেটে ধারণ করিনি? ওর জন্য কি আমার দায়িত্ব এটুকুই যে ওকে চিকিৎসার জন্য মাদক নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করিয়ে রাখব আর সমাজের কাছে লাঞ্চিত হব। মাদক নেবার জন্য সমাজের কোন দায়বদ্ধতা নেই কি? নিষিদ্ধ এ মাদক যত্রতত্র পাওয়া যায় কিভাবে? এ ব্যাপারে কি সাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করার কোন উদ্দ্যোগ আমরা নিয়েছি? সরকারের কোন সমালোচনা করে দু'পাতা লিখেছি। কিভাবে এসব উপকরণ রাজধানী শহরের অলিগলিতে পাওয়া যায়? আমাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কি কিছুই করার নেই? সে বিষয়টাতে অভিভাবক হিসেবে কি আমি মুখ খুলেছি? এটা আমার উত্তরাধীকার, বংশবিস্তার ও স্বাধীকারের ব্যাপার। যারা আমার সন্তানের ভবিষ্যত কেড়ে নিচ্ছে, তাকে অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে, তাকে মৃত্যুর মুখে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে সেতো আমার শত্রু। তার বিরুদ্ধে আমাকে লড়তেই হবে, পিতা হিসেবে আমিতো আমার ছেলের অকালমৃত্যু বসে বসে দেখতে পারি না। এটা কিভাবে সম্ভব একজন বড় ভাই হিসেবে ছোট ভাইর এসব অত্যাচার, অনাচার চোখ বন্ধ করে সহ্য করা। আমার তাহলে কি কিছুই করার নেই? 'ও মরুক বাচুক আমি জানিনা' বলে তিনমাস রিহাব সেন্টারে রাখলে কি হবে? ও কি তাতে ভাল হয়ে যাবে? যতোদিন গলির মুখে ফেনসিডিল পাওয়া যাবে ও রিহ্যাব শেষে আবার ঈদের দিনের খুশীতে মাদক নেবে। তাই মাদকদ্রব্য দুস্প্রাপ্য করে ফেলতে হবে। মাদকবিরোধী প্রচারনা ও সমাজ সচেতনতা যেভাবে কাজ করবে তদ্রুপ সরকারী সিদ্ধান্ত সমূহ বিভিন্ন সংস্থা আন্তরিকভাবে প্রয়োগ করলেই মাদক প্রাপ্য কঠিন হবে। আমরাইতো ভাল করি, খারাপ করি। সুতরাং এটা আমাদের উপর নির্ভর করে। আমারা যদি আমাদের সন্তানদের কল্যাণ চাই, আমরা যদি ওদের সুন্দর ভবিষ্যত কামনা করি তাহলে ওদের সুস্থ জীবনের জন্য যা প্রয়োজন তাই করতে হবে। আমরা কিছুমাত্র আলসেমীর পরিচয় দেব না। সময়ের অপচয় করব না। মাদক ও অবাধ যৌনাচার যুবসমাজকে বিপথগামী করেছে। সতর্ক হবার এটাই শেষ সুযোগ।

জীবনই যেখানে অচল সেখানে সুন্দর জীবনের প্রতিশ্রুতি ও প্রত্যাশা দুটোই বেমানান ও হাস্যকর। আমরা যে জীবনযাপনে অভ্যস্থ তা মানবেতর জীবনযাপন।

www.pathagar.com

মানুষ তার মর্যাদায় আসীন নেই। শারীরিকভাবে একজন মানুষের আকৃতি নিয়ে আমরা চলি বটে কিন্তু জন্তু জানোয়ারের মতো আমরা সমাজ থেকে আচরণ পাই। অনেক ক্ষেত্রে বিত্তবানদের বাসার পোষা পশুপাখীর চে নিম্নমানের জীবনযাপন করতে হচ্ছে আমাদের। অতীব পরিতাপের বিষয় এই যে, আমরা মানুষ হয়ে মানুষকে পশু পাখির জীবনের মত জীবন ধারণের ব্যবস্থাটুকু করে দিতেও ব্যর্থ হচ্ছি। শুধুমাত্র পরীক্ষার ব্যর্থতা, পিত্রসসিতে না টিকার ব্যর্থতা, পদোন্নতি না হবার ব্যর্থতা, র‍্যাংক্ক না পাবার ব্যর্থতাই কি ধর্তব্য? এই যে আমাদের সামষ্টিক ব্যর্থতা এটা কি ধর্তব্য না? একজন মানুষ হিসেবে আমি যখন অন্য লোকদের শীতের রাতে খোলা আকাশের নিচে শুয়ে থাকতে দেখি, মাঘের শীতের শেষ রাতের হঠাৎ বৃষ্টিতে ঐ মানুষগুলো যখন ভিজতে শুরু করে ও ঘুম থেকে জেগে কাথা, চাঁদর ও পরিধেয় বস্ত্র ধরে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে- অনিশ্চিয়তার দৌড়াদোড়ি তখন আমার ঘুমহীন বারান্দায় বসে থাকাকে কেউ যদি পাগলামো মনে করে তাতে আমার কষ্ট লাগে না। সে শীত বাতাস বর্ষায় বস্তির শিশুগুলো মুখ চাওয়া চাওই করে এ কোন জীবন আমাদের, মায়ের বুকের কাছে এগোয়। সে বুকের উষ্ণতাটুকুও শেষ। মাই এখন কাপছে ও ঝিমুচ্ছে। তার চোখ মুখে সংকট, দুশ্চিন্তা আর অপরাধ প্রবনতার ছাপ। এই মানব গোষ্ঠির অপরাধবোধের প্রকাশ আমাদের শিক্ষিত মহলের মতো নয়। এক গোণ্ডা ছেলে পেলে কেমনে দেখতে দেখতে চলে এলো পৃথিবীতে সে নিজেও জানে না। এ অপরাধটুকু নিজ প্রাণেই লুকিয়ে রাখে স্বামীকেও বলে না। অনেকের কাছেই শোনে অমুক অমুক জায়গায় অভাবের কারণে বাচ্চাদের বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে মাও বিষ খেয়ে মরে গেছে। কোথাও আবার মা বিষ খেতে গিয়ে ধরা পড়ে বেঁচে গেছে। বিষ খাওয়া হয়নি। এই মা চিন্তা করে সেভাবে বেঁচে গেলে তো আরও কষ্ট। তাই সে আর এপথে এগোয় না। এরা প্রতিদিন কোথায় টয়লেট করে, গোসলের পানি পায় কৈ? কি পানি পান করে। আমাদের মিনারেল ওয়াটার ছাড়া আজকাল চলে না। আমাদের এপার্টমেন্টে তিনটা মাষ্টার বেড না হলে ফ্যামিলি চলে না। ড্রইং ও লিভিং রুম আলাদা আলাদা থাকা দরকার। বাথরুমতো বেড রুমের সাথে এটাচড্ থাকাটাই জরুরী। একটা ছোট স্পেস পড়াশুনা ও গবেষণা কর্মের জন্য হলে জ্ঞান চর্চার সুবিধা হয়। গৃহপরিচারিকার বেড রুমতো নেই-ই। তার টয়লেটটা এমন যে যেভাবে ঢুকবে সেভাবে পেছনে হয়ে বেরুতে হবে। ওখানে ঘুরে বেরুবার সুযোগ নেই। 'উঁনি কি সারাদিন টয়লেটে থাকবেন'- এমন উত্তর মেলে যখন এর স্পেসটা ছোট হয়ে গেছে বলে কেউ মন্তব্য করে। তারপর শোনা যাবে 'মেডই থাকবে না একদিন'। অথচ যিনি এ মন্তব্য করছেন তিনি বিশ্বাস করেন না মেড উঠে যাবে। তিনি তা চানও না। চাইলে কি আর আমরা গার্মেন্টসের চৌদ্দ গোষ্ঠি উদ্ধার করি। মেয়েদের ঘরের কাজে পাওয়া যায় না। তারা গার্মেন্টস এ চাকরি নিয়ে স্বাধীন জীবন যাপন করছে। তৈরী পোষাক শিল্প এদেশে শুধু বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন আর বেকারত্ব দূরীকরনেই সহযোহিতা করেনি মানুষের স্বাধীন জীবন যাপনের পথ সুগম করে দিয়েছে। কারও বাসায় কাজ করাটা এক ধরনের পৌরানিক দাস প্রথার মতো।

www.pathagar.com

গার্মেন্টস এ কাজ করে একটা মেয়ে পরিচয় দেয় সে চাকরি করে। তার অফিস টাইম আছে, ছুটি আছে, বেতন আছে, আছে পদোন্নতি ও বোনাস। অনেক কষ্টের পরও তার আছে বিনোদনের সময়। সে তার অবসর সময়ে সখ আহলাদ মেটাতে পারে। তার ব্যক্তিগত রুচি বোধের উপর, চলন বলনের উপর কেউ কথা বলে না। বললে সেও তার জুৎসই জবাব দেয়। মানুষের জীবনের প্রাথমিক একটা পর্যায় অন্ততঃ সে টের পায়। অনেক মালিক পক্ষ তাদের দুরাবস্থার কারণে হোক কিংবা স্বভাবের কারণে হোক ঠিকমত বেতন দেন না, ছুটি দেন না বা দিতে পারেন না। এগুলো অবশ্যই কর্তৃপক্ষের দেখা উচিৎ। অনেক গার্মেন্টস এ বিভিন্ন ধরণের এবিউজিভ কার্যকলাপ হয়, যা বন্ধ হওয়া উচিৎ। আগেরচে অনেক নিয়মে চলে আসছে। আরও সিস্টেমেটিক হবে। অবুঝ শ্রমিক ও স্বার্থান্বেষী নির্বুদ্ধ কিছু মালিকের কারণে এবং কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতার জন্য এ শিল্পটি যেন ধ্বংস হয়ে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সরকার ইচ্ছে করলে পোষাক শিল্পকে আরও সম্প্রসারিত করতে পারেন। সকল সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠির স্বার্থরক্ষা করেই এটা করা সম্ভব। যেখানে মানুষ তার পরিচয় খুঁজে পায়, যেখানে মানুষ কাজ করলে বেতন পায়, যেখানে কাজ করলে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা যায়, যেখানে মানুষ তার স্বকীয়তাকে কাজে লাগাতে পারে সেটাকে কাজের উপযুক্ত স্থান কেন বলব না। কেন বাসায় কাজের লোক না পাবার ক্ষোভটাকে আমি গালমন্দের মাধ্যমে প্রকাশ করব? কেন আমি অহেতুক গার্মেন্টস কর্মীদের চরিত্র নিয়ে কথা বলব। আমাদের কার বাসায় বুয়া পাওয়া গেল না, স্ত্রীর কাজে কষ্ট হচ্ছে, হাড়ি পাতিল ঘষতে হচ্ছে, কাপড় চোপড় ধুতে হচ্ছে, হাতের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আর বুয়া পাওয়া যাচ্ছে না বলে অনর্গল গালাগাল করছেন সবাই মিলে এটা কি ভাল মানুষের পরিচয়? আপনার স্বার্থরক্ষা হল না আর গালমন্দ শুরু করলেন? তার জীবনে কি পরিবর্তন এলো সেটা খেয়াল করলেন না? আমরা এভাবেই অন্ধ হয়ে যাই আমাদের ব্যক্তি স্বার্থ ও লোভকে টিকিয়ে রাখতে আশে পাশের কোন মানুষের কি হল সেদিকে খেয়াল রাখি না। এতোটুকু ভাল মানসিকতা দেখাতে না পারলে কি পরিবর্তন আশা করতে পারি। এটা এক জটিল অধ্যায়, আমার ষোল আনা চাই- তাতে কার কি হল বিচার্য নয়। গার্মেন্টস শ্রমিকদের বিশেষ করে মেয়েকর্মীদের স্বাধিকারের বিষয়টা মূলতঃ উত্তরণ, একধাপ এগিয়ে যাওয়া। কোন বাসায় বুয়ার ভূমিকায় কাজ করারচে ওটা শতগুন ভাল। বাসা বাড়িতে কাজের লোক না পাবার ক্ষোভ প্রকাশই তার প্রমান। আর যারা কাজের বুয়ার উপর নির্ভরশীল তারা ক্ষোভ প্রকাশ করি ঠিকই কিন্তু মেডসার্ভেন্ট আমার পারিবারিক জীবনে যে খুবই দরকারী একজন মানুষ যার অভাব আমার সংসারকে তছনছ করে দিচ্ছে এটুকু মুখ খুলে স্বীকারও করতে চাই না। তার অভাবে আমার কষ্টের কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করলেই তো তার গুরুত্ব বেড়ে যাবে, তখন তাকে তার প্রয়োজন মত বেতন দিতে হবে অথবা তার কষ্টগুলো দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে যা করতে আমি প্রস্তুত নই। আমি চাই লামছাম একটা বেতনে তাকে দিনভর পশুর মত খাটাতে। যে কাজগুলো আমি করতে পারি না, যে কাজে অন্যের সহযোগিতা প্রয়োজন সেখানে

তাকে গুরুত্ব দিলে তার সঠিক মূল্যায়ন করলে দোষ কোথায়? আমরা এসব ক্ষেত্রে শুধু দ্বান্দ্বিক নই, শুধু কৃপনই নই, আমরা যথেষ্ট স্বার্থপর এবং কোন কোন পর্যায়ে অমানুষ। শেষ শব্দটা দেখে অনেকেই বিরক্ত হবেন ও বাড়াবাড়ি মনে করবেন। মানুষ মানবীয় আচরণ করবে আর অমানুষরা মানবীয় বাদে সব ধরণের আচরণ করবে। দানবীয় আচরণ, পাশবিক আচরণ, নারকীয় আচরণ- সবকিছু। আমাদের মানবীয় সত্তাকে যদি বিস্তৃত না করি, বিকশিত না করি কেমনে উদ্ধার পাবে লাঞ্ছিত মানবতা। ভাগ্যহারা এসব লোকজনকে আমাদের অতি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করতে হবে।

এ পৃথিবীতে কেউ আল্লাহর কাছে আবেদন নিবেদন করে আসেনি। আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে তাদের দায়িত্ব কর্তব্য বলে দিয়েছেন এবং সঠিক পথ কোনটি তাও নবী রাসুল (সঃ) দের পাঠিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন। মানুষের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্যটাই হচ্ছে ইবাদতের মূখ্য। আনুষ্ঠানিক ইবাদাত বন্দেগী যারা আমরা পালন করি তার উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানব কল্যাণ, মানুষের মুক্তি তাদের সুখ শান্তি। যারা মানুষের সমাজকে অবজ্ঞা করেন, মানুষের লাভ-ক্ষতি, কল্যাণ-অকল্যাণকে পাশ কাটিয়ে পরকালকে ভাবেন, সেখানের কাল্পনিক জান্নাতে যাবেন বলে আশা করেন- এটা তাদের ইসলামকে না বুঝার ফল, অপব্যাখ্যার অংশ বিশেষ। শর্টকাট পথে জান্নাতে যাবার পায়তারা আর কি! কষ্ট না করে কিছু তসবীহ তাহলীল আর যেকর মুখে উচ্চারণ করার বিনিময়ে জান্নাত! পানিতে না নেমে চোখ বন্ধ করে কাল্পনিক গোসল আর কি! মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা যতোটুকু আমরা বোধ করি ইসলাম তারচে বহুগুন দিয়েছে। এসব দায়িত্ব পালন বাধ্যতামূলক। পরশীকে কষ্ট দেয়া যাবে না। হাত বা জিহ্বা অর্থাৎ কথা দিয়ে কষ্ট দেয়া যাবে না, ক্ষতি করা যাবে না। যারা করবে তারা মুসলিমের কাতারে আর থাকবে না। এমন অজস্র রেফারেন্স আছে কুরআন হাদীসে। সমাজের নির্যাতিত ও ভাগ্যাহত পুরুষ মহিলা ও শিশুদের জন্য অর্থ সম্পদ ও সময় ব্যয় করে তাদের মুক্তির খাতিরে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে বলা হয়েছে। অসৎ নেতার পরিবর্তে সৎ নেতা খোঁজার জন্য নির্দেশ এসেছে। এসব কি অমূলক আহ্বান। কুরআনের এসব আহ্বানকে কি পাশ কাটানোর কোন সুযোগ আছে? আজ ধর্মপ্রচারে ব্যস্ত লোকজনদের আপোষকামী চরিত্র এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তারা নিজস্বার্থে কুরআন হাদীসের অপব্যাখ্যা করতেও লজ্জাবোধ করেন না। অধিকাংশ লোক যেখানে দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে সেখানে তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে মুক্তির বিষয়টি কি ইবাদাতের পর্যায়ে পড়বে না। তাদের মৌলিক মানবীয় অধিকার সমূহ পদদলিত। দিন যতো যাচ্ছে এদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। সামাজিক অনাচার অবিচার আর নানান কুসংস্কারের কারণে তারা আজ আমাদের সমাজে বসবাস করেও যেন একটা ভিন প্রজাতী। তারা পেছনে পড়ে থাকার কারণে শুধু তারাই কি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে পুরো সমাজ। তাদের কারণে আমরা ধনীক শ্রেণী, তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ, জাতির বিবেক ও রাষ্ট্র পরিচালক শ্রেণীও দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছি। তাদের এলোমেলো হেটে বেড়াবার

www.pathagar.com

কারণে, যখন তখন রাস্তা পার হবার কারণে আমাদের দামী গাড়ি গতিতে চালাতে পারি না, তারা ভ্যান ও ঠ্যালা গাড়ি নিয়ে গুলশানে আমার মার্সিডিসের পাশ দিয়ে যাবার সময় ঘষা লাগিয়ে দেয়। তাদের সন্তানরা বিজয় স্মরণীর ফোয়ারাতে উলঙ্গ গোসল করে যা দেখে আমার নাতী হাসে, লজ্জা পায়। তারা পার্কে অবাধ বিচরণ করে, রাতে ঘুমায়, টয়লেট করে। আমরা তাদের উৎপাতে পার্কে 'মর্নিং ওয়াক' পর্যন্ত করতে পারি না। সকালে তারা ছিনতাই করে, রাতে তারা হাইজ্যাক করে। তারা গাড়ির গ্লাসে টোকা মেরে আমার গান শোনায় ব্যাঘাত ঘটায় সিগন্যাল পয়েন্টে। নামাজের সালাম ফিরানোর সাথে সাথেই তারা মসজিদে দাঁড়িয়ে ভংগা ব্যান্ডেজ করা হাতটা বের করে সাহায্যের আবেদন জানায় আমরা বিরক্ত হই। তাদের সাক্ষাৎ মেলে বাসে। চিরুনী, চকলেট, শীতটুপি বিক্রি করতে দেখি তাদেরকে-পণ্যবিক্রির নানান কৌশল অবলম্বন করে তারা। খুবই বিরক্তিকর এ অবস্থান। ঢাকার লোকাল বাসে এরা পিক পকেট করার জন্য ওঠে, এদের হাতে সাধারণ মানুষ নাজেহাল হয়। অধিকাংশ মানুষের এই শ্রেণীটা সাধারণতঃ ভাল প্রকৃতির। তাদের মধ্যে কেউ কেউ দারিদ্রের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে কেউ গডফাদারদের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে গিয়ে বিপথগামী হয়। অন্যায়ের পথ বেছে নেয়। যতোই শ্রেণী বৈষম্য বাড়বে এ অবস্থাটাও ভয়ানক আকার ধারণ করবে। জরুরী অবস্থার মধ্যে ও খুন খারাপী যথেষ্ট বেশি হয়েছে ২০০৭ এ। মামলাও হয়েছে বেশি। দৈনিক পত্রিকার এ তথ্য পরিবেশনাই প্রমান করে যারা দিন আনে দিন খায় তাদের পেটে হাত পড়লে সমাজে অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়, অশান্তি বাড়ে। চালের দামসহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বৃদ্ধির ব্যাখ্যা জনগণ শুনতে নারাজ। মানুষের জীবনযাত্রা থমকে গেছে। মানুষের হাতে টাকা নেই, জিনিসপত্রের দাম বেশি, খাবে কি? অস্থিরতা ও হতাশা চারদিকে। মানব মন বড় বিচিত্র। সহসা হতাশা আসে না। আশা থাকে,প্রত্যাশা থাকে। একবার আশাহত হলে ধৈর্য ধারণ করে, পুনর্বার আশায় বুক বাঁধে। এভাবে বার বার আশা ভেঙ্গে গেলে, প্রত্যাশা পূরণ না হলে–কারও ওয়াদার বার বার খেলাপ হলে মানুষ আশাহত হয়, হতাশ হয়, ভেঙ্গে পড়ে। কোন সাধ আহ্লাদ আর কাজ করে না। সামনে অন্ধকার আর অন্ধকার। আলোর বদলে অন্ধকার নেমে আসে চারদিকে। আজ জাতীয় দুর্দিন চলছে। দেশে গণতান্ত্রিক সরকার অনুপস্থিত। দুই হাজার সাত এর নির্বাচনকে কেন্দ্রকরে অনেক প্রত্যাশিত অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেছে। অপ্রত্যাশিত, অনাকাঙ্ক্ষিত ও জাতির জন্য কলংকময় কিছু অধ্যায়ের অবতারণার সূচনা হলে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসে। তারা এলে জনগণের একটা অংশ আনন্দিত হয়, উৎফুল্ল বোধ করে। অনেকে বেজার মুখে বিবৃতি দেন 'বর্তমান সরকার ভাল সরকার'। এ অংশটা বেকায়দায় আছে বলে তারা বাধ্য হয় বিবৃতি দিতে। শুধু তাই না সংস্কারের নামে তারা কুসংস্কারে বিশ্বাস শুরু করে, তার আমলও করে বিগত দিনের মত। জনগণেরও একটা অংশ হাপ ছেড়ে বাঁচে, মনে করে ভালই হয়েছে। দীর্ঘদিনের শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। চৈত্রের খড়ার পর বৃষ্টি পেলে হঠাৎ সবাই খুশী হয় কিন্তু সে বৃষ্টি অনাবৃষ্টি হলে আর খুশীভাব থাকে না, ফুটে

ওঠে সবার মুখে বিরক্তিভাব। আজ বর্তমান সরকারের দেখানো সকল আশার আলো ম্লান হয়ে যাওয়াতে সবাই আশাহত হয়েছে। নির্বানের ব্যাপারে সরকার প্রতিশ্রুতি দিলেও সেই নির্বাচন হবে কি-না এনিয়ে জনমনে যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দিয়েছে। সরকারের উপদেষ্টাদের একটা অংশের পদত্যাগ জনমনে শংকার সৃষ্টি করেছে। অবশ্য উপদেষ্টাদের মতামত ও সাক্ষাৎকার যাদের বিপক্ষে গিয়েছে তারা অবশ্য খুশী হয়েছেন। এ খুশীর প্রক্রিয়াটা অভিনব। সত্য বিবর্জিত এহেন খুশী হবার বিষয়টা সত্যিকার অর্থেই বেমানান। জাতিকে ধ্বংস করার মতো বালক সুলভ আচরণ। নিজের পক্ষে গেলেই ঠিক, বিপক্ষে গেলেই বেঠিক। এমনকি আমার শত্রুর বিপক্ষে গেলেও ঠিক সেটা আমার জন্য, জাতির জন্য কেমন তা বিবেচ্য নয়। এমন নির্বাচনের জন্য একপক্ষ এমনই তাড়াহুড়া করেছে যা দেখলে বোকারাও মুখ চেপে হাসবে।

আমাদের জাতি একদমই সুদিন দেখেনি। একসময় বিদেশীরা সুদিনের গল্প বলতো, স্বপ্ন দেখাতো। তারপর দেশী শাসকগোষ্ঠি ঐ একই আচরণ শুরু করে। ক্ষমতায় থাকার কিছু বিশেষ কৌশল তারা রপ্ত করে নেয় এবং তা প্রয়োগে সুফলও আশে। জাতি বার বার সুদিনের গল্প শোনে কিন্তু সুদিন দেখে না। দূর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযানের যে গল্পমালা আমরা শুনে আসছি সরকার কি বলতে পারবে কত ছটাক দূর্নীতি কমেছে? এটা অনেক দিনের জমে থাকা শেওলা একটা পদ্ধতিতেই তাকে সরাতে হবে। সরকারকে অনেক অনেস্ট হতে হবে জনগণের কাছে। বিশেষ শ্রেণীর কাছে নতজানু হবার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করা যায় না। এই আশাহত মানুষদেরকে আশান্বিত করাটাও এজন্য কষ্টের যে তারা বারবার আশার বাণী শুনেছে আর আহত হয়েছে। আমাদের জনগোষ্ঠির একটা শ্রেণী আছে যাদের কথা বলার কোন সুযোগ নেই। তারা গণতন্ত্র কেন কোন তন্ত্রই বোঝে না। তাদের প্রয়োজন কাজ, খাবার আর মানুষ হিসেবে একটু সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার। আমাদের এসমস্ত জটিল প্রক্রিয়ার মধ্যে তাদের মতামত প্রকাশেরও সুযোগ কম। মতামত প্রকাশের একটা সুযোগ পাঁচ বছর পর পর আসে, নিজের অজান্তেই মতটা কেমনে যেন হাতছাড়া হয়ে যায়। এমনই এক দুষ্ট চক্রের হাতে পড়ে অন্যের মতামতেই ভোট দিতে হয়। একটা দুটো নয় অনেক ধরণের কারণ তার মতকে প্রভাবান্বিত করে। অধিকাংশ মানুষ আমাদের পত্রিকার রিপোর্টিং বুঝে না, বুঝে না ইনডাইরেক্ট স্পিচ। তারা বর্তমান বিশ্বের জটিল রাজনীতিতো দূরে থাক আমাদের দেশের অপেক্ষাকৃত সহজ রাজনীতির ভাষা ও কৃষ্টি পুরোপুরি বুঝতে পারে না। এ জনগোষ্ঠি যেন তাদের অধিকার, তাদের চাওয়া পাওয়া কি তা না বুঝে, রাজনীতিবিদদের কার্যকলাপের ও বক্তৃতার ব্যবধানটুকু তারা টের না পায় সেজন্য সব ব্যবস্থা করে রাখছে আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলো।এদের বক্তব্য কি জনগণ জানে? তাদের দলীয় কর্মসূচী কি জনতার সামনে তা অস্পষ্ট। হ্যাঁ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কিছু দর্শন আছে, তাদের ব্যক্তিত্ব আছে, তারা সেগুলোকে পুঁজি করে আর আমাদের মৃত নেতাদের নাম ভাংগিয়ে, তাদের স্তুতি

গেয়ে লোকদের বোকা বানিয়ে ভোট খরিদ করছেন। এ অবস্থায় জনগণ কিভাবে বর্তমান সরকারকে বিশ্বাস করবে যাদের কোন জনভিত্তি নেই, কোন স্পষ্ট রাজনৈতিক দর্শন নেই। এরাও কি মানুষের প্রতি ভালবাসায় উৎসর্গীকৃত। না, হবার কথাও নয়। সেনাবাহিনীর সদস্যরা দীর্ঘদিন জরুরী অবস্থার মধ্যে জনতার কাতারে এসে তাদের দায়িত্ব পালন করছে। বলতে দ্বিধা নেই অনেক কঠিন দায়িত্ব তারা পালন করছে। পুলিশ, বিডিআর, নেভী, এয়ারফোর্স ও সেনাসদস্যদের সমন্বয়ে যৌথবাহিনী গঠিত হয়েছে। তারা আপ্রান চেষ্টা করছেন তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে। কিন্তু সুনিয়তে সকল সমস্যার সমাধান হয় না। সেনাসদস্যরা একটা নিয়মে চলে বলে তাদের দ্বারা আইনভঙ্গ হয় না আর দুর্নীতির বিচার সেখানে হাতে নাতে হয় বলে দুর্নীতিই কম। তারা সূর্যোদয়ের আগে উঠে নামাজ সেরে পিটি শুরু করে। সকালের ঐ দৌড় শেষ হয় সান্ধ্যকালীন রোল কলের মাধ্যমে। তাদের উপস্থিতি ঠিক আছে কি-না। খাবারের মানসহ অন্যান্য খবরাদি নেয়ার পর তারা বিশ্রামে যায়। অফিসারদের অফিস চলে কখনো রাত দশটা পর্যন্ত। নিজস্ব সময়ের অফিস। দেশের মানুষ জানে সেনাবাহিনী সাজগোজ করে, বসে বসে খায় কোন কাজ করে না। এদের বাজেট কমানো প্রয়োজন কিছু কিছু পত্র পত্রিকায় এলেখা আমি বহুবার পড়েছি। বুদ্ধিজীবিদের বক্তৃতায় এ কথা শোনা গেছে বার বার। একটা সশস্ত্র বাহিনীর জন্য যা যা কাজ তার সবই তারা করে। অত্যন্ত টাইট তাদের জীবনযাপন। পাবলিক লাইফের জীবনযাপন ও সেনাসদস্যদের জীবন যাপনে ফারাক অনেক। বিশাল দূরত্ব এ দু'জীবনের মধ্যে। তাই সেনাবাহিনী এদেশের জলবায়ুর সন্তান হবার পরও যখন তারা ব্যারাকের বাইরে যায় পাবলিক জীবনের সাধারণ বিষয়গুলোও তাদের কাছে অনিয়ম মনে হয়, তারা 'ডিসঅর্ডারড' ফিল করে। তাই যতোবারই সেনাবাহিনীর শাসন এসেছে রাস্তার ফুটপাত ক্লিন করা, এলোমেলো রাস্তা পারাপার, যত্রতত্র পার্কিং বন্ধ করা সহ খুব সহজে চোখে পড়ার মতো বিষয়গুলোকে তারা প্রাধান্য দিয়েছে। ফুটপাতের হাজার হাজার দোকানদার ঐ পেশাটার মাধ্যমে বেঁচে আছে, চুরি বা ছিনতাইর চে বেটার। অবশ্যই ফুটপাত এভাবে দখল করে রাখার কারণে পথচারীদের রাস্তায় নেমে হাঁটতে হয়। ফলে গাড়ি চলার জন্য রাস্তা সরু হয়ে যায়। হকারদের দোকানপাট থেকে সরকারী ও বেসরকারী লোকজন চাঁদা নেয়। একথা কে না জানে। যে বিষয়টি সবার চোখের সামনে হয় তার জন্য প্রমাণ চাইতে হয় কি? যেহেতু একশ্রেণীর সরকারী পর্যায়ের লোকজন এর সাথে জড়িত সেখানে অন্য আর শ্রেণীর সুশৃঙ্খল সদস্যরা এর বিরোধীতা করতে গেলে সবিরোধীতা হবে এবং সে অভিযান টিকবে না। আজ বছর ঘুরে প্রমান হয়েছে এ সমস্ত অভিযান অযৌক্তিক, আবেগনির্ভর, এসব টিকে না। যাদের স্বার্থ এ হকারদের দোকানপাটের সাথে জড়িত তারাই এ অভিযান বানচালের চেষ্টা করবে, হয়তো তাই করেছেও। এসব বাহ্যিক শৃঙ্খলার দিকে চোখ দিয়ে বর্তমান সরকার এমন অবস্থায়ই পড়েছে যে চালের ডালের দাম অসহনীয় পর্যায় পৌঁছে গেছে। মৌলিক সমস্যাদির দিকে সরকারের বেশি নজর দেয়া উচিৎ ছিল। রাজনৈতিক দল সমূহের

সংস্কার শেষ করে ভোটার লিষ্ট করা হলে রোডম্যাপ অনুযায়ী নির্বাচন দিয়ে বর্তমান সরকারের কাজ হবে ক্ষমতা পরবর্তীদের হাতে হস্তান্তর করা। যাই হোক না কেন গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় শাসকগোষ্ঠি জনগণকে ভয় পায়। জবাবদিহিতার একটা বিষয় থেকেই যায়। কারা গণতন্ত্র চায় আর কারা চায় না। জনগণ তা জানে। সবহিসেব সাধারণ মানুষের কাছে থাকে। কোনকিছুই হিসাবের বাইরে থাকে না। হিসাব হবেই। আজ না হয় কাল। কাল না হয় পরশু। জনগণের কাছে ভোট চাইতে যেতে হয় বলে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাটা আমরা কামনা করি। জনগণের মতামতের কমবেশি পরিস্ফুটন সে ব্যবস্থায় ঘটে। গণতন্ত্রের কোন বিকল্প নেই। গণতন্ত্রে মত ও পথের পার্থক্য থাকবে। কিন্তু উদ্দেশ্য থাকে মানব কল্যাণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা। দূরত্ব হবে মতাদর্শ নিয়ে। কিন্তু এ সকল রাজনৈতিক দলের মূল যে বক্তব্য তা তো এক। তাদের আদর্শ মানুষের কল্যাণ, মানুষের উন্নত জীবন, মানুষের মুক্তি। আমরা যদি এতো সমালোচনার পরও একবার চোখ বন্ধ করে ভাবি আমি এবং আমার দল আমার দলের নেতারা মানুষের মুক্তির জন্য সত্যিকার অর্থে কি করেছি? সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে, সমাজের উন্নতি করতে হলে সেটাতো উন্নত ও ভাল মানুষ ছাড়া সম্ভব না। একথাতো আমরা স্বীকার করবো। চোর, লম্পট, স্মাগলার, দুর্নীতিবাজ ও খুনীদের দিয়েতো আর সমাজ গঠন সম্ভব নয়? মানুষকে মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষা যারা দেবেন তারা কি মানবিক আচরণ করেন? তাদের ব্যক্তি জীবন কতোটুকু পরিচ্ছন্ন সে প্রশ্ন কি আমরা কোনদিন করেছি? আমরা তার জ্বালাময়ী বক্তৃতা ও স্মরণ শক্তিরই প্রশংসা করে গেলাম? তিনি যে তার বক্তৃতার অর্ধেক তথ্য মিথ্যা দেন আমি কি সে ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করেছি। আমার দলের নেতারা যে নির্দয় আচরণ করেন কর্মীদের সাথে তা কি আমাকে মর্মাহত করে না? আমি কি কোনদিন প্রতিবাদ করেছি? কে গড়বে সমাজকে? সমাজ গড়া কি এতোই সহজ? এটা মৌলিক প্রশ্ন। দলের একজন সচেতন কর্মী হিসেবে এ প্রশ্ন আজ আমাকে করতেই হবে। আমার দলের নেতারা যদি পরিশুদ্ধ না হন তারা যদি অনর্গল মিথ্যা বলতেই থাকেন, তাদের একমাত্র কাজ যদি হয় নিজের কর্মীদের অন্যায় অত্যাচারকে সাপোর্ট করা ও উৎসাহিত করা, আমার নেতারা যদি সরকারে থাকাকালীন সীমাহীন চাঁদাবাজি করে থাকেন তাহলে আমার বিবেক কি এ নিয়ে কথা বলবে না? আমার কি উচিৎ হবে না এ বিষয়গুলোকে সামনে তুলে আনা। আমি যদি তাদের সামনে টিকতে না পারি দলই করলাম না। দল করতেই হবে এরতো কোন বাধ্যবাধকতা নেই। অন্যায় সহ্য করে কেন দল করবো। আজ এ প্রশ্ন আসছেই না। অন্যদল অন্যায় করেছে এটাই আমার বড় বিবেচ্য। ওরা করলে আমরা কেন করব না। এ মন্তব্য ছেলে বুড়ো সকলের। যেন চুরি প্রতিযোগিতায় নেমেছে সকলে। আত্মসমালোচনার, কর্মীগড়ার চরিত্র গড়ার কোন কর্মসূচী এসব দলের নেই। কর্মীসম্মেলন কখনো সখনো হয় যেখানে বিরানী বিতরণের সময় চেয়ার ভাঙ্গাভাঙ্গি হয়। কোন প্রশিক্ষণ কর্মশালা নেই। নাট্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ শিবির হয় অথচ দেশ

পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে যে দলীয় কর্মীবাহিনী তারা বিনা ট্রেনিং-এ এই কাজটা করতে চাচ্ছে। খুবই অবাক করার মতো বিষয়।

সকল মানুষের কষ্ট থাকে, থাকে অব্যক্ত যন্ত্রণা। কষ্টের রং রূপ ও মাত্রা যেমনই হোক যার কষ্ট তার কাছে। ধনী-গরীব নির্বিশেষে এ সমাজের লোকজন কষ্টে আছে। বুদ্ধির অভাবে, জ্ঞানের অভাবে কষ্টে আছে। ধনীক শ্রেণী ভাবে টাকা দিয়ে সুখ কিনবে অনেক সময় কিনেও ফেলে এবং অন্যকেও ফেলতে দেখে তাই তারা অন্যের ভাল থাকা, খারাপ থাকার প্রতি তোয়াক্কা করে না। যেখানে যখন যেমন আচরণ করতে হয় তাই করে। সমাজের, জাতির, দেশের কি হল তার খবর রাখে না, রাখার আগ্রহও প্রকাশ করে না। তাদের বিবেচনায় সুখ মানেই টাকা। টাকা নাকি দ্বিতীয় ঈশ্বর। যারা জানেন একাকী সুখী হওয়া যায় না তারা সমাজ সচেতন, তাদের বিবেক ও টনটনা, তারা চেষ্টা করেন টেনে সমাজকে উপরে তুলতে। তাদের আগ্রহ ও আন্তরিকতার কোন অভাব হয় না। আর কিছু না হোক তাদের অর্জনের একটা অংশ সমাজ বিনির্মান ও সংস্কারে তারা ব্যয় করেন বলে তাদের মনে আত্মিক সুখ থাকে। তারা বুদ্ধিমান, জ্ঞানী। তারা টাকাকে কাগজের নোট হিসাবেই চেনেন যা মানুষ তৈরী করে অতএব এটাকে ঈশ্বর বলার কোন মানে নেই। জীবনের সংজ্ঞা কারও কাছে স্পষ্ট থাকলে তার খুব বেশি টাকার প্রয়োজন হয় না। সে তার প্রয়োজনকে নিয়ন্ত্রণ করে, টাকাকে কাজে লাগায় ও খাটায়। টাকা তাকে খাটাতে ব্যর্থ হয়। সুতরাং ধনীক শ্রেণীর যারা টাকাই কেবল সুখ দিতে পারেন বলে সেই পথে ছুটেন এবং সমাজের অন্য মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন তাদের একদিন প্রচণ্ড বিপাকে পড়তে হয়, দুঃখ দুর্দশা তাদের জন্য অপেক্ষা করে। একদিন ঐ ফাঁদে তারা পড়বেনই। তাদের ছক বাধা জীবন, নিশ্চিত ভবিষ্যতের কোন কোনে যদি মেঘ দেখা যায় তারা আতকে ওঠেন। কারণ মেঘ দেখার জন্য তার মন আদৌ প্রস্তুত নয়। সে অত্যন্ত কষ্ট পায় তার রুটিন ভেঙ্গে গেলে। এজন্য এশ্রেণীটার অল্পতেই কষ্ট। তার যদি বা মৌলিক কোন না পাওয়া নেই তবুও যোগ বিয়োগ করলে তারও অনেক কষ্ট। গরীব শ্রেণীর কষ্টের নানান ধরনের রং আছে, বিচিত্র ধরণের সেসব কষ্ট আমাদের পুথিতে আসে না। কারণ পুথি বা বই রচনাকারীদের ও দেখার চোখ নেই এবং বর্ণনাশক্তিও অনেক সময় সীমিত। আর এ সকল হতভাগ্য লোকদের জীবনযাপনের সাথে আমরা খুব বেশি পরিচিত নই। মাঘের এই শীত বৃষ্টিতে টোকানো কাগজে চুলা ধরিয়ে রান্নার দৃশ্যটা চোখে পড়ার মতো। অহরহ এ দৃশ্য দেখছি। হাঁড়িতে কি আছে কে জানে। আমি কি আমার নিজের জন্য নীল পলিথিন ব্যাগের নিচের অনিশ্চিত জীবন কল্পনা করতে পারি? একটা দু'টো নয় অজস্র পরিবার এমন ঢাকাসহ সারাদেশের বড় শহর ছোট শহরগুলোতে ছড়িয়ে আছে। এ জীবনের মূল্য কতটুকু? কেন তারা আত্মহত্যা করে। বাচ্চাদের বিষ খাইয়ে কেন তারা নিজেরা মরতে চায়? পৃথিবীতে থাকার আগ্রহ কেন নিঃশেষ হয়ে যায়। অভাব, ক্ষুধা, অত্যাচার, মানসিক যাতনা কতটুকু আর সহ্য করা যাবে? তাদের বস্তিতেই

www.pathagar.com

গাড়িতে করে এসে ফেনসিডিল কিনে, নেশা করে বড় লোকের পোলাপাইন। আরও কতো দৃশ্য দেখতে হয়। মুখ বুজে সহ্য করা ছাড়া আর উপায় কি? দারিদ্র মানুষকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যায় যার আঘাতে লোকজন অপরাধ করতে বাধ্য হয়, মিথ্যা বলতে শেখে, খুন খারাপি করে, নেশা করে আর জ্ঞানবুদ্ধি সব লোপ পেতে শুরু করে। মানুষের প্রতি মানুষের যে কর্তব্য ও দায়িত্ব তা যথাযথভাবে পালন না করার কারণেই এ দুরস্থাটার সৃষ্টি হয়েছে। আমরা যত্রতত্র অপব্যাখ্যা দিয়ে বেড়াই, জীবনের ভুল সংজ্ঞা দেই, অহরহ মিথ্যা পরিবেশন করে চলি। যারা আজকালের খবর রাখেন তারা নিশ্চয়ই সরকারের বর্তমান সময়ের বিপরীত মুখী আচরণ দেখে উদ্বিগ্ন। তাদের ভালকাজ সমূহও আজ এ কারণে ম্লান হয়ে যাবে। অভাবী ও দরিদ্র লোকদের প্রয়োজন যেহেতু কম খুব অল্প পরিশ্রমেই এখানে ফল লাভের আশা করা যায়। তাদের প্রতি আমাদের কর্তব্যটুকু যৌক্তিকভাবে আমাদের মাথায় ও হৃদয়ে স্থান করে নিতে পারলেই তাদের জন্য করা সহজ হবে। আমরা যদি ভাল থাকার সংজ্ঞাটাকে একটু বুঝতে পারতাম তাহলে হয়তো তাদের কপাল খুলে যেতো। এই সংজ্ঞাটা আমাদের জানা প্রয়োজন। জীবনের সংজ্ঞা না জানলে পড়াশোনা করে, ডিগ্রী নিয়ে লাভটা কি। সবই বিফলে যাবে। আমি আমার পরিবার ও আত্মীয়দের যদি লাখো ক্ষুধার্ত মানুষের মাঝে সীমাহীন সম্পদের মধ্যেও রেখে যাই তারা কখনোই তা ভোগ করতে পারবে না। যারা ক্ষুধার্তদের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে আপোষে এগিয়ে আসবে শেয়ার করার জন্য তারাতো কর্মের মাধ্যমে বেঁচে গেল। আর যারা আপোষে না এসে আইন ভঙ্গ করে সমাজকে লালচোখ দেখিয়ে সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে চাইবে তাদের কপালে হয়তো আরও ভোগান্তি অপেক্ষা করবে। অতএব বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী মানুষরা অন্যমানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান না করে যার যা প্রাপ্য তাই পরিশোধ করবে এটাই কাম্য।

আমরা আমাদের দৈনন্দিন কাজে সহযোগিতার জন্য যাদের বাসায় রাখি তাদের মধ্যে পুরুষ ও মহিলা দু'ধরনের লোকই আছে। বাসায় সাধারণতঃ মহিলা কাজের লোক বেশি রাখা হয়। বিভিন্ন বয়সেরই হতে পারে কাজের লোক। আট/নয় বছরের উপর থেকে পঞ্চাশ পঞ্চান্ন কোন ব্যাপার নয়। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় কোন আইন নেই, নীতিমালা নেই। আছে সামাজিক একপ্রকার রীতি। যেমন বয়স্ক পুরুষ লোককে ঘরে কাজ করতে দেখা যায় না, কারণ বয়স্ক একজন পুরুষ লোককে ঘরের মধ্যে কাজ করতে দেখাটা বেমানান ও সামাজিক রীতিবিরোধী। তাছাড়া ঘর যেহেতু মহিলাদের পরিচালনায় থাকে, তারা এ জিনিসটাকে গ্রহণ করতে না পারার কারনেই বিভিন্ন বয়সের মহিলা কাজের লোকের সহযোগিতা আমরা নিয়ে থাকি। যতোদূর পর্যবেক্ষন করে দেখেছি এদের নাম 'কাজের লোক'। গ্রামে অঞ্চল ভিত্তিতে বিভিন্ন আঞ্চলিক নাম দেয়া হলেও ঢাকায় একটু বয়স্ক মহিলাদের 'কাজের বুয়া' অথবা অনেক সময় এই পদটার নামই 'বুয়া' বলে চালানো হয়। যেমন অনেক সময় কাউকে আক্ষেপ করে ফোনের এ পাশ থেকে উত্তর দিতে শোনা যায় 'বুয়াটা' ঈদের সময় বাড়ি গিয়ে আর

www.pathagar.com

ফেরেনি কেমন আর থাকব? বুয়াদের মধ্যে ছুটা বুয়া ও ঠিকা/স্থায়ী বুয়া দু'ধরনেরই আছে। তাদের চাহিদা অনুযায়ী তারা ঠিক করে কিভাবে থাকবে। গৃহকর্তা কর্ত্রীরাও তাদের প্রয়োজনানুযায়ী ছুটা বা স্থায়ী বুয়া ঠিক করেন। কেউ ছুটা বুয়াকে পছন্দ করেন না, কারণ তারা যেহেতু ছুটে বেড়ায়, এ বাসা ও বাসা করে, তাদের হাইজিনের ব্যাপারে অনেকেই সন্দেহ করেন। স্থায়ী বুয়াদের নিজের মতো করে তৈরী করে নেয়া যায়, কথা শোনানো সহজ। অনেকে বাসার মধ্যে বুয়াটুয়াকে ফরেনবডি মনে করেন, তারা শুধু কোটাকাটায় সহযোগিতা নিতে আর ধোঁয়ামোছায় এদের হেল্পটা নিতে চান, সুতরাং তাদের পছন্দ 'ছুটা বুয়া'। বাসায় পরিবেশ ভাল না, অনেক গৃহকর্তীরা তাই ছোট বাচ্চা মেয়েদের পছন্দ করেন বয়স্ক মহিলা রাখেন না, উঠতি বয়সের মেয়েদেরও না। তাদের বাচ্চারা এদের সাথে খেলতে পারে আবার টুকটাক কাজেও সহযোগিতা করতে পারে। অনেক নরম মনের মানুষরা ছোট বাচ্চাদের এভাবে খাটানো পছন্দ করেন না, তারা বড়দের কাজ দেন। অল্প বয়সের ছেলেদের ঘরে কাজ করতে দেখা যায় অনেক বাসায়। যারা বাসায় কাজ করে তাদের অনেকেরই রুচির তোয়াক্কা কেউ করে না। কেবলমাত্র পুরানো ও অভিজ্ঞ কাজের বুয়ারাই তাদের পছন্দ অপছন্দের বিষয়টাকে কাজে লাগাতে পারে, তাদের গুরুত্ব দিতে পারে। চাকরিজীবী মহিলাদের বাসায় একাধিক কাজের বুয়া থাকে। ধনী মানুষের কাজের বুয়াও থাকে একাধিক। আর দাড়োয়ান, গাড়োয়ান ও গার্ডেনার সব মিলিয়ে তাদের পরিবারের সদস্যদের চেয়ে কাজের লোক থাকে বহুগুনে বেশি। এদের অনেক বাড়িই বিশালাকৃতির যার মালিক নিজেই বাড়িতে থাকেন না। থাকেন বিদেশের বাড়িতে। ছেলেমেয়েরা হয় দেশের বাইরে লেখাপড়া করেন, না হয় বিয়ের পর বিদেশে আছেন, চাকরি নিয়ে বিদেশে গেছেন। অন্যলোকদের হাতে বাড়ি। কখনো সখনো দেশে ফিরে থাকেন বাড়িতে। ছেলেমেয়েরা আত্মীয়স্বজনদের বিয়ে খেতে অথবা দেশে ফিরব নাম করে এসে মাস খানেক থেকে যায়। অনেকটা পিকনিকের মতো তাদের দেশে আগমনের এ ক্ষণে পুরানো কাজের লোকেরা ভাইয়া অথবা আপুদের ছোটবেলার সব কথা মনে করিয়ে দিতে আবেগাপ্লুত হয়। তারাও জানে এসব অতিথি পাখি, এরা দেশে থাকবে না। যেমন আছি আমরা এভাবেই এসব ভোগ করব। পাশ্চাত্যে কাজের লোকের এ সিস্টেম একদমই অনুপস্থিত। আমরা অনেক যুক্তিযুক্ত ও জ্ঞাত কারনে পাশ্চাত্যের সমালোচনা করি, তাদের অপছন্দ করি এবং কখনো সখনো ঘৃনাও করি। তারা এনজিওর নামে বিভিন্ন গরীব ও অনুন্নত দেশগুলোতে ধর্মপ্রচার করে বেড়ায় তাই সমালোচনা করি, তারা গণতন্ত্রসহ যেসব ছবক দিয়ে বেড়ায় তা তারা অনুসরণ করে না তাই তাদের অপছন্দ করি এবং একেক দেশের জন্য একেক ফর্মুলা প্রয়োগ করার মতো নীতিজ্ঞানহীন কাজ করে বলে, মিথ্যাচার করে দেশের পর দেশে যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়ার জন্য ঘৃনাও করি। মানবিক অনেক দিকে তাদের বিপর্যয় আছে, নগ্নতা ও অশ্লীলতা তার অন্যতম। তবুও তারা নিজেদের কাজ নিজেরা করার মাধ্যমে যে অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছে এবং কাজের লোক দিয়ে নিজের ব্যক্তিগতও পারিবারিক কাজ করাচ্ছে না

www.pathagar.com

এটা অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে। শুধু প্রশংসাই না তাদের একাজটা অবশ্যই অন্যান্য মানুষের জন্য অনুকরণীয়। ইসলাম মানুষকে মানবিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে নির্দেশ দেয় আর মুসলমান নামধারী আমরা আমাদের রাসূলের (সঃ) আদর্শকে ভুলে গিয়ে মানুষের প্রভু সেজে তাদেরকে দিয়ে সকল অমানবিক কাজ করাচ্ছি। এতে আমাদের কেন লজ্জাও পাচ্ছে না। কারন লজ্জা পাবার মত বোধটুকুও আমার যে অবশিষ্ট নেই। আমি ভুলে যাই যে দশ বছরের শিশুটা আমার ছেলের ব্যাগটা নিয়ে তাকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে ফেরৎ আসছে, এসেই তাকে বুকসেলফও মোছার কাজে লেগে যেতে হয় তার ও এখন স্কুলে যাবার বয়স। একই বয়সের দু'টো ছেলে একই বাসায় খাবার খেয়ে বড় হচ্ছে। একজন স্কুলগামী অন্যজন শারীরিক শ্রমে ভাইয়াকে সন্তুষ্ট রাখতে, ভাইয়ার টেবিল মুছে রাখতে, বই গুছিয়ে রাখতে ব্যস্ত। একজন নিজের প্যান্ট শুধু নোংড়া করে, গুছিয়ে রাখতে পারে না বলে বকা খায় আর অন্যজন ভাইয়ারটা গুছিয়ে রাখে, পরিস্কার করে এবং নিজেরটাও পরিস্কার রাখে। একজন ভাইয়ার বল ব্যাট সতর্কতার সাথে, যত্নসহকারে রাখে, সিডির হিসাব রাখে, প্লেয়ার ঢুকিয়ে রাখে আর অন্যজন বিনোদন আর বিনোদনে ডুবে থাকে। টিউটর এসে তাকে পড়ার টেবিলে পায় না, হয় খেলার মাঠে না হয় টেলিভিশনের সামনে। হতাশ টিউটর খুঁজে পায় না এ ছেলের ভবিষ্যৎ কি। কিভাবে সম্ভব এমন একটা অবস্থাকে মেনে নেয়া। দু'টো বাচ্চাই পৃথিবীতে একই পদ্ধতিতে এসেছে। কেউই আবেদন করে পৃথিবীতে আসেনি। তাদের বেড়ে ওঠার পদ্ধতি ভিন্ন হতে পারে কিন্তু এমন বিপরীত মুখী ও সাংঘর্ষিক হওয়াটা কি সায়েন্টিফিক বা যৌক্তিক। এ কাজের ছেলেটাতো বড় হচ্ছে। তার বিবেক কি একদিন বিদ্রোহী হয়ে উঠবে না? সব কাজ করবে সে, আর মজা লুটবে ভাইয়া সে কি করে সম্ভব! ওর এ বিদ্রোহ তো পরিবেশ দূষিত করবে। ভাইয়ার বাবাতো সহজে ছাড় দেবেন না এবং তারা ছাড় দিতে শেখেনওনি। এই কাজের ছেলের ভবিষ্যৎ কি। ওতো বাবা মা ছাড়া থাকে। তার মানসিক প্রবৃদ্ধি হবার কতটুকু সুযোগ আছে। এ ছেলেটা কি মৌখিক ও শারীরিক এ্যাবুজের শিকার হবে না। যতোক্ষন সে সজাগ থাকবে ও কি কাজ ছাড়া থাকবে? ভাইয়ার মতো ওর কি বিশ্রামের কোন সুযোগ আছে? হাজার, লাখ শিশু কিশোর এভাবে বাসায় কাজ করে শারীরিক নির্যাতনের শিকারই হয় না তারা ভাইয়াকে ও আপুকে তারই সেবাযত্নে এভাবে বড় হতে দেখে ট্রমাটাইজড। সে একসময় দুশ্চিন্ত গ্রস্থ ও হতাশ হয়ে যায়। এ জীবনটাকে তার বোঝা মনে হয়। বাবা মা বেঁচে থাকতেও যে এতিম, যার শিক্ষার, বিনোদনের কোন সুযোগ নেই, যে তার অধিকারের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলতে অক্ষম তার এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার প্রয়োজনই বা কী! সে পথ খুঁজতে থাকে চিরদিনের জন্য বেঁচে থাকার পথ। এ সকল বাচ্চারা বাসায় কাজ করতে গিয়ে শুধু খালাম্মা খালু নামক গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রীরই মারধর ও বকাঝকার শিকার হয় না ভাইয়ার হাতের মার ও খেতে হয়। আমরা এগুলো দেখতে দেখতে অভ্যস্থ বলে আমাদের হৃদয় নাড়া দেয় না, গা সওয়া হয়ে গেছে। এ বাচ্চাটা কিছুদিন পর এ বাসা থেকে পালাবে। কারন কাজ ভাল লাগে না বললে ওর বাবাকে ডেকে ধরিয়ে দেবে সে

www.pathagar.com

ভয়ে ও পালাবে। পালিয়ে ও রাস্তার একটা ভবঘুরে ছেলে হবে। তারপর মিনতি টানা, লেদমেশিনে কাজ করার মতো কিছু একটা হয়তো বা করবে। কাজের প্রতি ঝোক থাকলে বেঁচে যাবে নয়তো অন্ধকার জগতের সদস্য হবে, নেশার জগতে প্রবেশ করবে। সমাজ যাকে সমাদর করেনি, যার প্রতি অনাচার করেছে সে কিভাবে আর ভাল হবে। সামাজিক শিক্ষাইতো তার ত্রুটিপূর্ণ। ভাল কিছু উপহার দেয়ার মতো ইচ্ছাই তো তার আর হবে না। একই বয়সের মেয়েরা যখন বাসায় কাজ করে সেখানে আরও দু'একটা বাড়তি ঝামেলা থাকে। গালমন্দ, মারধরের সাথে থাকে যৌনাচারের ভয়। কার মাধ্যমে কিভাবে সেটা হয় না বলাই ভাল। যেখানে কোন ধরনের সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা কাজ করে না সেখানে এ সকল কিশোরীরাতো কোন ভাবেই নিরাপদ নয়। তারা শিক্ষা পায় না, বাবা মা ভাই বোনের আদর ভালোবাসা পায় না, মানবিক অধিকার পায় না - পায় কেবল দু'বেলা খাবার। এমন একটা মেয়ে কারও বাসায় কাজ করতে করতে তারুণ্যে পড়ে এবং তার বিয়ের কথা ওঠে। তার বিয়ের ব্যাপারে কথা উঠলে তার পরিচয় পর্ব আসে। পাত্রীর পরিচয় কে না জানতে চায়। বাংলায় অনার্স পড়ে, বুয়েটের ছাত্র- ইলেকট্রিক্যাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকোনমিকসে ফাইনাল ইয়ার, বাবা ব্যবসায়ী, উত্তরা উইমেনস মেডিকেলের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী, গায়ের রং ফর্সা, ডাক্তার গাইনী পার্ট ওয়ান করে পিজিতে অনারারী করছে, মেয়ে নবমশ্রেণী পর্যন্ত পড়ে আর পড়েনি ফাইভ এইটে বৃত্তি পেয়েছিল। এসব হচ্ছে পাত্র পাত্রীর পরিচয়। এর সাথে বাবা মাও আত্মীয় স্বজনের পরিচয়তো আছেই। তরুনী ঐ কাজের মেয়ের পরিচয় কি? সে হচ্ছে অমুক সাহেবের বাসায় কাজের মেয়ে। পাত্র যেই হোক এটা হজম করেই তাকে বিয়ে করতে হয়। বাসর ঘর হয় কাজের মেয়ের সাথে যার কোন ব্যক্তি স্বাধীনতা নেই। যে তিনবেলা খায়। কিন্তু অনেক তরকারী নিজে রান্না করলেও জানে না যে সে কোন তরকারী দিয়ে খাবে। যার সারাদিনের কর্মসূচী সে নির্ধারন করে না। বিশ্রামের সময় দ্বিতীয়বারের জন্য ঘর মুছতে হয়, রাস্তার পাশে বাসা বারবার মুছতে হয়। একটা ষোল সতের বছরের কাজের মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব আসে। বাবা গ্রাম থেকে মেয়েকে ফেরৎ চেয়ে খবর পাঠায়। মেয়ে সাবালিকা হয়েছে বিয়ে দিতে হবে নানান জনে নানান কথা বলে। এ খবর পেয়ে বাসার মালিক ও তার স্ত্রীর মেজাজ খারাপ। এতোটুকু মেয়েটাকে বিয়ে দেবে। পুলিশে দেয়া দরকার। প্রস্তাব গ্রাম বা শহর যেখান থেকেই আসুক তার পরিচয় হচ্ছে সে কাজের মেয়ে। এ অবস্থায় তার বিয়ে হবে, বাসর হবে। যে রিক্সাওয়ালার সাথে তার বিয়ে হল সে একজন ভিটেমাটিহীন যুবক। তার শরীর আছে, কিন্তু শরীরে ব্যারামের শেষ নেই। মফস্বল শহরে রিকশা চালিয়ে দু'চার পয়সা যা পায় মা বোনসহ একটা জমিতে থাকে, যার মালিক কোন টাকা পয়সা এজন্য দাবী করে না। ভাঙ্গা পাটশলা আর খড়কুটার ঘর/বেড়া। টিন কেনার জন্য জমানো টাকা দিয়ে এখন বিয়ে করছে। এরপর আরও মুখ আসবে। রোগীর শরীর, বারবার ডাক্তারের কাছে যেতে হয়। এ অবস্থায় কাজের লোকের ঘরে আগমন কতোটা শান্তিময় হবে তা সহজেই অনুমেয়। এ মেয়েটা যে ঘরে থাকবে পাশের ঘরে মা মেয়ে অর্থাৎ শ্বাশুড়ী

www.pathagar.com

ননদ। তাদের একান্ত নিজস্ব কথাগুলোর আর কোন স্বকীয়তা থাকলো না। বেড়ার ফাঁক দিয়ে মা বা বোন না শুনতে চাইলেও তাদের কানে তা প্রবেশ করবে। বিয়ের পরের এসব দিনক্ষন উপভোগ করার জন্য মানুষ 'হানিমুন' করে দেশের বাইরে চলে যায়। লাখ লাখ টাকা খরচ হয় তার পেছনে। আর, ষোড়শী মেয়েটার আগেভাগেই শংকিত বাবা তার ভবিষ্যতের কথা না ভেবেই বিয়ে দিয়ে দিল তার একি কপাল যে স্বামীর বুকে পাঁচটা মিনিট কাটাবার সুযোগ ও সে পাবে না। এ অবস্থার জন্য কে দায়ী। দায়ী আমরা সকলে। আমাদের পরিবারে যে কম আয় করে সে কি খাবার টেবিলে কম খায় বা তরকারী একটা কম নেয়? নেয় না, এ সংসারের সদস্য হিসেবে তার এটা অধিকার। সন্তানদের মধ্যে যার পড়াশুনার মান বা রেজাল্ট খারাপ সে কি কম সুযোগ সুবিধা পায়? বরং অনেক সময় বেশি পায়। বেশি টিউটর দেয়া, উৎসাহিত করার জন্য এটা ওটা কিনে দেয়া হয় তাকে। তেমনি আমাদের সমাজের এমন অবহেলিত লোকদেরও আমাদের টেনে তোলা উচিৎ। সবসময় অর্থনৈতিক ভাগ্যোন্নয়ন খুব দ্রুত করা হয়তো সম্ভব হয় না কিন্তু তাদের ন্যায় বিচার পাওয়া, সামাজিক স্বাধিকারটুকু প্রাপ্তি অন্ততঃ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এসব দায়িত্ব আমাদের শিক্ষিত ও ধনীক শ্রেণী লোকদের উপর বর্তায়। আমরা তাদের এ দুরবস্থার জন্য প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে দায়ী। প্রমান করার প্রয়োজন নেই এজন্য যে পাঠক মাত্রই জানেন এর প্রমান আমাদের চারপাশের সব দৃশ্য। আমাদের ঘরে কাজের মেয়ে বা বুয়া আছে। ছোট ছেলে বা মেয়েদেরও আমরা রাখি আমাদের সহযোগিতার জন্য। আমরাই নিজেকে প্রশ্ন করি আমরা কি তাদের সাথে আমাদের আচরণে সন্তুষ্ট? তাদের কি আরও কিছু পাওনা আছে আমাদের কাছে। সেকি তার সকল অধিকার পায় এখানে? তার মনের কথাগুলো কি প্রকাশ করার সুযোগ আমার বাসায় আছে? আমার স্ত্রী ও সন্তানরা কি তার সাথে সুআচরণ করে। একটিবার ও কি তাকে কেউ গালমন্দ করেনি অথবা বাজে কথা বলেনি? আমার বাসার কেউ কি কোনদিন তাকে ভাতের খোটা দেয়নি? উত্তর আপনি পাবেন, উত্তর আমি পাব। সে উত্তরটাই হচ্ছে আমাদের দোষ স্বীকার। আপনি বা আমি সমাজের উন্নতি চাই এবং সারাদিন এচিন্তায়ই অস্থির থাকি সমাজ সংস্কার মূলক কি কি কাজ করা যায়। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য। কাজ করার ইচ্ছা আমাকে তাড়িত করে বেড়াচ্ছে অথচ আমি এটুকু বুঝতে অক্ষম হচ্ছি যে আমার বাসার এই কাজের মেয়েটার অধিকার সে যেদিন ফেরৎ পাবে সেদিন অনেক সংস্কার এমনি হয়ে যাবে। আমার সন্তানগুলোর মতোই দেহ ও মন নিয়ে এ কিশোর কিশোরীরা বেড়ে উঠছে। অতএব আমার দু'সন্তানের সাথে আর একটা সন্তান এই মেয়েটাকে বিবেচনায় রেখে আমার পরিকল্পনা করলে তখন দেখা যাবে সে তার সকল অধিকার ফেরৎ পাচ্ছে। আমার আত্মাও শান্তি পাবে। আমি যদি তাকে আমার সংসারের সদস্য হিসেবে মেনে নেয়ার চেষ্টা করি তাহলে সফলতা অবশ্যই আসবে। আমার স্ত্রী একবার দু'বার না বুঝলেও, আমার সন্তানরা প্রথমতঃ এটাকে বাড়াবাড়ি মনে করলেও তাদেরকে 'মানুষের মর্যাদা' বুঝালেই তারা বুঝতে পারবে। আমাদের

www.pathagar.com

রাসূল (সঃ) তার ব্যক্তিগত কাজ কাউকে দিয়ে করাতেন না। কোথাও দলবদ্ধ ভাবে কাজ করতে গেলে নিজে কঠিন কাজটা নিতেন। সমাজের অন্যান্য লোকদেরকে নিজের মতো বিবেচনা না করলে তাকে নবী করিম (সঃ) তার দলভূক্ত লোক নয় বলে ঘোষনা দিয়েছেন। আমি আমার সুন্দর আচরণ ও ভালোবাসা মাখা হৃদয় নিয়ে যদি আমার পরিবারকে এই কাজের মেয়েটার বিষয়ে বলি তারা অবশ্যই আমার সাথে একমত হবে। ও যেমন ইচ্ছা করে ওর গরীব বাবার সংসারে আসেনি তদ্রুপ তোমরাও ইচ্ছা করে আমার ঘরে আসনি। ঘটনাটা উল্টোও হতে পারতো। সুতরাং একে আমাদের আর একজন রক্তীয় বান্ধব বলে মেনে নিলেই ও আর কাজের মেয়ে হিসেবে অরক্ষিত না থেকে সুরক্ষিত থাকবে, পাবে তার সকল মানবীয় অধিকার। এমন হাজার লাখ কাজের মেয়েকে আমরা আমাদের পরিচয়ে ভাল বিয়ে দিতে পারি। তারা আমার বাসারই একটা রুমে বাসর রাত কাটাতে পারে, বিয়ের পর সাভারের জমিটাতে একটা ঘর তুলে দিয়ে কয়েকটা গাভী কিনে দিলে ঐ মেয়েটা গাভীগুলো দেখবে। ছেলেটা রিকশা চালাবে। এমনটা করা শুধু ইচ্ছার ব্যাপার। এতে সম্পদহীন বা গরীব হয়ে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই। কাজের মেয়ে বা বুয়া যাই বলি না কেন এমন টাইটেল নিয়ে সমাজে বেঁচে থাকা কতোটা কষ্টের তা আমাদের ভাবতে হবে। এর বিড়ম্বনার শেষ নেই। যে খাবারটা এই বুয়া তৈরী করল, পাকালো সেটা সে খেতে পারবে না, খেতে পারলেও সবার শেষে খাবে। গৃহিনীর অনুমতি ছাড়া কখনো কোন খাবার তুলে মুখে দিলে এটাকে চুরি হিসেবে ধরা হবে। পার্টিশেষে সব মেহমান বিদায়ের পর রাত সাড়ে এগারটায় ক্লান্ত শরীরে প্লেট-বাটি ধোয়া মুছা শেষে আর ক্ষুধা থাকেনা, পোলাও রোষ্ট খাবার কোন ইচ্ছে থাকে না। তখন একটু বিশ্রাম চায় শরীর। আমাদের সব বাসাবাড়ীতেই একই চিত্র। পুরুষরা বিষয়টা নিয়ে কম ঘাটাঘাটি করেন এবং সাধারণতঃ এসব ক্ষেত্রে কিছুটা উদার হন। তবে মেয়েদের হার মানিয়ে দেবার মত পুরুষলোকও আছে যারা কাজের বুয়া বা বাচ্চা ছেলেমেয়েদের পেছনে লেগেই থাকে। ওরা একদিকে সামান্য একটা ভুলের জন্য কাজের মেয়েটার গায় হাত তোলে আবার তার ছেলের বড় একটা অন্যায়কে থাক কিছু হবে না, বুয়া মুছে ফেলবে, ঝাড়ু দিয়ে কাঁচের টুকরো গুলো সরিয়ে ফেলবে বলে মেনে নেয়। এমন দ্বিমূখী চরিত্র ওয়ালা লোকের ঘরে কাজে নিয়োজিত ছেলে হোক কিংবা মেয়ে হোক তাদের মনে কষ্টের কোন শেষ থাকে না তাদের সন্তানরা বাবা মার এহেন চরিত্র দেখতে দেখতে বড় হয়। আশে পাশে এমন আচরণ দেখে। বড় হলে এটা সাধারণ ও স্বাভাবিক আচরণ বলে মনে করে তারাও একই আচরণ উপহার দেয়। অতএব গৃহভৃত্যদের সাথে অমানবিক আচরণই একটা কৃষ্টিতে পরিণত হয়। আমরা পত্রিকার পাতায় অনেক ঘটনা পাই যা পড়লে শিউরে উঠতে হয়। কাজের লোকদের অনেক ক্রুটি থাকে যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বেয়াদবী করা। বেয়াদবীর সংজ্ঞা হচ্ছে যখন যা যেভাবে কাজ করতে বলা হবে তা সেভাবে না করা। চাওয়ার সাথে সাথে হাজির না করলে বেয়াদবী, ভুলে যাওয়া যাবে না। ক্লান্তিতে কখনো মালিকের আগে ঘুমিয়ে পড়া যাবে না। এসব 'না' বোধক

শর্ত লিখিত আকারে থাকে না বটে তবে আমরাও যেমন তাদের এ্যালাউ করি না চাকররাও বোঝে এটা তাদের পাবার অধিকার নেই। এবং তাই বলতে শোনা যায় সমাজ মেনে নিয়েছে। সমাজ এবং সামাজিক রীতি নীতি বিশাল এক শক্তি যার গণ্ডি পেরুনো খুব কঠিন। সামাজিক নিয়ম কানুন ন্যায় অন্যায়ের অনেক উর্ধ্বে। তাই ঠিক - বেঠিক, ন্যায় অন্যায় কিংবা সত্য মিথ্যা দিয়ে সব সময় সামাজিক সংস্কার কিংবা কুসংস্কারকে পাল্টানো যায় না। সামাজিক রীতি বা কৃষ্টি অনেকদিন ধরে নির্মিত হয় যাতে সমাজের সকল শ্রেণীর সকল পেশার লোকের অনুমতি থাকে। অন্ততঃ সিংহভাগ লোকের নিশ্চুপ মতামতের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে সামাজিক সংস্কৃতি যাকে খারাপ বা ভালো বললে কারও কিছু যায় আসে না। এজন্য প্রয়োজন ঐ সমাজের লোকগুলোর রুচিতে আঘাতহানা, তাতে কাজ হবে। সমাজের মানুষগুলো বুঝতে পারবে, সচেতন হবে। তাই যারা সমাজের ব্যাপক পরিবর্তন চান, সত্য-ন্যায়ের হাত ধরে সমাজের বিনির্মান কামনা করেন তাদের উচিৎ সমাজের সংস্কার সাধন এবং সে সংস্কারে প্রাধান্য পাবে সত্য ও ন্যায়ের শ্লোক গাথা। পৃথিবীর ইতিহাস তাই বলে। যে সমাজ সভ্যতা আমাদের নাড়া দেয়, আমরা ইতিহাসের পাতায় যাদের ঐতিহ্য গৌরবের খবর বেশি দেখতে পাই সে সব সমাজে অনেকদিন ধরে সমাজ বিনির্মানের কাজ চলে। তাদের মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে অনেকদিন ধরে এবং সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনায়। যে কাজের বুয়া প্রথা আমাদের সমাজে চালু আছে তা ধরে রাখার বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তি কতোটুকু আছে অথবা মানবীয় দৃষ্টি ভঙ্গি থেকে এটা কতোটুকু গ্রহণযোগ্য সে বিচার করার সাথে সাথে এটাও দেখতে হবে যে, সমাজের লোকজন এ প্রথাটাকে কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখছে। বিষয়টি যদি খুবই অগ্রহণযোগ্য হয় তবে এ প্রথা রহিত করার জন্য পাবলিক এ্যাপ্রোচ করতে হবে, সমমনা লোকদের নিয়ে এ ব্যাপারে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। এতে খুব সহজেই যেটা হবে তা হচ্ছে বাসাবাড়ির মালিকরা আর ও সজাগ হবেন, তাদের মাথায় ঢুকবে যে কাজের বুয়া না থাকলে তার অসুস্থ্য শরীরে এসব ধোয়া মোছা থেকে শুরু করে সব কাজ করতে হবে। জাহান্নাম হয়ে যাবে পৃথিবীটা। তাদের আচরণেও পরিবর্তন আসবে আর কাজের বুয়ারা অনেকটা মানবিক জীবনযাপন করবে। এমনও হতে পারে কাজের বুয়াদের প্রাদুর্ভাব হলে বেতনটাও বেড়ে যাবে অনেক। সেক্ষেত্রে বাসার মালিককে প্রভূর মতো বিবেচনা না করে ও বুয়ারা বাঁচতে পারবে।

প্রভু সাজার বীজটা মোটামুটি ভাবে আমাদের সকলের মধ্যেই আছে। পরিবেশে সেটার প্রবৃদ্ধি হয়। কারও কারও ক্ষেত্রে এটা চারাগাছ ও থাকে না। মানুষের প্রভু সেজে বসার ইচ্ছাটা মহীরুহের আকার ধারণ করে। তারা ফেরাউন টাইপের আচরণ শুরু করে মানুষের সাথে। আল্লাহ সকল মানুষকে সম্বোধন করে তার ইবাদাত করার জন্য বলেন সুরা আল বাকারায়। সকল নবী রাসুল (সঃ) দের দাওয়াতের বক্তব্য ছিল যে এক আল্লাহর ইবাদাত করা এবং তার সাথে কোন শরীক না করা। অর্থাৎ

আমরা আল্লাহর গুনাবলীর যেভাবে প্রশংসা করি, যেভাবে আল্লাহকে বড় ভাবি এবং তার কাছে চাই সেভাবে কোন মানুষকে যেন প্রশংসা না করি কিংবা ক্ষমতার দিক থেকেও কাউকে সেখানে না বসাই তখন এসব লোকরা প্রভুত্বের স্বাদ পেয়ে যায় এবং তারা প্রভুর মতো আচরণ শুরু করে। অন্যদের কাছ থেকে দাসের মতো সেবা আশা করে। এটা একটা মারাত্মক রোগ। আমাদের সমাজে এ ব্যাধি আছে। এ ব্যাধিটা থাকার জন্য শিক্ষিত অশিক্ষিত বা ধনী গরীবের কোন বাছ বিচার প্রয়োজন হয় না। সাধারণতঃ যারা তাদের বিদ্যা বুদ্ধি, টাকা পয়সা ও অস্ত্রশস্ত্রের শক্তি দিয়ে অন্যদের ডমিনেট করে তাদের মধ্যেই প্রভুর আচরণটা বেশি। অনেক সময় অনেক নিরক্ষর ও কমবুদ্ধির লোকও তাদের পেশি শক্তির জোরে প্রভুর আসনে বসে যায়। আমাদের দেশে যে গণতন্ত্রের কথা শোনা যায় সব রাজনৈতিক দলের মুখে তাদের কর্মীরাই বলুক দলে গণতন্ত্র না থাকলে কি দেশে কোন দল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারবে? অথবা তাদের দলে কি গণতন্ত্র আছে? নেতা নেত্রীদের সমালোচনা করাতো দূরে থাক তাদেরকে নির্বাচনের মাধ্যমে দলীয় পদগুলো দখলের পরামর্শ দেয়া কি সম্ভব হবে? কাজের লোকদেরকে আমরা দাসের মতো খাটাই, মানুষের মতো আচরণ তাদের সাথে করি না। কোন স্বাধীকার তার থাকে না মোট কথা সে এক অমানবিক জীনযাপন করে। প্রভু ও দাসের সম্পর্কটা সেখানে খুব স্পষ্ট। কাজের বুয়ারা পেটের টানে, খুব বিপদে পড়েই এ অবস্থাটা মেনে নেয়। সুযোগ পেলেই তারা সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় এ বন্দী অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করে। কোন গার্মেন্টসে চাকরি নিয়ে নেয়। অশিক্ষিত এসকল মেয়ে, মহিলা বা বাচ্চারা পেটের দায়ে কারও, সেবাদাসের মতো আচরন করলে কাউকে প্রভু মেনে নিয়ে পেট বাঁচাতে চাইলে মানায় কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে কর্মীদের এহেন আচরন কতোটা মানানসই। এজন্য দু'পক্ষই দায়ী। যিনি প্রভু সেজে বসেন তার এতো প্রশংসা এতো চাটুকারিতা এতো তোষামোদ খুবই ভাল লাগে। চারপাশে স্তুতি শুনতে শুনতে সে অনেকটা নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে এবং এক সময় সে তার বড়ত্ব শুনতে না পাইলে ক্ষেপে যায়। সে ক্ষমতাধর মানুষ অতএব ক্ষমতার ব্যবহার, অপব্যবহার সে নির্বিচারে করতে থাকে। তাতে মানবতা ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বিশ্ব রাজনীতি ও দেশীয় রাজনীতিতে সর্বত্রই এটা আমরা যুগযুগ ধরে দেখে আসছি, আজও দেখছি। যারাই মানুষকে অতিমানব বানিয়েছে, যারাই মানুষ হয়ে অন্য মানুষকে প্রভুর আসনে বসিয়েছে সে জাতি ধ্বংস হয়েছে। এতে সামাজিক কোন উন্নতি হয় না, কাজ হয় না। স্বাভাবিক প্রবাহ দারুনভাবে ব্যাহত হয়। সবকিছু একটা নির্দিষ্ট গণ্ডিতে ঘুরপাক খায়। দেশ জাতি থমকে দাঁড়ায়। সবাই ব্যস্ত থাকে প্রশংসা করার প্রতিযোগিতায়, প্রভুর গুণগানে ভরিয়ে তোলে আসর। এ কালচার এতোটাই ক্ষতিকর যা আমাদের জাতি আজ হারে হারে টের পাচ্ছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী মানুষগুলোই এ চর্চাটা বেশি করেন। তারা তাদের লেখনী বক্তৃতায় এ চর্চাটা সুন্দরভাবে বজায় রাখেন। কি কারণে করেন, তারাই ভাল জানেন। আমাদের রক্তে কি সেবাদাস সাজার জিনটা এতোই স্ট্রং। কোনভাবেই তো চাটুকারীতা কমছে না

www.pathagar.com

অন্যকে দাস বা ভৃত্যের চেহারায় এবং নিজেকে পীর বা প্রভুর চেয়ারে দেখতে খুব ভাল লাগে আমাদের। এ চর্চাটা যে আমাকে ও একসময় দাস বানায় তাকি আমি বুঝি, তা কি আমি টের পাই। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যখন আমরা কোন কাজ চাপে পড়ে করি, হাসতে ইচ্ছা না করলেও হাসি। কাউকে খুশী করার জন্য, কাউকে আঘাত করতে মন না চাইলেও আঘাত করি। বড় কারও মনরক্ষায় তখন এটাই দাসের কাজ। আমরা কিংবা কাজের বুয়ারাই কেবল দাসের ভূমিকায় নেই যারা এ প্রথা আমাদের সমাজেই রাখার ব্যাপার মূখ্য ভূমিকা পালন করছেন তারাও দেশের মধ্যে প্রভু সাজেন ঠিকই, পার্টির কর্মীদের কাছে দেবতা কিন্তু দেশের বাইরে ফকিরের মতো দয়া, করুনাও অবৈধ অনৈতিক স্বীকৃতি ভিক্ষা করেন। তারা দেশের বদনাম করে নিজ স্বার্থ হাসিল করেন যা অন্যায়। কাকে খুশী করার প্রয়োজন আমাদের। গৃহপরিচারিকা হিসেবে যাদেরকে আমরা বাসা বাড়িতে কাজ করতে দেখি তাদের পেটের ক্ষুধা এতোটাই বেশি যে মৌলিক মানবিক অধিকারের প্রসঙ্গ সে তখন ভুলে যায়। মাইক্রোক্রেডিট ঋণদাতারা ২৫-৩০% কোথাও ৪০% হারে সুদ আদায় করে। এ চড়া সুদের খবরটা ঋণ গ্রহীতারা জানে তারপরও অনোন্যোপায় হয়ে মেনে নেয়। কারন এ পদ্ধতিতে ঋণটা পাওয়া সহজ। তার প্রয়োজন এখনই। তাৎক্ষনিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য তাই গরীব লোকরা চড়া সুদের হিসাবটা জেনেও ঋণ নিতে বাধ্য হয়। অপমানজনক চাকরি বুঝেও গ্রাম থেকে এসে তাই বুয়ার চাকরি নিতে হয় এসব হতভাগ্য লোকদের। যৌন হয়রানির শিকার হবার কথা জেনেও শহুরে দানবদের ড্রইংরুমে পা ফেলতে হয় এই অসহায় উঠতি বয়সের বালিকাদের, বুঝতে না বুঝতেই বাবা মার পিড়াপিড়িতে তাদেরকে এহেন কাজে আসতে হয়। রাজধানী ঢাকায় শিক্ষিত গৃহিনীকে গরম খুনতি দিয়ে কাজের মেয়েকে ছ্যাক দেবার খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ কাজটা চিকিৎসক গৃহিনী যেমন করেছে তেমনি করছে উকিল, সাংবাদিক ও শিক্ষক গৃহিনী পর্যন্ত। তারা মানসিকভাবে অসুস্থ এটুকু বলে ছেড়ে দেয়াটা মনে হয় ঠিক না। তাদের অত্যাচারের শিকারতো তাদের অফিসের কেউ হয় না, তাদের বাচ্চাদেরতো তারা অনেকেই মারেন না। কেবল চাকর মারার, নির্যাতনের অভ্যাস আছে, ওদের সাথেই সব মেজাজ। এমন বিরাট সংখ্যক গৃহকর্তী আছেন তাদের মধ্যে চাকরিজীবী ও গৃহিনী উভয় পক্ষই আছেন। যারা চাকরিজীবী তারা যেহেতু সমাজের দশজনের সাথে মিশছেন, দেখছেন, বুঝছেন অনেককিছু প্রয়োজনে দেশ বিদেশ ঘুরছেন তাদের মনটা আরও প্রশস্থ, বিবেক আরও জাগ্রত এটা ভাবাই স্বাভাবিক এবং তাদের কাছ থেকে সুআচরণ আশা করা দোষের কিছু নয়। কিন্তু বাস্তবিকভাবে কাজের বুয়াদের সাথে তাদের আচরণও হতাশাজনক। যারা অন্যত্র দয়ামায়া দেখান। সভা সমিতি করেন এবং জ্ঞান বিতরণ করেন এমন এক শ্রেণীর মহিলাদের ও দেখা যায় কাজের বুয়াদের সাথে প্রভু সূলভ আচরণ করতে। এর কারন হয়তো এই যে কাজের বুয়াটা একটা পদার্থ যে চব্বিশ ঘন্টার জন্য আমার অধীন। সে সব সময়ই আমার হুকুম মেনে চলবে। যখন যা যেভাবে চাইব সেভাবে সরবরাহ করবে। এর ব্যত্যয় ঘটলেই সমস্যা। ওকে অকারণে

বসে থাকতে দেখলে সম্ভবতঃ কষ্ট হয় গৃহকর্তা কর্তীদের। তাই কাজে ব্যস্ত রাখা দরকার। ফরমায়েস দিয়েই রাখতে হবে সবসময়। কাজের মেয়ে কাজের বুয়ারা কখনো সুন্দরভাবে চলবে না। ভালভাবে চুল আচরাবে না, লিপষ্টিক লাগানো আর পলিস লাগানোরতো প্রশ্নই ওঠে না। এতো যে শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপন একদিন শ্যাম্পু লাগালেও বিপদ। কাজের মেয়ের সবকিছু থাকবে সাবস্টান্ডার্ড। আমার মেয়ের চেয়ে ওর চুল সুন্দর হবে না, দেখতে হতে হবে খারাপ- অসুন্দর, দাঁত মাজবে ছাই দিয়ে, পোশাকতো পুরানো পড়বেই। কথাবার্তায় রুচিতে অশিক্ষিত আল্লাহর বান্দী যদি একটু চোখে পড়ার মতো হয় এতে বাসার মালিকরা আনন্দবোধ না করে অস্বস্তিবোধ করেন। তাড়াতাড়ি ওকে বিদায় করে দেন। এই চোখে পড়ার মতো সুন্দর রুচির মেয়েটা বাইরে গিয়ে অধিকতর নোংরা লোকের খপ্পরে পড়ে যাবে তারচে এখানেই তাকে একজন ভাল মানুষের মর্যাদা দিয়ে রাখা যেতো যাতে বাড়িওয়ালার সম্মান বাড়তো সমাজে। মানসিকতার কোন পরিবর্তন না হবার কারনে আমরা যুগ যুগ ধরে একই স্থানে রয়ে যাচ্ছি। শুধু খুনতি অত্যাচার নয় এমন কোন পাশবিক আচরণ নেই যা এ সমাজে ঘটছে না। যে কারণে কোথাও কোথাও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এসব কাজের লোকরা। তারা প্রতিশোধ নেয় অনেক বাজে ভাবে। আইন নিজের হাতে তুলে নেয় তারা, কখনো এসব গৃহিনীদের অত্যাচার নির্যাতনের আইনী সহযোগিতা পায় না, বিচার পায় না। বিচার একটাই পুন অত্যাচার অথবা গলাধাক্কা দিয়ে বিদায় করে দেয়া। এ অবস্থাটা কি চলতেই থাকবে? আমাদের মধ্যে কি মানবিক বোধটা কোনদিনই কাজ করবে না। যারা আমার আগে ঘুম থেকে জেগে আমার জন্য নাস্তা তৈরী করে, অফিসে যাবার আগেই কাপড় ইস্ত্রী করে রাখে, বাচ্চাদের ব্যাগ বই গুছিয়ে নিচে গাড়ি পর্যন্ত ভাইয়াকে এগিয়ে দেয়। যে অসুস্থ থাকলে দুপুর, রাতের খাবার টেবিলে আসে না। যার হাত না লাগলে ইলিশ মাছ কড়াই এ পুড়ে যায়, যার অনুপস্থিতিতে বুক সেলভেও ময়লার আস্তরন পড়ে, বাথরুমে গন্ধ ছড়ায় তাকে পাত্তা না দিলে, তাকে ভাল না বাসলে, তার প্রতি দয়ামায়া না বাড়ালে আমারইতো ক্ষতি। এতোটুকু বুঝদার কি আমি হব না? তার উপস্থিতিতে আমার সন্তানরা উৎফুল্ল থাকে, তার সান্নিধ্যে আমার মেয়েরা প্রানচাঞ্চল্য ফিরে পায় ওর সাথে গল্প করে মজা পায়। অতএব ওকেইতো আমার প্রয়োজন। ওর জন্য আমার একটা বাড়তি রুম, বাথরুম পোশাক আশাক দিতেও আপত্তি থাকার কথা নয়। অথচ আমরা অবিবেচকের মতো উল্টো কাজটাই করি। আমাদের আরও সচেতন হতে হবে। বিবেকটাকে ট্রেনিং দিয়ে আরও টনটনা করতে হবে। আর বুদ্ধি বিবেচনাকে বাস্তব সম্মত ভাবে স্বকীয় ধারায় কাজে লাগাতে হবে। আর দশজন কি করলো কিছু যায় আসে না। আমার বিবেক কি রায় দেয় সেটা আমার কাছে বিবেচ্য। আমি আমার আত্মার শান্তির জন্য এই কাজের লোকদের ভালবাসবো, তাদের প্রতি ইনসাফ করবো, তাদেরকে আমারই পরিবারের সদস্য হিসেবে বিবেচনা করব।

www.pathagar.com

দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে অক্টোবর ২০০৭ এর সাইক্লোন সিডর আঘাত হানলে পুরো এলাকা দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অনেক মানুষ মারা যায়। সরকারী হিসাব যাই হোক নিরপেক্ষ জরীপ দশ হাজার। গরু ছাগল হাঁস মুরগী মারা গেছে, পানিতে ভেসে গেছে। ঘর বাড়ি পড়ে গেছে, ভেঙ্গে গেছে, টিনের চালা উড়ে গেছে। পুকুরভর্তি মাছ পানির টানে চলে গেছে। অনেক গাছ উপড়ে গেছে, ভেঙ্গে পড়েছে। ট্রলার ভেসে চলে গেছে। ক্ষেতের ফসল নষ্ট হয়েছে মাঠের পর মাঠ। স্কুল ঘর ভেঙ্গে গেছে, ইলেকট্রিক লাইন ঠিক নেই। সব মিলিয়ে অক্টোবরের সেই ভয়াবহ বিপর্যয় বর্ণনাতীত। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর কি তৎপরতা ছিল আমাদের চোখে পড়েনি। ঘটনার পর সরকারী তৎপরতা ও দেশ বিদেশের সাহায্য সংস্থার তৎপরতা চোখে পড়েছে। লোকজন যথেষ্ট সহযোগিতা পেয়েছে এবং এখনো পাচ্ছে। ত্রাণ বিতরনে অনিয়ম হয়েছে তবে আগের মত লুটপাট হয়নি। সিডরে দু'পেশার লোক বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। কৃষক ও জেলে। যারা এ অঞ্চলে ব্যবসা করেন তাদের ব্যবসাও ধানচাল ও মাছ কেন্দ্রিক। কৃষকরা গ্রামে থাকে ক্ষেতখামারে কাজ করে। তাদের অধিকাংশ লোকই সাধারণ ও সহজ সরল জীবন যাপনে অভ্যস্থ। সার বীজসহ কৃষি উপকরণের মূল্য বৃদ্ধিতে কৃষকরা দিশেহারা। এরমধ্যে সিডর তাদের সব কেড়ে নিয়ে গেছে। আমরা যে কোন পেশার লোকদের বিবেচনা করি ঐ পেশার কাদের সাথে আমাদের কতটুকু পরিচয় আছে বা পেশাটার উপর তাত্ত্বিক জানার উপর। একজন গ্রাম্য জীবন যাপনে অভ্যস্থ মানুষ তার অবস্থানগত কারণেই অনেক কিছু পায় না। যা আমাদের জন্য অধিকার সেটা তাদের জন্য সুযোগ। অনেকেই বিদ্যুতের মুখ এখনো দেখেনি। সেই হেরিকেন ও কুপি বাতিই আজও অবলম্বন। অনেক গ্রামে পাকাতো দূরে থাক একটা ভাল কাঁচা রাস্তাও নেই। কাদাপানি একজন কৃষকের সঙ্গী। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে বৃষ্টির মধ্যে দিনে রাতে তাকে ক্ষেতে কাজ করতে হয়। পুরো প্রকৃতির উপর নির্ভর করে চাষাবাদ করতে হয় বলে হাটু বা কোমর পানিতে কাজ করতে হয় তাদের। হাল বাইতে হয় গরু দিয়ে। গরু ভিজে, নিজেও ভিজে। হাল না বাইলে সময় চলে যাবে, পানি কমার অপেক্ষায় থাকলে জমি খিল যাবে। বীজ বপন করা যাবে না। সেই শ্রাবণ ভাদ্দরের গ্রাম্য কাঁদার জীবন একজন কৃষকের নিত্যদিনের সঙ্গী। ঝপঝপ বৃষ্টিতে কোন জোংরা কাজ করেনা ভিজতে তাকে হয়ই। সেই সকালে কাজে গেলে খালিপেটে কাজ ফেলে আসা যায় না। মা মেয়েকে পাঠায় পান্তা নিয়ে ক্ষেতে, আর ছেলে যায় স্কুলে। ক্ষেত থেকে রাত করে ফিরতে হয়। সাপে কাটে, ওঝা আসে। কেউ মারা যায়, কেউ জীবন ফিরে পায়। হাটু গেড়ে যায় কাঁদায়। যে পথে পথ চলতে খেজুর কাটা পায় বিধে যায়। পা কেটে যায় ভাঙ্গা হাড়ির চাড়ায়। পরদিন ক্ষেতে যাওয়া হয় না। কবিরাজের বড়ি খেয়ে চিন্তাযুক্ত মাথায় ঘরে বসে থাকতে হয়। যারা নিজের হাল নিয়ে নিজ ক্ষেতে চাষ করে তাদের এক চিন্তা আর যারা কামলার কাজ করে তারা দিন মার গেলে খাবে কি সে চিন্তায় থাকে অস্থির। তাই একদিন না যেতেই কাটা পা নিয়ে আবার সেই কাঁদাপানিতে নেমে যেতে হয়। কাটা পায়ে ইনফেকশন হয়, কবিরাজের চিকিৎসায় কিছু উপকার না হওয়াতে বাড়ির অন্য

www.pathagar.com

লোকদের পরামর্শে শহরে গিয়ে চিকিৎসা নিতে হয়। টাকা কোথায়? ধার করতে হয় নইলে আতালের গরু কিংবা ছাগল বিক্রি করতে হয়। আর তাও না থাকলে মেহগনী গাছটা বেঁচে দিতে হয়। একটা ক্যাপসুলের দাম বারো টাকা, চব্বিশ বা আটাশটা ক্যাপসুল খেতে হবে। সরকারী হাসপাতালে প্যারাসিটামল আর মেট্রোনিডাজল ছাড়া আর কোন ঔষধ থাকে না। এ কৃষকের ঐ জেলা শহরের হাসপাতালের বারান্দায় ঘোরাফেরা ছাড়া আরকোন কিছু করার থাকে না। এমনিভাবে তার ইনফেকটিভ পা নিয়ে সে খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটে। সরকারী হাসপাতালে চিকিৎসা হবে না বলে দালালরা প্রাইভেট ক্লিনিকে পাঠায়। ঠিকই একই ডাক্তারসাবকে প্রাইভেট ক্লিনিকে দেখা যায়। এখানে পায়ের পুঁজ সরিয়ে ড্রেসিং করে প্রেসক্রিপশন করে দেয় সার্জন। এ কাজটা ঐ বড় হাসপাতালটায়ই হতে পারতো নামেমাত্র কয়েকটা টাকা খরচের বিনিময়ে অথচ হাজারের উপর টাকা চলে গেল তার এখানেই। তারপর ঔষধ, বাড়ি ফেরার ভাড়া। কষ্ট কষ্ট আর কষ্ট। বুক ফেটে কান্না আসে তার। এ কেমন জীবন। ছেলেমেয়েদের ভাতের টাকা নাই আর পায়ের অপারেশন করে নিজে এতোটাকা খরচ করাতে অপরাধী ভাবছে নিজেকে। জ্বর আসে পথেই, বাড়ি ফিরে কাঁথা গায় দিয়ে শুয়ে থাকে। চোখ দিয়ে পানি গড়ায়। এটা কষ্ট কমার একটা পন্থা। অনেকদিন ধরেই বৃষ্টি হচ্ছে। শ্রাবণ মাস বৃষ্টিতো হবেই। আকাশে মেঘের আনাগোনাতো থাকবেই, নইলে শ্রাবণ মাস হবে কেন। দুপুরে বৃষ্টি একটু থামে। গাছে গাছে পাখ পাখালি ডানা ঝাপটায়, কাকাতুয়া ঝিঙ্গে ফুলে ঠোকর মারে। বাঁশ বাগানে দমকা হাওয়ার দোলা লাগে। এক ফাঁকে একটু সূর্যের আলোও দেখা যায় মেঘের মাঝে। সবারই মন খারাপ পানি সরছে না। চাষ দেয়া যাচ্ছে না। বন্যাটন্যা হবে নাকি আবার। এমনই জীবন এখানে। স্কুল আছে দূরে। বাচ্চারা কাঁদারাস্তা দিয়ে স্কুলে যায়। বাবাকে ক্ষেতে কোমর পানিতে রেখে বাচ্চা স্কুলে যেতে পছন্দ করে না। দুপুরে ফিরে কি খাবে তার নিশ্চয়তা নেই। কেরোসিনের দাম বেশি। বাতি জ্বলবে না সন্ধ্যার পর। সন্ধ্যার আগেই ক্লাশের পড়ালেখা শেষ করতে হবে। হাজার ও গ্রাম্য বালক এমন কষ্ট করে করে স্কুলে যায়। অধিকাংশই স্কুল পাশ দিয়েই পড়াশুনা শেষ করে। যারা কলেজে যায় তাদের নুতন জীবন শুরু হয়। পড়াশুনার খরচ চালানো কষ্টের বিধায় অনেকে এটা চালিয়ে যেতে পারে না। কেউ কেউ চাকরির সন্ধান করে বাবার অভাবের সংসার বলে। ছোটখাট একটা কাজ পেলে সেখানেই মন ঢেলে দেয়। আর যারা পড়াশুনা চালিয়ে যাবার দৃঢ়শপথ করে জীবনকে নতুন আঙ্গিকে দেখার স্বপ্নে যে উঠেপরে লাগে সে কৃষক ছেলে তার বাবার সবকিছু বেঁচে টেচে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীটা শেষ করে তখন সে দেখে সবচে কঠিন কাজটা হচ্ছে চাকরি পাওয়া। তার হতাশার আর যন্ত্রনার কোন শেষ থাকে না তখন। স্তরে স্তরে এই কৃষককুলের এমনতর বেদনা তাদের হৃদয়ে চাপ চাপ জমা হয়ে আছে। তাদের সাক্ষাৎকারও কেউ নেয় না। শহুরে মানুষদের নিয়েই সবাই ব্যস্ত। বাণিজ্যমেলা, বইমেলা, নাটক সিনেমা ও নায়ক নায়িকাদের খবরা খবর ছাপালে পাঠক যে আগ্রহে পড়ে এক কৃষকের করুণ জীবন পাঠে তেমন উৎসাহী হন না পাঠক।

অধিকাংশ পাঠকের জীবনের সাথেই একৃষক জীবনের মিল নেই, তাকে খুঁজে পান না সেখানে। আর যারা ঐ কষ্টের জীবনে ছিলেন সেখান থেকে অতি কষ্টে বেরিয়ে এসেছেন তারা আর সে জীবন নিয়ে ঘাটাঘাটি পছন্দ করেন না। আমরা যদি বা বলি কৃষি প্রধান দেশ, কৃষিই জীবন। কিন্তু কৃষকদের মতো অবহেলিত আর কেউ নেই। সিডর এলাকায় কৃষকদের বলতে শুনেছি "রিলিফ কয়দিন দেবেন মোগো কাম দেন। গরু ছাগল কিন্যা দেন, সার বীজ দেন। কামে লাগবে"। আমার সাথে অনেকেই একমত হবেন না হয়তো। এদের মতো সরল প্রাণের লোকরা আমাদের গর্ব। তাদেরকে দিয়ে যে কোন কাজ করানো সম্ভব। তাদেরকে আমাদের শহুরে জীবনের দুর্নীতি ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস এখনো আক্রমন করেনি। তাদের জন্য রাষ্ট্রের ও আমাদের সকল পেশার সচেতন মানুষের অনেক কিছুই করার আছে। বিদ্যুৎ যেখানে নেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহের উদ্যোগ নেয়া উচিৎ, চিকিৎসক পারেন সরকারী হাসপাতালেই এ সমস্ত লোকদের চিকিৎসা দিতে, কাচা রাস্তাগুলোকে পাকা করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যেখানে যতোটুকু সম্ভব আধুনিক জীবনের ছোঁয়া লাগাতে হবে। কোন লোক ডায়রিয়ায় মারা যাবে, যক্ষ্মার চিকিৎসা পাবে না অথবা কোন মেয়ের বারো তেরো বছরে বিয়ে হয়ে যাবে নিজের অমতে এ অবস্থা মেনে নেয়ার মতো নয়। কৃষকদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব আমরা কিছুতেই এড়াতে পারি না। ঢাকা শহরে আমরা চড়া দামে যে তরী তরকারী কিনি তার সিংহভাগই মাঝখানের লোকরা নিয়ে যায়। প্রান্তিক চাষীরা নামে মাত্র ফসলের দাম পায় যা দিয়ে তার চাষাবাদের খরচই ওঠে না। তাই অনেক কৃষককেই ধানের ফলন বাদ দিয়ে, রবিশষ্যের ফলন বাদ দিযে ধানী জমিতে গাছ লাগাতে, মাছ চাষ করতে দেখা গেছে। যাদের কারনে আমরা টাটকা শাক সব্জী, পোলাও বিরিয়ানী খাই তাদের খেয়ে পড়ে বাঁচার মত একটা জীবন নিশ্চিত করা কি আমাদের সকলের দায়িত্ব না? গ্রামে বেড়াতে গিয়ে খেজুর রসের পিঠা আর দই গুড় খেতে খেতে অনেককেই বলতে শোনা যায় 'আপনারাই আরামে আছেন, সবকিছু ফ্রেশ খান'। এই শীতের পিঠা মিঠা খানেওয়ালা তো বর্ষায় ওখানে যান না। কাঁদা বর্ষা পানির বিড়ম্বনা উনি বুঝবেন কিভাবে? খড় কুটার ছাউনি দিয়ে পানি পড়ার পর ঘুম ভাঙ্গা ও জেগে থাকার দৃশ্য তো আমাদের অজানা। সুদূর গ্রামে কেন বিশাল ঢাকা শহরের চারদিকে প্রতিবছর বর্ষার জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হলে মানুষের দুর্ভোগের সীমা থাকে না। তারা খাবার পানি সংগ্রহের জন্য ছোট নৌকা বা ভেলায় করে অন্যত্র চলে যায়। কেউ বুদ্ধি করে বাশের সাঁকো তৈরী করে বাড়ি থেকে রাস্তায় আসে। অন্যরা কোমর পানি, গলা পানিতে সাঁতরায়। গেল বর্ষার মৌসুমে এ দৃশ্য আমরা দেখেছি। এ কষ্টের জীবন অনেকেরই গা সওয়া হয়ে গেছে। ছোট বাচ্চারা খেলতে খেলতে ঝুপরি থেকে টুপ করে পানিতে পড়ে গেলে দেখার ও কেউ থাকে না। এসব বাচ্চা অকালে পৃথিবী থেকে চলে গেলে আফসোস করারও লোক পাওয়া যায় না। বাবা মা বেঁচে থাকা সন্তানদের নিয়ে, তাদের ভরণ পোষণ নিয়েই ব্যস্ত থাকে। গ্রামের কৃষকসহ অন্যান্যরা যেভাবে পিছিয়ে আছে শহরের লোকদের থেকে তার মধ্যে একটা বড় বিষয় হচ্ছে

www.pathagar.com

রিপোর্টিং। গ্রাম নিয়ে, গ্রামের মানুষ নিয়ে লেখালেখি-রিপোটিং কম করা হয়। শহরের জীবন, শহরের বস্তি নিয়েও অনেক রচনা হয়। শহরবাসীরা নানানজাতের মানুষ দেখে বিচিত্র জীবন দেখে দ্রুত স্মার্ট হয়ে যায়, সব চালাকি শিখে ফেলে পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য। গ্রামে স্ট্রেচ কম অতএব তাদের এতটা চালাকি, ফাঁকিবাজি না শিখলেও চলে। কৃষকদের অর্থনৈতিক কষ্টটাই প্রধান। এছাড়াও সামাজিক অনেক অনাচার, অত্যাচার তাদের ও ভোগ করতে হয়। জমিদারী প্রথা এখন না থাকলেও রাজনৈতিক দলের বখাটে কর্মীদের অত্যাচার, ছোটখাট চাঁদাবাজী গ্রামেও শুরু হয়ে গেছে। বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার ও কম যন্ত্রনাদায়ক না। মেয়ে বড় হতে না হতেই তাকে নিয়ে গল্প বানানো বিয়ে দেয়ার জন্য বাবার উপর চাপ সৃষ্টি করা, সন্তান না হলে স্ত্রীকে দোষারোপ করে দ্বিতীয় বিয়ে করিয়ে দেয়ার প্রথা এখনও গ্রামে সমানে চালু আছে। এসব প্রথার বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করে তুলতে হবে। আমরা তাদেরকে ভালবাসব, তাদের প্রতি আমাদের দায়িত্বের কথা ভাবব তাহলেই কিছু করা যাবে।

সিডর এলাকায় সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলের আর একটা পেশা হচ্ছে জেলে। তারা নদীতে মাছ ধরে, মাছ ধরতে সাগরে যায়। পটুয়াখালী, আমতলী, বরগুনা শহরের পাশ দিযে দক্ষিণে গিয়ে সাগরে মিশেছে বিশাল পায়রা নদী, বরগুনা, বামনা, বেতাগীর মাঝখান দিযে সাগরে মিশেছে বিষখালী নদী আর পাথরঘাটা শরণখোলার মধ্যদিয়ে গিয়ে সাগরে পড়েছে বলেশ্বর নদী। বিগত তিনমাসে আমরা এ নদীগুলোর নাম বহুবার শুনেছি। সিডরের আঘাতটা মূলতঃ এ নদীগুলোর মাধ্যমেই হয়েছে। পানির উঁচু যে পাহাড় লোকজন দেখেছে তা এ নদীপারের মানুষেরাই দেখেছে। নদী প্রথমতঃ শুকিয়ে গেছে। বিশাল ও প্রকাণ্ড সিডর তার সীমাহীন শক্তিদিয়ে শুসে নিয়েছে সব নদীর পানি –তারপর সাগরের নোনাজল, বালিমাটি ও অন্যান্য সাগর পারের ভাঙ্গাচুরা সবকিছুসহ সজোরে আঘাত হেনেছে। পেশাগত কারণেই নদীর পারে জেলেদের বাস। তাদের মাছ ধরার নৌকা, ট্রলার ও জাল থাকে নদীর পারে। এসব জেলেদের অনেকেই মাছ ধরার জন্য বছরের একটা সময় থাকে সাগর পারে। পটুয়াখালির মহিপুর অঞ্চলে সারি সারি ট্রলার বাধা থাকে। মাছ ধরার পর তারা এ এলাকাতে ঘাটি গাড়ে, মাছ বিক্রি করে বিশ্রাম নেয়। সাগর থেকে মাছ ধরতে গিযে অনেক জেলে প্রাণ হারায়। অনেক জেলে তার ট্রলার জাল ফেলে রেখে কোনরকমে প্রাণে বেঁচে আসে। ভীষণরকমের ঝুঁকিপূর্ণ এ পেশাটা। শুধু সাগর নয় মেঘনা, তেতুলিয়া, আগুনমুখা, পায়রা, বিষখালী ও বলেশ্বর নদী ও নদী মোহনায় বর্ষায় মাছধরা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। সাগর যতো উত্তাল থাকে, নদীতে ততো বেশি ঢেউ থাকে, মাছ পাওয়া যায় ততো বেশি। অন্য যতোমাছই জালে আটকাক না কেন জেলেদের টার্গেট থাকে ইলিশ মাছ। ইলিশ মাছ বাংলাদেশের জাতীয় মাছ। এ মাছ প্রায় সব মানুষেরই প্রিয়। সকল ঝুঁকি মাথায় নিয়ে তাই জেলেরা দলবেঁধে নদী মোহনায় ও

www.pathagar.com

সাগরে মাছ ধরতে যায়। অনেকেই সফলতার মুখ দেখে, আর কেউ কেউ বিফল হয়ে সাগর অতলে চিরদিনের জন্য হারিয়ে যায়। সরকারী কোন অনুদান, অনুপ্রেরণা এ সব এলাকার লোকেরা পেয়েছে বলে আমার জানা নেই। মৎস্য অফিসার নামে প্রতি জেলাতে যে অফিসারগণ আছেন তাদের কাজ কি কে জানে। তাদের চোখের সামনে জাটকা ধরা হচ্ছে, বিক্রি হচ্ছে তারা কিছুই বলছেন না। জেলেদের ট্রলার ও জালের জন্য সহজশর্তে লোন দেবার ব্যবস্থা করা, তাদের নিরাপত্তার বিষয়ে কোন সহযোগিতা করা যায় কি-না সে ব্যাপারে চিন্তা করতে পারেন। কোস্টগার্ড বা অন্যকোন ফোর্স এ ব্যাপারে জেলেদের সাহায্য সহযোগিতা করতে পারেন কি-না ভাববার সুযোগ আছে। নতুন কিছুইতো চোখে পড়ে না। ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি মহীপুরের বরফকল বিদ্যুতের অভাবে অচল, বরফের অভাবে মাছ পঁচে যাচ্ছে। ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে ফেরি সার্ভিস ব্যহত। এসব খবর শুনে আসছি, পত্রিকার পাতায় দেখে আসছি- কোন পরিবর্তন নেই। মহীপুর খেপুপাড়া উপজেলার মধ্যে পড়েছে। একটু দূরেই কুয়াকাটা। কুয়াকাটার অপূর্ব সৌন্দর্যের বর্ণনা আমরা অনেক বার শুনেছি। অপার সম্ভাবনাময় এ পর্যটন কেন্দ্রটি শুধুই প্রকৃতির উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। একদমই আধুনিকতার ছোঁয়া নেই। সরকারী কোন পৃষ্ঠপোষকতা কিংবা উদ্যোগ কারও চোখে পড়বে না এবং এলাকার লোকজনও এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে না। এটা বাংলাদেশের এমন একটা পর্যটন কেন্দ্র হতে পারে যেখান থেকে সরকার প্রতিবছর হাজার কোটি টাকা সংগ্রহ করতে পারবে। যেবছর হাজার কোটি টাকা খরচ করবে আধুনিক একটা পর্যটন কেন্দ্র তৈরী করতে এবং খেপুপাড়া থেকে কুয়াকাটা পর্যন্ত তিনটা ব্রিজ তৈরী করতে তার পাঁচ বছরের মধ্যে সব টাকা উঠে আসবে। শুধু মাছের ট্রাকগুলো যে অতিদ্রুততার সাথে তিন ঘন্টার মধ্যে বরিশাল চলে আসবে আর আট ঘন্টার মধ্যে ঢাকা। সেটাইতো সরকারকে জাতিকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যাবে। ব্রীজ ও উন্নত রাস্তাঘাট সর্বোপরি আধুনিক যোগাযোগ যে কতোটা গুরুত্বপূর্ণ তা উত্তরাঞ্চলের চমৎকার রাস্তা ও যমুনা ব্রিজই প্রমান করছে। এ ব্রিজটা হবার আগ পর্যন্ত নবাবগঞ্জের আমবোঝাই ট্রাক, যমুনার মাছ ও পাবনা সিরাজগঞ্জের তরিতরকারী নগরবাড়ি ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকতো। পঁচে যেতো লাখো কোটি টাকার ফলমুল সব্জী, কারও কিছু করার থাকতো না। উত্তর বঙ্গের জনগণের ভোগান্তির কোন সীমা ছিল না। তাদের দুঃখ আজ ঘুঁচেছে। সারা বাংলাদেশ জুড়েই যেখানে ব্রিজ নেই, রাস্তাঘাট অনুন্নত সকল সংকীর্তনতার উর্ধ্বে উঠে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সে বিষয়ে মনোযোগ দেয়া উচিৎ। শুধু সাগর পারের জেলেরাই নয় পদ্মা, মেঘনা, যমুনা বক্ষে যে জেলেরা মাছ ধরে, হাওর বিলে যারা মাছ ধরে তাদের সখ্যতা পানির সাথে। অনেকেই বউ বাচ্চা রেখে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত নদীতে সাগরে ভাসতে থাকে। তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মাছ ধরার কাজে ব্যস্ত থাকলেও তাদের বেতন কিংবা আর্থিক সুবিধা আসে খুব কমই। ট্রলারের মালিকরাই পুরো লভ্যাংশের দাবীদার যদিও বা জীবন বাজী রাখে জেলেরা। এমনও শোনা যায় যে সাগরগামী ট্রলারে কোন রেডিও দেয়া হয় না। জেলেদের ইলিশ মারার জালের সাথে

www.pathagar.com

এ্যাংকর থাকে যা টেনে তুলতে হয়, হাতের চামড়া ছিলে যায় তবুও এ্যাংকর উঠে না। এতো গেল মাছ ঠিকঠাক মতো পাওয়া গেলে তাদের কি সমস্যা তার বর্ণনা। এতো রিস্ক নিয়ে সাগরে গিয়ে অনেক সময় খালি হাতে ফেরৎ আসতে হয়। কোন মাছ পাওয়া যায় না। ইদানীং নদীতে তো মাছ নাই বললেই চলে। কি খাবে এসব জেলেরা তার ঠিক থাকে না। পুরো অনিশ্চিত থাকে আগামীর দিন। প্রাকৃতিক সম্পদ সাগরের ও নদীর এ মাছ। ধরতে এখন অনেক জাল, অনেক জেলে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার না করলে মাঝ সাগরে ট্রলারে মাছ ধরতে যাওয়া যায় না। থাইল্যান্ড ও ভারতীয় ট্রলার এসে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বঙ্গোপসাগর থেকে মাছ ধরে নিয়ে যেতে পারলে আমাদের বিশাল মৎস্য ভবনের লোকরা কি এ ব্যাপারে কোন প্রকার উদ্যোগ নিতে পারেন না কিছু করার জন্য। একটা সাগরগামী ট্রলার সাত আট দিনের জন্য চাল ডাল নুন তেল নিয়ে সাগরে পাড়ি জমায়। সেখান থেকে মাছ ধরে, অন্য ট্রলার নিয়ে মাছ সংগ্রহ করে আনে। ঠিকমত ঘুম হয় না, নাওয়া খাওয়া হয় না। তারপর কুলে ফিরে শোনে দুঃসংবাদ মেয়েটা আত্মহত্যা করেছে গলায় ওড়না পেচিয়ে। কোন ছেলের সাথে প্রেমটেম করতো স্কুলে। শুনে মা থাপ্পর মেরেছে রাগের মাথায় আত্মহত্যা করেছে। এ কষ্টটা কেমন কষ্ট। হয়তো বাড়ি থাকলে এমনটা তাদের হতো না। এমন দুঃসংবাদ শুনে তার কান্নাও পায় না। কতো আর কাঁদবে। এমনটা হলে এদের কিছুই করার নেই এ সান্ত্বনা ছাড়া আর কি উপায়। কাউকেই দোষ দেয় না সে, কপালের দোষ, গরীব হবার প্রায়শ্চিত্ত করছে আর কী?

কৃষকেরা জেলেরা গ্রামে কষ্ট করে করে এক সময় দারিদ্রের কষাঘাতে, সুদযুক্ত ঋণের চাপে শহরমুখী হয়। নতুনভাবে বাঁচার সংগ্রামে লিপ্ত হয়। একদমই আনকোরা এ লোকগুলোর অধিকাংশই কায়িকশ্রম দিতে শুরু করে। গৃহনির্মান অথবা রাস্তাঘাট তৈরীর কাজে দিন মজুরী খাটে। কিছুদিন পর একটু পুরানা হলে কোদাল বেলচাও ঝুড়িসহ মিরপুর ১১নং বা নিউমার্কেট মোড়ে বসে থাকে। একদিন দু'দিন বা অনেক দিনের জন্য ভাড়া কাজ নেয়। এভাবে নিজের পেটটা বাঁচায়। রেখে আসা স্ত্রী পুত্র পরিজনের কথা মনে করার ও চেষ্টা করে না। একভাবে থাকবেই, চলে যাবেই কোন রকমে জীবন। ওরা কি খাচ্ছে মনে করতে গেলেই কষ্ট, দুঃখবোধ। হয়তো কাজ ফেলে দৌড়ে যাবে বাড়িতে আবার। অনেকে কাওরান বাজার তরকারী বাজারে গায়ে খাটে। কেউ একটু টাকাটোকা সংগ্রহ করে ভ্যানে করে তরকারী বিক্রি করে, ফুটপাথে মোজা পুরানা কাপড় চোপড় বিক্রি করে কেউ, আবার অনেকেই আছে মাছ নিয়ে বাসায় বাসায় ফেরী করে বিক্রি করে। এরা কোন মান সম্মত জীবন যাপন করতে পারে না, তারা শহরে প্রবেশ করার সাথে সাথেই খরচ বেড়ে যায়। হয়তো দু'চার পয়সা কামাই করে কিন্তু চাল ডাল থেকে শুরু করে সব কিনে খেতে হয়। অনেক চাপের জীবন রাজধানী শহরের এ জীবন। অনেক কষ্টের এ জীবন। বস্তির একটা রুমের ভাড়াও এক হাজার থেকে পনেরশ টাকার মতো। খাওয়া পড়া বাসা ভাড়া দেবার পর আর থাকে কি? বাস

www.pathagar.com

কন্টাকটর, হেলপার, রিক্সাওয়ালা এদের সবারই একই রকমের জীবন। অনিশ্চিত ভবিষ্যত। এদের থাকার জায়গা নেই। সরকারী খাস জমিতে মহল্লার চাঁদাবাজরা ঘর তুলে ভাড়া দেয়। সেখানে তারা ভাড়া থাকে। এসব আবাস ভেঙ্গে দেয়ার পর দিলে তাদের থাকার জায়গার ভাড়া বেড়ে যায়। সার্বিকভাবেই জীবনযাত্রা অনেক কঠিন হয়ে পড়ে সবার জন্য, বিশেষতঃ নিম্ন আয়ের লোকদের জন্য। দু'জন লোকেরই যেখানে জীবন চলে না সেখানে সন্তান নেয়া তাদের দুধ ভাতের টাকা কে যোগাবে? যাদের আয় আরও কম দিন মজুর অথবা ভিক্ষুক অথবা ভবঘুরে। তাদের কি অবস্থা। অনেকের ধারণা ভিক্ষুকরা কোটিপতি হয়। একজন ভিক্ষুক কখনো কোটিপতি হয় না, যে ভিক্ষুকদের দিয়ে ব্যবসা করে সে হয়তো কোটিপতি। বিনা চালানে ব্যবসা করে এরা। লাল সিগন্যাল বাতিটা জ্বলে উঠলেই তাদের তৎপরতা চোখে পড়ে। হাতের আংটি দিয়ে গাড়ির গ্লাসে টোকা মারে। তাদের থাকা, খাওয়া, পড়া কোনটাই একজন মানুষের মতো নয়। ছেলেমেয়ে আছে, তাদের পড়ালেখার খরচ নেই। এসকল লোকরা সংখ্যায় অধিক। তারা সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, এদের প্রতিষ্ঠানিক তেমন কোন শিক্ষাদিক্ষাও নেই। এদেরই একটা অংশ সরাসরি গ্রাম থেকে দালাল ধরে বিদেশে প্রচুর টাকার বিনিময়ে পাড়ি জমায়। কাগজপত্র ঠিক না থাকার কারনে মধ্যপ্রাচ্য কোরিয়া, সিঙ্গাপুর অথবা মালয়েশিয়া থেকে তারা বিভিন্ন হয়রানি ও মানবেতর জীবনযাপনের পর ফেরৎ আসে। আমরা শুধু পত্রিকার পাতায়ই এসব খবর দেখি। কতোটা অবর্ননীয় কষ্ট এসব লোকজন করে তা আমাদের অনেকটাই অজানা। ইউরোপে যেতে গিয়ে ভূমধ্যসাগরে মারা গিয়েছিল বাঙালী যুবকরা। মধ্যপ্রাচ্যে নানান অপরাধের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে বাংলাদেশী ছেলেমেয়েরা। 'ডেনজার' দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সেখানে লিস্টেট। আমাদের ছেলেমেয়েরা কি আসলেই এতো খারাপ না অভিভাবক হিসেবে আমরা দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ। আমাদের জনশক্তিকে দক্ষ জনশক্তি তৈরীতে তেমন কোন পরিকল্পনা নেই, যতোটুকু আছে ততোটুকু ও বাস্তবায়নের বাস্তব সম্মত উদ্যোগ নেই। এ পর্যায়ে আমাদের এতোটুকু জ্ঞান করা খুব জরুরী সমাজের অধিকাংশ লোকের জন্য বাজেট নির্মিত না হয়ে যদি তা শুধু শহুরে বিত্তবান লোকদের জন্য হয় তবে সমাজে অস্থিরতা বিরাজ করবেই। গার্মেন্টস শ্রমিকরা অপেক্ষাকৃত ভাল আছে কিন্তু যারা মালিকপক্ষ তাদের কাছ থেকে মিছিল মিটিং আর সভা সমাবেশ করে ছুটি আদায়, বোনাস, বকেয়া বেতন আদায় করতে হয়। তাদের মাধ্যমেই মালিকরা একটার পর একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছেন ওদের একটু বেতন ভাতাদি বাড়িয়ে দিলে কি প্রডাকশন বাড়বে না কমবে? গার্মেন্টস শ্রমিকদের অন্যায় দাবীর কথা বলে কেউ উসকে দিতে পারবে না যদি তাদের বেতন ভাতাদি ঠিক সময় পায়, তাদের উপর অত্যাচার নির্যাতন না হয়। এ বিশাল জনগোষ্ঠিকে আপনি সদরঘাট, কমলাপুর, গাবতলী, কাওরান বাজার টংগী সর্বত্রই দেখতে পাবেন। তাদের কষ্টের ভাগীদার না হলে আগামী দিন আপনার কষ্ট শতগুন বেড়ে যাবে। তার অপরাধ কি? আপনি একই সমাজের নাগরিক হয়ে শিক্ষা পেলেন, চাকরি পেলেন, অবৈধ পদোন্নতি পেলেন।

www.pathagar.com

তারপরও আপনার ক্ষুধা মিটছে না, সমানে ডানে বামে অন্যায় করে যাচ্ছেন ঘুষ নিচ্ছেন, দিচ্ছেন। কোন নীতিনৈতিকতার তোয়াক্কা করছেন না। এরপর বেকার শিক্ষিত যুবকরা চাকরি না পেয়ে আপনাদের কাছে গেলে দূর দুর করেন কুকুর বিড়াল তাড়ানোর মতো। কোথায় যাবে এসব ছেলেমেয়েরা? কনকনে শীতে খোলা আকাশের নিচে এখন যারা রাত কাটাচ্ছে তাদের বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা যেমন কষ্ট বাড়িয়ে দেয় গরীব বাবা মার শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের বেকারত্বের কষ্টটাও তদ্রুপ। মৌলিক কষ্টগুলোর রং ধরন এতোটাই কষ্টের যা বর্নণাতীত। সমাজ যখন ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে তখন ভারের সমতা আনার জন্য লোকজন ছুটাছুটি শুরু করে। এতে অস্থিরতা আরও বাড়ে। আমাদের সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ভারসাম্য আনার জন্য অনেকগুলো পদক্ষেপের মধ্যে প্রথম যে পদক্ষেপ নিতে হবে তাহল মানুষের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা সৃষ্টি করা। আমরা যদি সমাজের আর দশজন মানুষকে আমাদের মত বিবেচনায় আনি যেভাবে আমার পরিবারের সদস্যদের আনি তাহলেই অনেক কিছু বুঝা সহজ হবে। তাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য কি তা আমরা ঠাহর করতে পারব। কাজের ছেলেদের দিয়ে সমবয়সী স্কুলছাত্রের ব্যাগ টানালে তার কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে এটা আমি না বুঝলে আমার শিক্ষাই বৃথা। মানুষে আর পশুতে এসব স্থানেই ফারাক, ব্যবধান। আমরা মানুষ। তাই আমরা সব সময় সমাজের অন্য মানুষের সুখ দুঃখ, অনুভূতির কথা বিবেচনায় রাখব। রাজনীতিবিদ, মন্ত্রী, সচিব কি করল কিছুই যায় আসে না। তাদের কর্মফল তারা ভোগ করবে আর আমার ত্যাগের ফসল আমি অবশ্যই পাব এবং এটা পরকালে নয় ইহকালেই। আমার মেন্টাল হেলথ কখনোই ঘুষখোর দুর্নীতিবাজ লোকদের মত হবে না, আজ দেশের আসল সমস্যাগুলোকে আমরা খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হচ্ছি। যারা মানুষকে ভালবাসে না, যারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে গালমন্দ আর মিথ্যাচার দিয়ে চরিত্র হরণ করার তালে থাকে তাদেরকে জনসাধারণ চিনতে শুরু করেছে। পেশাজীবীরা তাদের সার্বিক কর্মকাণ্ডে যখন মানবিক দিকগুলোর সুন্দর পরিস্ফুটন ঘটাবেন অটোমেটিকালি ঐসব ভাগ্যহত মানুষ উপকৃত হবে, তারা মানবিক জীবন ফেরৎ পাবে। তারা হাসপাতালে চিকিৎসা পাবে, বাসায় সম্মানের সাথে থাকবে কাজের বুয়া, ছোট বাচ্চারা স্কুলমুখী হবে বাসার মালিকের সন্তানের সাথে। দেখলে বোঝা যাবে না কোনটা বাসার মালিকের ছেলে আর কোনটা মালিকের পালক ছেলে কাজ করতে এসেছিল। আমরা অনেক ধরনের সমিতি কিংবা ফাউণ্ডেশন দেখি। তারা যদি সিদ্ধান্ত নেয় যে ভিক্ষুক ও ভবঘুরে লোকদের পুনর্বাসিত করবে তাহলে কোন লোককে আর ভিক্ষা করতেই দেখা যাবে না। পাঁচ সাত জন করে এরা পুনবার্সিত করতে পারে। প্রয়োজন সদিচ্ছার, দৃঢ়প্রত্যয়ের। যারা নেশার রোগীদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন করেন তারা এদেরকে সবাই মিলে পুনর্বাসিত করতে পারেন। আমরা যদি এদেরকে সমাজের অংশ মনে করি আর রাস্তাঘাটে তাদের অবস্থা দেখে বিচলিত হই তাহলে আমাদের পক্ষে তাদের জন্য কিছু করা সম্ভব হবে। এদেরকে ভাসমান অবস্থায় দেখে আমার যদি কষ্ট না লাগে, যদি ভাবি এটা সরকার করবে তাহলে সমস্যাতো

www.pathagar.com

বেড়েই যাবে। বর্তমানেতো এক বছরের ও বেশি সময় ধরে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশ চালাচ্ছেন। কবে নাগাদ নির্বাচিত সরকার আসবে কে জানে। তার আগেইতো লোকজন শীত, বন্যা, খড়া, সাইক্লোন সিডর আর জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির কারনে মারা যাবে। অবশ্যই একটা শ্রেণীর লোককে ধর্ম, দল, গোত্র সম্প্রদায় সবকিছুর উর্ধ্বে উঠে শুধু মানুষের জন্য কিছু করতেই হবে। আর যে পারা যাচ্ছে না। আমাদের দেশের যাকাতের টাকাটাও ঠিকমতো খরচ করলে ইয়াতীম, মিসকিন ও ফকিররা স্বাচ্ছন্দময় জীবন ফিরে পেত। একটা ছেলে বা মেয়ে ইয়াতীম হবার মাধ্যমে পৃথিবীর সবচে অসহায় মানুষটি হিসেবে বেড়ে ওঠে। তার কষ্টের রঙ সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাবা মা ডাকটা শুনাবার মতো কাউকে সে পায় না। বাবা মা মারা যাবার পরই তাদের সম্পদ মেরে খায় আত্মীয়স্বজন। আমাদের এটা কৃষ্টি, ঐতিহ্য। চাচা মামাদের মধ্যে সম্পদ নিয়ে টানাপোড়ন হয়। এই সম্পদ ঐ ইয়াতীম ছেলেমেয়েরা খুব কমই ভোগ করতে পারে। যাকাতের টাকায় সেই ইয়াতীম ও সহায়সম্বলহীন লোকদের ভরণ পোষণই কেবল নয় তাদের উপার্জনের ব্যবস্থা পর্যন্ত করে দেয়া যাবে। সুতরাং ঠকানো ব্যবস্থা নয় সমাজে নিজে ভাল থাকতে চাইলে অন্যকে জিতানোর ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আমরা এ দায়িত্বটুকু সবাই মিলে ভাগাভাগি করে নেব। আমাদের সমাজে প্রচুর ভাল লোক আছেন যারা ব্যক্তিগতভাবে সৎ এবং অন্যলোকদের জন্য জান প্রান দিয়ে ভাল কাজ করেও যাচ্ছেন। আরও লোকদের মটিভেট করতে হবে, জানাতে হবে জীবনের নতুন সংজ্ঞা, ভাল থাকার সংজ্ঞা। নিজ থেকে কোন মানুষ যখন অন্য মানুষকে ভালবাসতে শিখবে, তার অধিকারের বিষয়টাকে বিবেচনা করবে সঠিকভাবে, তখন তার উপর আইন প্রয়োগ করতে হবে না, সে এমনিতেই সমাজের অনেক দায়িত্ব নিজ কাঁধে নিয়ে নেবে। সমাজের অনেক অশান্তি দূর হবে খুব দ্রুতই।

আমারা যেহেতু একটা গরীব ও পশ্চাদপদ দেশের বাসিন্দা আমরা মানুষ হিসেবে কেমন, মানুষের প্রতি আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও নৈতিক আচরন কতটা পরিশুদ্ধ হওয়া জরুরি তা আলোচনা করলেই অন্ততঃ ভিনদেশের মানুষদের প্রতি আমাদের কিংবা আমাদের প্রতি তাদের দায়িত্বটুকুও ফুটে উঠবে। হিটলার গ্যাস চেম্বারে মানুষ পুড়িয়ে মেরেছিলেন বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা হিটলার দাবী করলেও বিশ্ব বিবেক মানেনি। সকলের কাছে তাকে উগ্র জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী একজন স্যাডিস্ট বলে মনে হয়েছে, রক্তে যার আগ্রাসনের বীজ ছিল, হিংস্রতার বীজ ছিল। আজ যুদ্ধবাজ বুশও তদ্রুপ। মানুষ খুন করে অন্যের উপর দোষ চাপাচ্ছে। তাদের বসানো পুতুলরা সবকিছুই করছে। তাদের অন্যায়ের প্রতিবাদে আবারও হিংস্র হয়ে উঠছে বিভিন্ন দেশের সাধারন মানুষ। আফগানিস্তান, ইরাক, ফিলিস্তিনের নাগরিকরা মার্কিন সৈন্যের উপস্থিতি চায়না। যে বায়েলজিক্যাল উইপনের কথা বলে ইরাককে আক্রমন করা হল, সাদ্দামকে ফাঁসি দেয়া হল সে বায়োলজিক্যাল উইপন তো মেলেনি। তারপরও তাদের উপস্থিতির কারন নেই। মার্কিন সৈন্য আছে। এ কথাটাই

ইরাকের জনগন মেনে নিতে পারছে না। অনেক দিনের পুরোনো সভ্যতা ধ্বংস করেছে বুশ। কিসের নেশায় কিসের আশায়। তেল আর বারুদের গন্ধ পাবার জন্য। এদের বিবেচ্য বিষয় শুধু মার্কিনিদের অর্থনৈতিক উন্নতি, তাদের জনগনের হাসি প্রফুল্ল মুখ। বিশ্ব মানবতার কি হল না হল তাদের কিছু যায় আসে না। তাদের ফর্মূলা যারা মেনে চলবে তারা গণতন্ত্রীমনা আর যারা মানবে না তারাই গণতন্ত্রবিরোধী। নির্বাচনে জিতলেও তাই তারা বিপরীত শিবিরের লোকদের স্বীকৃতি দিতে চান না। খোদ আমেরিকায় গণতন্ত্রের এ হাল দেখে বিশ্ব বিবেক স্তম্ভিত। এবার দেশে ফেরা যাক। মানুষের মুক্তিকামী কিছু দল নিজেদের মানবদরদী ভাবেন, গণতন্ত্রী মনা ভাবেন-ভাববেন তারা উদারপন্থী রাজনীতিবীদ। তাদের এ ভাবনার সাথে বাস্তবে কোন মিল নেই। তারা মানবদরদী তা আমাদের চোখে পড়ে ন।সাধারণ মানুষের কথা তারা টক শোতে যেভাবে বলেন, তাদের কাতারে কিংবা আশে পাশে তাদের তেমন দেখা যায় না। তারা শুধু মানুসের নামে গীবত করাটাকেই রাজনীতির একমাত্র হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছে। এক কালের চরম শত্রু আজ বন্ধু হয়ে গেছে। তাদের আদর্শ জলাঞ্জলি দিতে সময় লাগে না। পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে কথা বলে চরম পুঁজিবাদী দলের লেজুর হয়েই তারা সন্তুষ্ট। আর বড় দলের লোকেরা গনতন্ত্র রক্ষায় সদাব্যস্ত অথচ তার দলে গণতান্ত্রিক কোন পরিবেশ নাই। কোন চর্চাই তারা দলের মধ্যে করেন না। আমাকে কি কেউ আস্বস্থ করতে পারবেন যাদের দলের নেতা নেত্রী নির্বাচনের মাধ্যমে হয় না, তারা কি নির্বাচন, সংখ্যাধিক্যের মতামত, গণতন্ত্র এসবে বিশ্বাস করে আদৌ? ভোটারদেরকেই আজ এসব মৌলিক প্রশ্ন তুলতে হবে। রাজনীতিবিদ ও ভোটার প্রসঙ্গ আসবে একারনেই যে আমরা যেসকল মানবেতর জীবন যাপনে অভ্যস্ত মানুষের কথা বলছি তাদের ভাগ্য পরিবর্তন হয় সংসদে, পলিসির মাধ্যমে, নেতা-নেত্রীদের সিদ্ধান্তের কারনে। দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা নেয়ার জন্য বালিকাদের ফি দিতে হয় না।বরং তারা সকলেই সরকার থেকে বৃত্তি পাচ্ছে। এমনি ভাবে সরকারের সিদ্ধান্তের উপর এদের সবকিছু না হলেও অনেক কিছু নির্ভর করে। তা নেশা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে মাদক সেবক ও মাদক ব্যবসায়ীদের ব্যাপারে কঠিন আইন প্রনয়ন হউক অথবা ভিক্ষুকদের, ভবঘুরে মানুষদের একত্র করে 'ভাত দেয়া, কাজ দেয়ার সিদ্ধান্ত হোক-সরকারই পারে এই বড় কাজে হাত দিতে। সিদ্ধান্ত ঠিক বা ভুল হোক সরকারের একটা অংশ য়ারা পলিসি বানায় তারা জনগনেরই প্রতিনিধি। জনগনের সুবিধা অসুবিধা দেখাই তাদের প্রধান কাজ।সেজন্যই পঁচা গণতন্ত্রও তরতাজা একনায়কতন্ত্রের চেয়ে কল্যাণকামী। জনগন যত সজাগ ও সচেতন হবে ততো ঝকঝকে ও স্বচ্ছ পার্লামেন্ট তৈরী হবে। জনগণ তার রুচিমত ও তার প্রয়োজন মেটাতে পারে এমন লোক বাছাই করবে। আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা জনগণকে যে ভালবাসে না তার একটা প্রমান হচ্ছে তারা সবসময় ক্ষমতাকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ড করে। তার দলতো অনেক ভাল কাজ করেও ক্ষমতায় না আসতে পারে, অনেক দিনই হয়তো তাদের সংসদের বাইরে থাকতে হতে পারে তাহলে সে সময়টায় কি তাদের কোন কর্মসূচী থাকবে না জনগনের জন্য, তাদের

www.pathagar.com

ভোটারদের জন্য? একটা বড় দলই একটা বিকল্প সরকার। তাদের সারা বছরের কর্মকান্ডে তার ছাপ রাখতে হবে। তাদের টার্গেটি হবে মানুষের কল্যাণ আর মানুষের সার্বিক মুক্তি। এ লক্ষ্যে কাজ করলে কি এত বিশাল কর্মীবাহিনী নিয়ে আমাদের বড় দলগুলো জনগনের জন্য কিছুই করতে পারে না। আমি আমার দলের মাধ্যমে দেশে সরকার গঠন করতে চাই, সুখ ও শান্তি আনতে চাই। দলের জন্য মাসিক কোন চাঁদা কি আমার কর্মীদের জন্য নির্ধারন করেছি ! সে দলকে ভালবাসবে কি ভাবে? তার এ দলের জন্য কি কোন ত্যাগ আছে? এরা তো দল করে দল ক্ষমতায় গেলে চাঁদাবজী করতে সুবিধা হবে, ভাগের ভাগ পাওয়া যাবে সেই লোভে। অতএব সেসব সেকেলে কালচার পাল্টে কর্মীদেরকে শেখাতে হবে দলকে কিভাবে ভালবাসতে হয়, জনগণকে ভালবাসতে হয়, ভালবাসতে হয় দেশকে। জনগণকে ভয় পেয়ে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখা পাপ। তারা এখনই তাদের অধিকারের কথা বুঝতে শুরু করেছে। দিন যত যাবে তারা অধিকার সচেতন হবে, তারা টাকায় ভোট বিক্রি করে তাদের সর্বনাশ ডেকে আনবে না, নির্ভয়ে কথা বলবে। যোগ্য, সৎ ও দেশপ্রেমিক ব্যক্তিকে তারা সহজেই সনাক্ত করতে পারবে। একটা শক্তিশালী পার্লামেন্ট তৈরী যারা করবে তারা দেশপ্রেমিক ও মানবদরদী।

মানুষ যে শ্রেণীরই হোক ধনী বা গরীব সকলেরই কষ্ট আছে। মানুষের কষ্টগুলো জানতে হবে। পরিচিত হতে হবে এসব কষ্টের প্রকার ধরন ও রংয়ের সাথে। আর প্রতিনিয়তই ভাবতে হবে কি ভাবে মানুষের কষ্ট দূর করা যায়। কারবারটা যেহেতু মানুষ নিয়ে অতএব তাদের প্রতি ভালবাসা না থাকলে তাদের প্রতি কোন দায়িত্ববোধ সৃষ্টি হবেনা। এটা বীজ ও গাছের মত সম্পর্কে সম্পর্কিত। মানুষের প্রতি যাদের ভালবাসা যত বেশি তাদের কমিটমেন্টও ততবেশি। তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে মানব কল্যানের জন্য। অতি দুঃখ কষ্ট যন্ত্রনায় কোন রকম বেঁচে থাকা মানুষগুলোর আজীবনের মুক্তির আশায় পাগলপ্রায় হয়ে কাজ করে এ সকল মানবদরদী মানুষেরা। আমরা যারা অতি সাধারন মানুষ তারা এসকল মানব দরদী ছাত্র-শিক্ষক, সমাজসেবক, রাজনীতিবিদ, উকিল চিকিৎসক, সাংবাদিক, সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারী ও এনজিও কর্মীদের তাদের ভাল কাজের জন্য উৎসাহিত করব, সকল প্রকার সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে তাদের সহযোগিতা করব। এ পথ থেকে তারা যেন পিছিয়ে না যান, তারা যেন দিবানিশি মানব কল্যাণে কাজ করে যান, জাতি পিছিয়ে পড়ার মত কোন বাজে ইস্যুতে তারা যেন হাত না দেন। ঐক্য বিনষ্ট হবার মত দুষ্ট পরিকল্পনা যেন তারা না করেন সে ব্যাপারে আমরা তাদেরকে আন্তরিক ভাবে সতর্ক করে দেব। যেহেতু তারা শুধুই মানুষকে ভালবাসেন, তাদের লক্ষ্য শুধুই মানুষের কল্যাণ ও মুক্তি তাই তারা সকল প্রকার গঠন মূলক সমালোচনা সাদরে গ্রহন করতে পারেন। এ অভ্যাস তাদের আছে। আমাদের জাতি গঠনে ব্যাকুল ব্যাক্তিবর্গের মানুষের প্রয়োজনে ছোট-খাট সব ভেদাভেদ ভুলে এক টেবিলে বসতে হবে যার কোন বিকল্প নেই। আমরা কেন পড়াশুনা শেখব

www.pathagar.com

যদি আমাকে দিয়ে মানুষের মুক্তি না মেলে- কেন আমি মানুষের কাছে ভোট চেয়ে তাদের প্রতিনিধি হব যদি আমি তাদের প্রয়োজন- চাহিদা সরকারের সামনে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হই। আজ আমাকেই প্রশ্ন করতে হবে কোটি মানুষের মুক্তির জন্য আমি কি কাজটা করেছি- দেশ ও জাতি আমাকে মনে রাখবে কিভাবে! আমার প্রশ্নের তাৎক্ষণিক উত্তর আমি পেয়ে যাব। আমি সমাজের সর্বোচ্চ শিক্ষানেবার পরও কি আমি সেটুকু দায়িত্ব পালন করেছি?

www.pathagar.com

লেখক **আব্দুল ওহাব মিনার** ৩০ ডিসেম্বর ১৯৬২ সনে পটুয়াখালী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

তার বাবা মরহুম আমজেদ আলী মিয়া ছিলেন একজন শিক্ষক আর মা মেহেরুন্নেছা ছিলেন একজন গৃহিনী।

পাঁচ ভাই ও চার বোনের মধ্যে তিনি অষ্টম। তিনি একটি শিক্ষক পরিবারের সদস্য।

পেশাগত জীবনে তিনি একজন চিকিৎসক, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। তার কর্মজীবন শুরু হয় সেনাবাহিনীর চাকরি দিয়ে যেখানে দীর্ঘ সতের বছর তিনি দেশ বিদেশে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৩ সালে সেনাবাহিনী থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করে তিনি সহকারী অধ্যাপক হিসেবে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে যোগদান করেন।

ব্যক্তি জীবনে তিনি লেখক, সংগঠক, সমাজসেবক, গবেষক এবং একজন মনোচিকিৎসক - মানুষকে ভালবাসাই যার নেশা।

শুদ্ধস্বর

ISBN 984-300-001761-3

মানুষ

ডা. মেজর (অব.) আব্দুল ওহাব

মূল্য : একশত টাকা